রবি সেনগুপ্তের স্মৃতিতে

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

তখন ত্রাসের সঞ্চার হতো, এখন বুঝতে পারি প্রতাপকুমার রায় 'আজকাল' পত্রিকায় প্রতি রবিবার প্রকাশ করবার উদ্দেশ্যে গত বছর তাড়া দিয়ে-দিয়ে এই প্রবন্ধগুলি যদি লিখিয়ে না নিতেন, চিরকালের জন্য অলিখিতই থাকতো তারা। 'পটভূমি' নামকরণও তাঁর। গ্রন্থটির নিন্দা-প্রশংসা অতএব তাঁর সমান প্রাপ্য।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে, বহুভাবে আমি ঋণী, এবার ঋণের বোঝা বাড়লো। দীর্ঘদিন অসুস্থতা সত্ত্বেও বিছানায় শুয়ে-ব'সে পরম আগ্রহভরে তিনি লেখাগুলিকে একটি ধারাক্রমে সাজিয়ে দিয়েছেন, 'পটভূমি'-তে তাতে নাকি, তাঁর ধারণা, খানিকটা চরিত্র সঞ্চার ঘটেছে, তাঁর ধারণা, এবং আমার আশা।

অরিজিৎ কুমার ও 'প্রিণ্টেক'-এর অন্য বন্ধুরা অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে বইটি ছাপিয়েছেন, তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই দে'জ পাবলিশিং-এর সুধাংশুশেখর দে ও তাঁর অনুজদের; এ বছরের বইমেলায় 'পটভূমি'-কে হাজির করবেন, সেই প্রতিশ্রুতি নিদারুণ পারিবারিক দুর্বিপাক সত্ত্বেও তাঁরা রক্ষা করেছেন।

অশোক মিত্র

সূ চি

প ট ভূ মি

‘কোকা লো, কুকী লো, মায়ের কাছে গিয়ে’

বানিয়ে বলছি না, বাড়িয়ে বলছি না। শৈশবে-শোনা ফিরিওলাদের বিচিত্র-বিভিন্ন নানা হাঁকের মধ্যে একটির কথা বিশেষ ক'রে মনে পড়ে। অতিবৃদ্ধ ফিরি-ওলা, দেহ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, পরিধানে মালিন্যের প্রকট ছাপ, কপাল বেয়ে ঘাম নামছে, মানুষটি স্পষ্টতই ক্লান্ত, কিন্তু জীবিকার তাড়না, শরীরটাকে টেনে-হিঁচড়ে তার রাস্তার পর রাস্তা পেরিয়ে-যাওয়া, সেই সঙ্গে সুর ক'রে বলা, তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর, দুশো গজ দূর থেকে যা শোনা সম্ভব ছিল, শুধু একটু কাঁপা-কাঁপা উচ্চারণ। প্রথমে সংক্ষিপ্ত সম্ভাষণ, ‘চাই ভালো ক-খ বই’। তারপর, গলার স্বর আরো একটু চড়ায় তুলে, আবেদনের সঙ্গে মূর্ছনার সংযোগ ঘটিয়ে, পাড়ার শিশুদের কাছে প্রলম্বিত আবেদন, ‘কোকা লো, কুকী লো, মার কাছে গিয়ে কেঁদে-কেঁদে বল্, মা, আমাকে একটা পয়সা দাও, আমি ক-খ বই কিনবো।’

খোকারা, খুকীরা কখনো-কখনো সেই আবেদনে সাড়া দিত, কখনো-কখনো দিতেন তাঁদের মা-বাবারা। তবে অধিকাংশ সময়েই অন্য অভিজ্ঞতা। ষাট-সত্তর বছর আগেকার বাংলা দেশের কথা বলছি, অখণ্ড বাংলা দেশ, সেই ভয়ংকর আর্থিক মন্দার বছরগুলির বাংলা দেশ, ধান-চাল অতি শস্তা, তাতে মধ্যবিত্ত সংসারের সুবিধা, কিন্তু ঐ একই কারণে গরিব খেতমজুর-ছোটো চাষীর মাথায় হাত, তাদের উপার্জন প্রায় শূন্য, অথচ উপার্জন অতি অপ্রতুল ব'লেই ঋণের বোঝা ক্রমশ বর্ধমান, এবং তা বর্ধমান ব'লেই হয় জমিদার-মহাজনের ঠাঁইয়ে বেগার খাটা, নয়তো শেষ সম্বল দু-ছটাক জমি বিক্রি ক'রে দিতে বাধ্য হওয়া। ধানের দাম মাসের-পর-মাস কমছে, পাটের দামও, জমি তৈরি করা থেকে শুরু ক'রে হলকর্ষণ-বীজ-রোওয়া-জল-ছিটোনো ইত্যাদি নানা ধাপ পেরিয়ে ফসল ঘরে তোলা পর্যন্ত সমস্ত পর্যায়ের সঙ্গে যারা একান্তভাবে জড়িত, তারা অথচ তাদের গোটা পরিবারসুদ্ধ প্রায় নিরন্ন-অভুক্ত, সেই সঙ্গে গ্রামের পর গ্রামে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বরের প্রকোপ। যেখানে মাস গড়ালে একটি অতি সাধারণ চাষীর হয়তো এমনকি দু-তিন টাকারও সাশ্রয় হতো না, এক পয়সাও তার কাছে মাণিক্যসমান, সন্তানের জন্য হাট থেকে এক পয়সা খরচ ক'রে ক-খ বই কেনা তার পক্ষে বিলাসিতা বই তো অন্য-কিছু না।

শহরে-মফস্বলেও কি তেমন-কিছু অন্য অবস্থা ছিল? ফেরিওলার দেহ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়া, কাঁধ থেকে কাপড়ের ঝোলা তেরচা নিচের দিকে নেমেছে, ষোলো কি বত্রিশ পৃষ্ঠার বর্ণপরিচয়ের বই, কিন্তু দিনের শেষে কয়টি বিক্রি হতো? শহরেও তো নিম্নবিত্তদের উপার্জন-সংস্থানহীনতার সমস্যা, থমথমে দৈন্যের পরিবেশ

চারদিকে, সংখ্যায় খুবই কম পরিবারের পক্ষে শুধুমাত্র একটি পয়সা খরচ ক'রে ছেলেমেয়েদের জন্য ক-খ বই কিনে দেওয়ার, ইচ্ছা থাকলেও, সংগতিটা ছিল। 'চাই ভালো ক-খ বই', 'কোকা লো, কুকী লো, মার কাছে গিয়ে কেঁদে-কেঁদে বল্, মা, আমাকে একটা পয়সা দাও, আমি ক-খ বই কিনবো' : কিন্তু না, হয়তো আট ঘণ্টা পথ পরিক্রমণ ক'রেও সেই অতি-বৃদ্ধ ফেরিওলার পক্ষে দিনের শেষে দশটির বেশি ক-খ বই বিক্রি করা সম্ভব হতো না, যা থেকে তার নীট উপার্জন, কে জানে, হয়তো বড়োজোর অর্ধেক, অর্থাৎ মাত্র পাঁচ পয়সা। গরিবদের বেঁচে থাকার, কোনোক্রমে টিঁকে থাকার, বড়ো জটিল পাটিগণিত : ছেলেমেয়েদের জন্য ক-খ বই কেনবার তাদের সামর্থ্য নেই, ক-খ বই বিক্রি ক'রে কোনোক্রমে সংসার নির্বাহের ব্যবস্থা করার সম্ভাবনাও তাদের কাছে উপ্ত, অথচ কোনো বিকল্প জীবিকার সন্ধানই বা তাদের কে দেবে।

একটা পরিবর্তন নিশ্চয়ই ঘটেছে গত ষাট-সত্তর বছরে। কোনো ফেরিওলার দ্বারাই আর রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে স্রেফ ক-খ বই বিক্রির ওপর নির্ভর ক'রে সংসার নির্বাহের চেষ্টার মতো অবিমৃষ্যকারিতা এখন আর দৃষ্টান্তিত হ'তে দেখি না। জামা-কাপড়ের ফিরিওলারা আছেন, তাঁদের সংখ্যা বর্ধমান, ফলওলা-ফুলওলা-ফুচকা-ওলারাও আছেন, বাসনওলা-চাবিওলারাও, একটু বড়োলোক পাড়ায় আইসক্রীম-ওলারা, সেই সঙ্গে এমনকি ভিডিও ক্যাসেট বিক্রি বা এনতার বাহারি রঙের বহু ধরনের পত্রপত্রিকা ইত্যাদিও ফিরি হচ্ছে বাড়ি-বাড়ি, একমাত্র ক-খ বইয়ের ফিরি অভাবনীয়, প্রাথমিক শিক্ষা ফিরি ক'রে বেড়াবার প্রসঙ্গ কারো কল্পনাতেও আর আসে না। না, কী আমাদের পশ্চিমবাংলায়, কী পদ্মা-পেরুনো ঐ বাংলাদেশে, নিরক্ষরতা দূর হয়নি, শহরের-গাঁয়ের বেশির ভাগ মানুষ এখনো অক্ষরপরিচয়হীন. ষাট-সত্তর বছর আগেকার সময়ের তুলনায় তাঁদের উপার্জন হয়তো সামান্য বেড়েছে, বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিণামে তাঁদের শ্রেণীচেতনায় হয়তো প্রাখর্য যুক্ত হয়েছে, তাঁদের আপেক্ষিক সামাজিক সংস্থান বোধহয় অনেকটাই পাল্টেছে। এমনটাও হ'তে পারে, সংখ্যার বিশ্লেষণে সম্ভবত ধরা পড়বে, তাঁদের পরিধেয়র মানে উন্নতি ঘটেছে, মাথার উপর আচ্ছাদনের ব্যবস্থাও এই আড়াই-তিন পুরুষ বাদে ঈষৎ পরিবর্তিত, পুষ্টির অভাবও পুরোনো দিনের মতো তত প্রকট নয়, অথচ সাক্ষরতার অভিযাত্রা এখনো খুবই ঢিমেতালে। যদি রাজনৈতিক ঘটনা-প্রবাহের চরিত্রে হঠাৎ গভীর জলোচ্ছ্বাসের ঢেউ এসে ঝাপ্‌টা মারে, গরিবগুর্বোদের চেতনার মান তা হ'লে নিজে থেকেই ঊর্ধ্বগতি হবে, নিরক্ষর খেতমজুর-ছোটোচাষী-বর্গাচাষী তাঁদের অধিকাররক্ষা তথা অধিকার-প্রসারের সংগ্রামে এগিয়ে যাবেনই, তাঁদের অক্ষরপরিচয়হীন অবস্থার প্রতিবন্ধকতা তাঁরা যে ক'রেই হোক পেরিয়ে যাবেন। তথাচ হিশেব না ক'ষে পারি না, এঁরা যদি প্রাথমিক শিক্ষার কয়েকটি ধাপ ইতিমধ্যে এগিয়ে থাকতে পারতেন, পাটিগণিতের সঙ্গে একটু-আধটু পরিচয়

ইতিমধ্যে খানিক পরিমাণে হতো, কিংবা ছিটেফোঁটা ইতিহাস-ভূগোলের সঙ্গে, তা হ'লে গ্রামাঞ্চলে সমাজবিপ্লব, তা সহিংস অথবা অহিংসই হোক, আমূল কিংবা ভগ্নাংশিকই হোক, আরো ঢের-ঢের দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হ'তে পারত। নগরে-মফস্বলেও সমানুরূপ ভগ্নদূত কাহিনী। সরকারের তরফ থেকে, অথবা পুরসভার ব্যবস্থাপনায়, একটির পর আরেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হচ্ছে, তেমন-কিছু চকমকে-ঝকঝকে নয় তাদের চেহারা, গরিব দেশে ঐ-গোছের ঔজ্জ্বল্য আশা করাই অন্যায়, কিন্তু কোথায় যেন একটি বিশেষ শূন্যতা, ছেলেমেয়েদের বাবা-মারাই হয়তো তাদের আটকে রাখছেন সংসারের তাৎক্ষণিক জীবিকা সংস্থানের প্রয়োজনে, তারা হয়তো বাবার সঙ্গে মাঠে কাজ করতে গেছে, কিংবা মায়ের সঙ্গে পাতা-খড়কুটো কুড়োতে গেছে, নয়তো ঘণ্টায় দুশো-আড়াইশো বিড়ি বাঁধছে তারা, চায়ের দোকানে বাসন কুড়োচ্ছে-ধুচ্ছে, বাড়িতে ব'সে এক্সারসাইজ খাতা শেলাই করছে যারা লেখাপড়া করবে তাদের জন্য, তাদের নিজেদেরও যে লেখাপড়া করার পরিপূর্ণ সাংবিধানিক অধিকার আছে তা নিয়ে তাদের কাছে বিস্তারিত হ'য়ে আর কী লাভ।

কেরল রাজ্য পেরেছে, আমরা পারিনি, পদ্মা পেরিয়ে বাংলাদেশও এখন পর্যন্ত পারেনি। অথচ এটা নিছক আর্থিক ব্যবস্থার সমস্যা নয়, সামগ্রিক সামাজিক মানসিকতার প্রসঙ্গ পাশে ফেলে রাখার উপায়ই নেই কোনো। নতুন দিল্লি থেকে প্রায়ই নানা বিভঙ্গে বড়াই করা হয়, দেশের শতকরা পঁচাশি না নব্বুই ভাগ মানুষ এখন টেলিভিশনের বিচ্ছুরণের আওতার মধ্যে। ক-খ বইয়ের যুগাবসান ঘটেছে, কিন্তু অক্ষর-পরিচয় তথা অন্যবিধ প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের চেষ্টায় টেলিভিশনকে চমকপ্রদ নানাভাবে ব্যবহার করা যেত, কিন্তু তা আবদ্ধ রইল দ্রৌপদীর শাড়ি তথা দুষ্টমতি লঙ্কাপতির অলীক জগতে, নয়তো বোম্বাই-মার্কা জড়বুদ্ধি চলচ্চিত্রের প্রকোষ্ঠে।

আরো একটু রূঢ় কথাই বা বলবো না কেন? খোকা-খুকীরা মার কাছে কেঁদে গিয়ে এমনকি একটা টাকাও আর ভিক্ষা করবে না ক-খ বই কেনার জন্য, সেই টাকা যদি তারা হাতে পায়, হয়তো তারা মাদক কিনবে · আমার শৈশবের কোকাদের, কুকীদের কাছে কাকুতি পেশ করা ক-খ বইয়ের ফিরিওলারা হারিয়ে গেছেন, রাস্তায়-রাস্তায় এখন ফিরি হচ্ছে নেশার বড়ি, এক টাকা দাম, যা কিনা ষাট-সত্তর বছর আগেকার এক পয়সায় সমানই। তখন সেই এক পয়সার সংগতিও ছিল না অধিকাংশ পরিবারের। এখন যথেষ্ট দুঃস্থ সংসারেও হঠাৎ-হঠাৎ ছেলেমেয়েরা হাতে একটা টাকা যদিই বা পেয়ে যায়, কে আর তাদের জন্য ক-খ বই ফিরি ক'রে বেড়াবে, যুগপরিবর্তন ঘ'টে গেছে।

ঐ অতি-বৃদ্ধ ফেরিওলার ঝোলায় ক-খ বইয়ের সঙ্গে মিলেমিশে অন্য একটি-দুটি রোমাঞ্চকর বইও হয়তো থাকত, যেমন মনোমোহন সেনের 'মোহনভোগ',

অথবা যোগীন সরকার কর্তৃক সংগৃহীত সম্পাদিত ছড়ার বই। প্রতিটি বই-ই সচিত্র, কোনো-কোনো বইতে বিচিত্র নানা রঙের সমাবেশ। 'কে নিবি মোহনভোগ, আয় ছুটে আয়' পেরিয়ে আমরা পৌঁছে যেতাম হঠাৎ হয়তো পেটুক গণেশের প্রসঙ্গে : পদ্য, শাদামাটা-রঙ্গ ঠাসা পদ্য, পেটুক গণেশের ঢাউস-ফুলে-ওঠা পেটের ছবি, 'পেটুক গণেশ, পেটুক গণেশ, তোমার কী-কী খেতে রুচি? নরম-নরম রসগোল্লা আর গরম-গরম লুচি'। অভুক্ত কৃষক পরিবারে এই আপাতসরল পদ্যকাহিনীও বিষাদের বার্তা ব'য়ে আনত, জমিদার বাড়ির দূরাগত সান্ধ্যকালীন কাঁসর-ঘণ্টার মতো। কিন্তু একটি আশার ইঙ্গিতও ছিল সঙ্গে-সঙ্গে, ছেলেমেয়েরা যদি কোনোক্রমে একটু ক-খ লিখতে পারে, একটু এ-বি-সি, একটু পাটিগণিত শেখে, একটু ভূগোল-ইতিহাস, তারা হয়তো সত্যি-সত্যি সুযোগের স্বর্গদ্বারে পৌঁছুতে সফল হবে, নরম-নরম রসগোল্লা আর গরম-গরম লুচি, যা জমিদার-মহাজনদের ভোজ, তা-ও একটু-আধটু তা হ'লে তাদের পাতেও পড়তে পারবে।

যুগাবসান, যুগ-পরিবর্তন। স্বাধীন দেশ, কিন্তু শিক্ষার যেন আর তেমন উপযোগিতা নেই। কিংবা বোধহয় ভুল বললাম, সেই উপযোগিতা সম্পর্কে তেমন সমাজচেতনা নেই, যেমন-হচ্ছে-তা-ই-হ'তে-দাও-না গোছের মানসিকতায় সমাজ সমাচ্ছন্ন। 'কোকা লো, কুকী লো, মার কাছে গিয়ে কেঁদে-কেঁদে বল্, মা, আমাকে একটা পয়সা দাও, আমি ক-খ বই কিনবো'-র পুরাবৃত্ত তাই সম্ভবত কয়েক মুহূর্তের অলস কৌতূহল উদ্রেক করবে, কিন্তু সেই ঝুঁকে-পড়া-শরীর ফেরিওলার প্রসঙ্গ, তার ফিরি-করা বইয়ের সামাজিক গুরুত্ব ইত্যাদি নিয়ে আবেগাধিক্যের ঋতু অবসিত। রবীন্দ্রনাথের গানেই তো আছে, 'চাহি না রহিতে ব'সে ফুরাইলে বেলা, তখনই চলিয়া যাব শেষ হলে খেলা'। সেই অতি বৃদ্ধ ফিরিওলা, কাঁধে বিদ্যা-বিতরণের ঝোলা, আমার শৈশবস্মৃতির বাইরে আসার তার তাই প্রশ্ন নেই।

শিখায় এ হীন তথ্য কে রে ?

ছেলেবেলায় একটি দেশজ বাক্যপ্রয়োগে চমকিত হয়েছিলাম, সেই সঙ্গে খানিকটা বিচলিতও: 'তোর কথাগুলি শুনলে, বুঝলি শ্রীমন্ত, পা থেকে চটিটা নিজের থেকেই খ'সে আসে।' অস্যার্থ শ্রীমৎ শ্রীমন্ত এমন অসার, যুক্তিহীন, বিরক্তিকর, রোষ-উদ্রেককারী কথাবার্তা বলেন, যা শুনে মেজাজ সামলে রাখা মুশকিল হ'য়ে পড়ে, মানুষ রিপুর দাস, প্রধান একটি রিপুকে আর ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয় না।

বয়স বাড়ে, আমরা পরিণত হই, নিজেদের সংস্কৃত করি, ধোপাবাড়ির পাট-করা কথাবার্তা বলতে শিখি, হাজার গণ্ডা কারণ থাকলেও রিপুকে যে দমন ক'রে রাখা উচিত সেই উপলব্ধিতে পৌঁছুই, শ্রীমৎ শ্রীমন্ত যতই আপাত-অসহনীয় নানা উক্তিমন্তব্য করুন না কেন, উত্তেজনার বাইরে স্থিত থাকার চেষ্টা করি, চটি হঠাৎ নিজের থেকেই যাতে পা থেকে ছিটকে বেরিয়ে না আসে সে সম্পর্কে অবহিত থাকি।

কখনো-কখনো ধৈর্যের বাঁধ তা হ'লেও ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। তখন নতুন ক'রে নিজেকে বোঝাতে হয়: স্থিত ভব, স্থিতি ভব।

ছেলেবেলার প্রসঙ্গেই ফিরতে হয়। পরাধীন দেশ, ইংরেজ শাসকদের তুড়ি জানিয়ে স্বাধীনতার জন্য সহিংস-অহিংস আন্দোলন, পাড়ায়-পাড়ায় জমায়েৎ, শোভাযাত্রা, প্রভাতফেরি, পুলিশ, গোরা সার্জেন্ট, লাঠি। এখানে-ওখানে গুলির শব্দ, গ্রেপ্তার, পুলিশের চোখে মরচের গুঁড়ো ছিটিয়ে দেওয়াল টপকে পালানো, উন্মাদনা-উত্তেজনা, সেই অবস্থায় স্বদেশী গানের বন্যা, অনেক গানে-কবিতায় আমরা উদ্দীপিত হতাম, কিন্তু বিশেষ-একটি গানে আমাদের দেশপ্রেম আবেগের শীর্ষবিন্দুতে উত্তীর্ণ হতো, 'কারার ঐ লৌহকপাট, ভেঙে ফেল, কর রে লোপাট। রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী। / ওরে ও তরুণ ঈশান! বাজা তোর প্রলয় বিষাণ / ধ্বংসনিশান উড়ুক প্রাচী-র প্রাচীর ভেদি'। / 'গাজনের বাজনা বাজা। কে মালিক? কে সে রাজা? কে দেয় সাজা, মুক্ত-স্বাধীন সত্যকে রে? / হা হা হা পায় যে হাসি, ভগবান পরবে ফাঁসি? / সর্বনাশী শিখায় এ হীন তথ্য কে রে? / ওরে ও পাগলা ভোলা! / দে রে দে প্রলয় দোলা / গারদগুলা জোরসে ধরে হেঁচকা টানে। / মার হাঁক হৈদরী হাঁক, কাঁধে নে দুন্দুভি ঢাক। / ডাক ও রে ডাক মৃত্যুর ডাক জীবন পানে! / নাচে ঐ কালবোশাখী, কাটাবি কাল বসে কি, / দেয় রে দেখি ভীম কারার ঐ ভিত্তি নাড়ি। / লাথি মার ভাঙ রে তালা! যত সব বন্দীশালায় / আগুন জ্বালা, আগুন জ্বালা, ফেল উপাড়ি'।'

আমাদের ধমনীতে আগুন জ্বলত, ব'সে-ব'সে কালাতিপাত করতে আমরা রাজি নই, কারার ঐ লৌহকপাট ভেঙে ফেল, কর রে লোপাট। 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার লঙ্ঘিতে হবে রাত্রিনিশীথে, অতএব যাত্রীরা হুঁশিয়ার'। কে সেই অর্বাচীন যে প্রশ্ন করে, প্রলয়ঝড়ে যে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত, তার ধর্মপরিচয় কী? 'হিন্দু না মুসলিম, জিজ্ঞাসে কোন জন'। আমরা সদর্পে ঘোষণা করি গানের নির্ঘোষের সঙ্গে নিজেদের গলা মিলিয়ে : 'কাণ্ডারী, বলো ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র'। 'অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ', আমাদের মাতৃমুক্তিপণ, আমাদের শরীরে রোমাঞ্চ, ধমনীতে প্রবাহ, বজ্রমুষ্টি আকাশে তোলা, স্বাধীনতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন।

স্কুলপ্রাঙ্গণে ভরদুপুরে ব্যায়ামশিক্ষক শরীরচর্চা শেখাতেন, গানের তালের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে হাতের-পায়ের বিবিধ প্রক্ষেপ, শতকণ্ঠের সম্মিলিত আনন্দে পরিপার্শ্ব প্রসন্ন হ'য়ে উঠত : 'উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল, নিম্নে উতলা ধরণীতল, অরুণ প্রাতের তরুণদল, চল্ রে চল্ রে চল্।···উষার দুয়ারে হানি আঘাত আমরা আনিব রাঙা প্রভাত, আমরা ঘুচাব তিমির রাত, বাধার বিন্ধ্যাচল, চল্ রে চল্ রে চল'।

রবীন্দ্রনাথ আছেন, আমাদের সত্তা জুড়ে আছেন, কিন্তু তিনি তো ঈশ্বর, ঈশ্বরকে তো আমরা দূর থেকে আরাধনা করি, তিনি আমাদের ঘিরে রয়েছেন, জুড়ে রয়েছেন, তাঁকে আমরা স্বতঃসিদ্ধ হিশেবে চেতনায় সেঁধিয়ে দিই! অন্যদিকে, দে গোরুর গা ধুইয়ে, আমাদের প্রাত্যহিকতা থেকে অবিচ্ছেদ্য ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। রবীন্দ্রনাথ একটু আবরু রেখে কথা বলতেন, কণ্ঠ রুদ্ধ বাঁশি সংগীতহারা, তাঁর ভুবন যারা অমাবস্যার জালে অবরুদ্ধ করেছে, 'তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?', কিন্তু কিশোরবয়সী আমরা, সদাচঞ্চল, অসহিষ্ণুতায় টগবগ করছি, উচ্ছ্বাসে টইটুম্বুর। আমাদের আরো অনেক বেশি কাছাকাছি এই শিকল ভাঙার গান : 'এই শিকল-পরা ছল মোদের, এ শিকল-পরা ছল। / এই শিকল পরেই শিকল তোদের করবো রে বিকল / ··· মোরা আপনি পরে মরার দেশে আনবো বরাভয়। / মোরা ফাঁসি পরে আনবো হাসি মৃত্যুভয়ের দল। // ওরে ক্রন্দন নয়, বন্ধন এই শিকল ঝঞ্ঝনা / এ যে মুক্তিপথের অগ্রদূতের চরণবন্দনা! / এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হানছে লাঞ্ছনা / মোদের অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল।' নজরুলের কবিতা থেকেই তো আমাদের প্রাথমিক দীক্ষা : 'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াৎ খেলছে জুয়া। / ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয় তো মোয়া'। জাত্যভিমান ছাপিয়ে দেশাভিমান : 'এই দেশ কার? তোর নহে আর / রে মূঢ় সন্তান ভারতমাতার। / দেবতার দেশে আজ দৈত্য করে বিরাজ, মন্দির আজি বন্দীর কারাগার। / লাজ নাহি তার, যার জননী দাসী / দাসের শিকল পরে বেড়াস্ হাসি', কেমনে নিলাজ, বেড়াস হাসি'? / অসম্মানের প্রাণ করে দে রে

অবসান, মানুষের মতো মরে বাঁচ রে আবার।' কারণ, নজরুলকে নিবৃত্ত করা অসম্ভব। এই ভারতে নাই যাহা, তা ভূ-ভারতে নাই। মানুষ যাহা চায় স্বর্গে গিয়ে, আমরা হেথায় পাই।'

অথচ এই মানুষটিই হারমনিয়মে ধাক্কা দিয়ে-দিয়ে আরো কত সুখের-আনন্দের উদ্রেক ঘটিয়েছেন। চমকে-চমকে ধীর ভীরু পায়, যে-পল্লিবালিকা বনপথে যায়, তার পরিবেশ বর্ণনা শুনিয়েছেন, পান্‌সে জোছনাতে পানসি বেয়ে, বাঁশিতে গজলের সুর, আমাদের সঙ্গে নিয়ে চলেছেন, চোখইশারায় ডাক দিল হায় যে-দরদী তার অন্দরমহলে হুড়মুড় ক'রে ঢুকে পড়েছেন, আমরা কাছাকাছি আছি। এরই মধ্যে কখনো ভক্তির প্লাবনে ভেসে গেছেন। 'শ্যামা বলে ডেকেছিলাম, শ্যাম হয়ে তুই কেন এলি ? / ওমা লীলাময়ী মনের কথা কেমন করে শুনতে পেলি ?' অনুরূপ আকৃতি একটু অন্য উচ্চারণে, সঙ্গে ভোরের ভৈরবীর সমাহিতি : 'রাঙা জবায় কাজ কী মা তোর অরুণরাঙা চরণতলে। / লক্ষ কোটি উষা রবির আঁধার ভাঙা কিরণ খেলে॥' ঐ একই মানুষের অথচ স্থূলে ভুল নেই : 'ওড়াও ওড়াও লাল নিশান···দুলাও মোদের রক্তপতাকা ভরিয়া বাতাস জুড়ি' বিমান। ওড়াও ওড়াও লাল নিশান'।' হঠাৎ, অন্যতর এক অভিব্যক্তির ঝোঁকও : 'বাগিচার বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিস নে মিছে দোল'। কিংবা, হঠাৎ প্রগাঢ় একটি মুহূর্ত, 'যবে তুলসীতলায় প্রিয় সন্ধ্যাবেলায় তুমি করিবে প্রণাম, তব দেবতার নাম নিতে ভুলিয়া বারেক প্রিয় নিও মোরও নাম'।

বাঙালি হৃদয়বৃত্তি, যার বড়াই করি আমরা, আমাদের আবেগ-অনুরাগ-ভক্তি-প্রীতি-স্নেহার্দ্রতা-স্বপ্ন-দেখা-আকাশকুসুম ভাবা, সমাজকে আরো নিটোল ক'রে গড়ার অঙ্গীকার, তার বৃহদংশ অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা, কিয়দংশ মহামহিম দেশনায়কদের সংযোজনা, কিন্তু, কী ক'রে অস্বীকার করি, তা হ'লেও অবচেতনার অনেকখানি জুড়ে কাজী নজরুল ইসলাম। উত্তম হই, অধম হই, মহান হই, আটপৌরে হই, সুশৃঙ্খল হই, অথবা বাউণ্ডুলে হই, আমরা যা হয়েছি, হ'তে পেরেছি, তার জন্য আমাদের আকণ্ঠ ঋণ নজরুলের কাছে, তিনি আমাদের নির্লজ্জ হতে শিখিয়েছেন, অকপট হ'তে শিখিয়েছেন, আমরা হয়তো তাঁর লজ্জা, তা হ'লেও তাঁর পূর্বজ ভূমিকা আমাদের দিক থেকে ভুলে থাকার তো কোনো উপায়ই নেই।

অথচ, যা হ'তে পারা আদৌ অসম্ভব তা-ও ঘটে, অতীত দিনের স্মৃতি কেউ ভোলে না, কেউ ভোলে। অথবা অগ্রগামী অধঃপাতের দিকে একটু-একটু ক'রে আমরা এগুচ্ছি। এ-বছরের আদমশুমারিতে ধরা পড়েছে, সাক্ষরতার নিরিখে গোটা ভারতবর্ষে আমরা নাকি পঞ্চম, কেরল, তামিলনাডু, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্রের পরেই নাকি পশ্চিম বাংলার স্থান। হবেও বা, কিন্তু অন্যদিকে বিশেষ-এক নিরক্ষরতা ব্যাপ্ততর হচ্ছে। ছাপার অক্ষরে, প্রকাশ্যে, প্রাজ্ঞ মন্তব্য পড়তে হচ্ছে, 'কাজী নজরুল ইসলাম একজন বড়ো দরের (কিন্তু অসাধারণ নয়) মুসলমান কবি'। বিশেষণযুক্ত কবি, মুসলমান কবি।

হয়তো হেসে গড়িয়ে পড়া উচিত, নজরুল মুসলমান কবি ? কিন্তু এই মন্তব্য নিছক তো মূঢ়তাসঞ্জাত নয়, একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই, দুর্বিনীত দুঃসাহসের সঙ্গে কিছু-কিছু উক্তি বাজারে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, সাধারণ লোকে কতটা তা 'খেলো'' সম্ভবত তা যাচাই ক'রে দেখবার জন্য। প্রজন্মের পর নতুন প্রজন্ম, তাদের ভাবনা-আবেগের সঙ্গে কাজী নজরুলের সৃষ্টিসুখের ইতিহাসের কোনো প্রত্যক্ষ সেতু-সংযোগ নেই. যদি কোনোক্রমে তাদের মানসিকতায় অন্য প্রত্যয় ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, যদি বাঙালিকে ব্রাত্য হ'তে শেখানো যায়, পিতৃহননের ঘৃণ্য মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া যায়, যদি তাদের বিষাক্ততার-হিংস্রতার-যুক্তিশূন্যতার অন্ধকূপে কায়দা ক'রে ছুঁড়ে ফেলা যায়, তা হ'লেই উদ্দেশ্যের অন্তত অর্ধেক আমলকিবৎ করতলগত। ধর্মান্ধতার প্লাবনে দেশকে তা হ'লে আরো একবার ভাসিয়ে দেওয়া সম্ভব, আরো একবার টুকরো হোক দেশ, গ্লানিহীন-বিবেকহীন ধর্মপ্রেমের নামাবলির আড়ালে সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রের সদম্ভ বিস্তার ঘটতে পারে তা হ'লে।

হঠাৎ ক'রে তাই ছেলেবেলায় শোনা সেই বিশিষ্ট বাক্যপ্রয়োগটি মনে আসে : কারো-কারো কোনো-কোনো কথা শুনলে পা থেকে চটিটা নিজের থেকেই খ'সে আসে, অন্তত খ'সে আসতে চায়, পরশুরামের কুঠার হাতে নেওয়ার মতো প্রাথমিক প্রবৃত্তি মাথা চাড়া দেয়। সঙ্গে-সঙ্গেই নিজেকে অথচ নিবৃত্ত করতে হয়, এটা তো শুধু সভ্যতার-সংস্কৃতির ব্যাপার নয়, ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্ত ব্যর্থ করতে হ'লে সংযমী হ'তে হবে আমাদের, ধৈর্যের প্রলম্বিত পরীক্ষা, যারা আমাদের খেপিয়ে দিয়ে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে চায় তাদের ফাঁদে ধরা পড়ার চেয়ে বড়ো সামাজিক বিচ্যুতি কিছু হ'তে পারে না।

অতএব নিজেদের সংবৃত করি। তবে তার অর্থ এই নয় আমরা, শান্ত-শিষ্ট ল্যাজবিশিষ্ট, ক্লীব ভঙ্গিতে বেকার কুকুরের মতো অলস হাই তুলবো। বরঞ্চ বার-বার উচ্চারণ করবো প্রয়াত কবি অরুণকুমার সরকারের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি : 'শুধু প্রেম নয়, কিছু ঘৃণা রেখো মনে, / যেমন অনেক অনেক বৃক্ষ কোমলাঙ্গ কাঁটা দিয়ে ঢাকে। / আছে লালসার দাঁত, লোভের বিকট জিহ্বা, প্রভুত্বের লোমশ আঙুল, ব্যঙ্গের কুঠার, ঈর্ষা, অন্যায়ের সহসা ছোবল / সইবে কেমনে ? / শুধু প্রেম নয়। তাই যুগপৎ ঘৃণা, ঘৃণা রেখো মনে।'

ঘৃণা, এই মুহূর্তে মানুন না-মানুন, বড়ো পবিত্র উপাদান, সমাজকে বিশুদ্ধতর করতে হ'লে ঘৃণার বিকল্প নেই। পৃথিবী মধুময় হোক, এবং প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হ'লে ঘৃণার ফলিত প্রয়োগ ঘটুক, নজরুল যাদের কাছে মুসলমান কবি, তাদের জন্য আর কোন্ উপচার নিয়ে হাজির হ'তে পারি আমরা ? যারা এ-ধরনের কথাবার্তা বলে, তাদের চেয়ে বিজাতীয়রূপে ঘৃণ্য আর কে ?

‘মানুষটা মরে গেলে যদি তারে ওষুধের শিশি’

প্যারিস থেকে চমকপ্রদ খবর। ফরাশি দেশের বিখ্যাততম, সম্ভ্রান্ততম প্রকাশনা সংস্থা, গালিমার, নিজে থেকে এগিয়ে এসেছেন। কিছুদিন-আগে-প্রকাশিত এক কাব্যসংকলনে জীবনানন্দের তিন-চারটি কবিতার অনুবাদ পাঠান্তে গালিমারের কর্তাব্যক্তিরা মুগ্ধ, তাঁরা যথাশীঘ্র জীবনানন্দের একটি সম্পূর্ণ কাব্যসংগ্রহ ফরাশি অনুবাদে প্রকাশ করতে চাইছেন, ভূমিকা, টীকা ও কবিজীবনীসুদ্ধু। পৃথিবীর মৃত-জীবিত খুব কম মহৎ কবিকেই ইতিপূর্বে তাঁরা এমনধারা সম্মান জানিয়েছেন। ব্যবসায়িক প্রসঙ্গের উল্লেখ ভালো শোনায় না, তবে অনুমান ক'রে নেওয়া যায় প্রাথমিক কথাবার্তা সুষ্ঠুমতো সম্পন্ন হ'লে গালিমার এই অনুবাদ কাব্যসংকলনের জন্য অঢেল টাকা ধরে দেবেন।

এমনটাই তো হয়। নিজের দেশেও তো জীবনানন্দ ‘আবিষ্কৃত’ হয়েছিলেন তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যুর বেশ কয়েক বছর পর। দেশভাগের অস্থির সময় থেকে শুরু ক'রে তাঁর মৃত্যুমুহূর্ত পর্যন্ত অবর্ণনীয় আর্থিক দুশ্চিন্তায় দিন কেটেছে জীবনানন্দ দাশের, রবীন্দ্রনাথের পর যাঁকে এখন আমরা সবাই বাংলা ভাষার সার্থকতম কবি হিশেবে মেনে নিয়েছি। বরিশালের ছায়া-ঘেরা সর্বানন্দ ভবনের নীড়াশ্রয় ছেড়ে সপরিবার কলকাতায়, হতচকিত জীবনানন্দ, কয়েক মাস একটি ছোটো দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য-সম্পাদক। সেখানকার মেয়াদ অচিরে সমাপ্ত, জীবিকাহীন, সংগতিহীন জীবনানন্দ. আর্ত, সন্ত্রস্ত, হতচকিত, কোন্‌দিকে ভরসা খুঁজবেন, কার দিকে হাত বাড়াবেন, বুঝতে পারছেন না, হাওড়া গার্লস কলেজে কয়েক মাস, খড়্গপুরে সমান শাদামাটা অন্য-এক কলেজে আরো কয়েক মাস, প্রতি মাসে আড়াইশো-তিনশো টাকার ব্যবস্থাও দুষ্কর। যাঁরা তাঁর কবিতা ছাপান, প্রকাশক কিংবা পত্রিকা-সম্পাদক, তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ, সবাই না, মাঝে-মধ্যে দশ-পনেরো টাকা কবিতা বাবদ দিয়ে থাকেন, কিন্তু সে-সব অতি যৎসামান্য উপার্জন থেকে সংসারনির্বাহ অসম্ভব। জীবনানন্দের অকাব্যিক চেহারা, কিন্তু তাঁর সঙ্গে তখন দেখা হ'লেই ‘শিকার’ কবিতার সেই হরিণশাবকটির কথা মনে আসত, নিষ্পাপ, সরল হরিণ-শিশু, কর্কশ পৃথিবী সম্বন্ধে তার কোনো ধারণাই নেই, যেন কেউ জালবদ্ধ, বা তীরবিদ্ধ, করেছে, নিষ্ক্রান্তির জন্য ছটফট-ছটফট, কোনোক্রমে যদি এই ভয়ংকর অভিজ্ঞতা থেকে সে মুক্ত হ'য়ে বেরিয়ে আসতে পারত। কবিতাটির শুরুতে একটি অত্যাশ্চর্য উপমা, ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে আকাশের রঙ ‘কুঙ্কুমের মতো নেই আর, হয়ে গেছে রোগা শালিখের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো।’

আবছা-আবছা মনে পড়ে, আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে তাঁর পার্ল রোডের বাড়িতে একদা সায়ংকালে তর্কে প্রবৃত্ত হয়েছি : ঐ একটিমাত্র উপমাই কি কাব্যকে মহত্ত্বের শীর্ষ-বিন্দুতে পৌঁছে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয় ? দর্শনভোক্তা আইয়ুব, অলংকারের নিরালম্বতায় তাঁর শ্রদ্ধা নেই, অন্য দিকে আমরা কয়েকজন জীবনানন্দ-আপ্লুত অবুঝ, অশান্ত যুবক।

কিন্তু আমরা মাত্র কয়েকজনই। এবং আমাদের সামর্থ্য প্রায় শূন্য। উত্তর ভারতে অবস্থান করছি, জীবনানন্দের কাকুতিভরা পোস্টকার্ড প্রায় প্রতি সপ্তাহে, যদি উদ্যোগী হয়ে আমরা ওঁর জন্য, দিল্লি-উত্তরপ্রদেশ-পাঞ্জাব-রাজস্থান যে-কোনো জায়গায়, একটি শিক্ষকতা পদের ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারি, মাসে তিনশো টাকা হ'লেও তিনি সন্তুষ্ট।

কোনো উপায়ই খুঁজে বের করতে পারিনি। অনিশ্চিত, এলোমেলো, স্বল্পতম উপার্জন, জীবনানন্দের সংসারনির্বাহ হয়েছে ঐ ক'টা বছর চূড়ান্ত কৃচ্ছ্রের মধ্য দিয়ে। অথচ তাঁর মনে, তখনো মনে হতো, এখনো মনে হয়, বিন্দুমাত্র তিক্ততা ছিল না, ছিল না পৃথিবী বা স্বদেশ সম্পর্কে কোনো অভিযোগবোধ। সমাজগত গ্লানি অবশ্যই ছিল, যারা অন্ধ এই সমাজব্যবস্থায় তারাই সবচেয়ে বেশি দেখার দাবিদার, এই রূঢ় বাস্তবতা তাঁকে অহরহ প্রহার করেছে, পরিবেশ-পরিপার্শ্বের ক্রমশশ্মশান পরিণতি, শিবা আর শকুনের যুগ্মসাম্রাজ্য বিস্তার। একটি দূরাগত সমাজস্বপ্ন জীবনানন্দ বুকে চেপে রেখেছিলেন, ইতস্তত একটি-দুটি কবিতায় তার প্রকাশও ঘটেছিল, কিন্তু, তা হ'লেও, ঘৃণা-হিংসা-দ্বেষ ইত্যাদি বৃত্তিগুলি তাঁকে আদৌ স্পর্শ করতে অসফল।

তবে চূড়ান্ত অভাবগ্রস্ত সংসার, খুব সম্ভব এঁর-ওঁর-তাঁর কাছে সাময়িক সাহায্য ভিক্ষাও করতে হয়েছে তাঁকে। মফস্বল শহরের নির্জনতম মানুষটি, কাশ-বেতফুল-হোগলার বন-ধানসিড়ি নদী থেকে কলকাতায় নির্বাসিত, হতভম্ব, সর্বস্বলুণ্ঠিত, প্রায়-শূন্যতা-ঘেঁষা অস্তিত্ব। বেঁচে থাকার ভয়, জীবিকাহীনতার ভয়, হিশেব না মেলাতে পারার ভয়, পড়শিদের ভয়, হয়তো বন্ধুদের ভয় পর্যন্ত। অবশেষে কয়েক বছরের ব্যবধানে ট্রামের তলায় চাপা প'ড়ে হাসপাতালের বিছানায় মারা গেলেন যখন, পূর্বোল্লিখিত 'শিকার' কবিতাটির চিত্রকল্পই আমাদের বিবেককে তাড়া ক'রে ফিরল : 'টেরিকাটা কয়েকটা মানুষের মাথা'। আমরা, যারা বধ করেছি ওঁকে, আমাদের হৃদয়হীনতা দিয়ে, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা দিয়ে, তাদের নির্বোধ, নিশ্চিন্ত টেরিকাটা মাথা, ওষ্ঠাধরে বিজয়ী বীরের নিরেট হাসি, উষ্ণ লাল হরিণের মাংস একটু বাদে তৈরি হ'য়ে আসবে, অন্য দিকে, 'নিস্পন্দ, নিরপরাধ ঘুম'। কয়েক বছর বাদে জীবনানন্দ 'আবিষ্কৃত' হলেন, প্রবাদত্বে পৌঁছে গেলেন, তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির সংস্করণের পর সংস্করণ বেরোতে থাকল, তাঁর নিকৃষ্টতর কবিতাসমুদয়, যেগুলি তিনি নিভৃত তোরঙ্গে আলাদা ক'রে সরিয়ে রেখেছিলেন, তারাও ঝকঝকে ছাপায় প্রকাশিত হ'তে শুরু করল, এবং অন্য সব-কিছু ছাপিয়ে, দুই বাংলার আকাশ জুড়ে

'আবার আসিব ফিরে এই বাংলায়'-এর বীভৎস আক্রমণ। ইতিহাসের এ-ধরনেরই আজব নিয়ম, তাই তেমন অভিযোগ জানানো বাড়াবাড়ি হবে। অন্তত এই সান্ত্বনায় নিজেদের স্থিত করতে পারি, খুব বেশিদিন অপেক্ষা করতে হলো না, মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর প্রাপ্য তিনি পেতে লাগলেন, তা-ই বা কম কী।

তা হ'লেও সংশয় থেকেই যায়। মনকে চোখ-ঠারার সামাজিক প্রয়োজন আছে, অন্যথা আমাদের সবাইকেই আত্মহত্যার মধ্যবর্তিতায় পাপস্খালন করতে হতো। তা ছাড়া, ধর্মভীরু সত্তার পাশাপাশি, একটি নাস্তিক সত্তাও সম্ভবত অহরহ মাথা ঝাঁকিয়ে যায়। জীবনানন্দের ক্ষেত্রেও গেছে। তাঁর অন্য-একটি কবিতার দুটো বিচ্ছিন্ন পংক্তি একই সঙ্গে অতএব তাড়া ক'রে ফেরে। মনে করুন দিনের শেষে টেরিটিবাজারের সেই দৃশ্য, হাইড্রান্ট খুলে কুষ্ঠরোগীর জল চেটে নেওয়া, হয়তো নিভন্ত আগুনের পাশেই, কতিপয় ভিখিরির নরকগুলজার। 'ভিখিরিকে একটি পয়সা দিতে ভাস্বর-ভাদ্রবৌ সকলে নারাজ', এই প্রতীতি-উচ্চারণ থেকে তাদের হঠাৎ আরো গভীরে পরিভ্রমণ: 'মানুষটা ম'রে গেলে যদি তারে ওষুধের শিশি / কেউ দেয়—বিনি দামে—, তাতে কার লাভ, তাই নিয়ে ভীষণ সালিশি'। গালিমারের খবরটি জেনে আর-একবার তাই অপরাধবোধে আচ্ছন্ন হ'তে হয়। তবে জীবনানন্দ কি একটু-একটু তিক্ততার শিকার হ'তে শুরু করেছিলেন, ঈষৎ-এক নৈরাশ্য তাঁকে কি আচ্ছন্ন ক'রে আসছিল? হয়তো স্বীকৃতি-সম্মান-অভিনন্দন-উপঢৌকন-অর্থোপার্জন সমস্তই ভবিষ্যতে একদিন ছপ্পর ছেপে আসবে, কিন্তু তাতে তাঁর কী, এই প্রশ্ন কি তাঁর চেতনাকেও ক্রমশ অবসন্ন-মুহ্যমান এক অনুভবে পৌঁছে দিচ্ছিল?

অঙ্কে অতীব-দক্ষ হালের অর্থনীতিবিদরা আগামী প্রজন্মের সুখসমৃদ্ধিস্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে বর্তমান প্রজন্মের ভোগের মাত্রার তুলনা-প্রতিতুলনা করতে গিয়ে হিমশিম হচ্ছেন, তাঁরা মনস্থির করতে পারছেন না কোনটা শ্রেয়, কোনটা প্রেয়, কতটা শ্রেয়, কতটা প্রেয়, কিংবা শ্রেয়-প্রেয়র মধ্যে আদৌ কোনো সাযুজ্য স্থাপন সম্ভব কিনা। জীবনানন্দ, এখন সন্দেহ হয়, অনুরূপ এক সংশয়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন, যার সঙ্গে তাঁর কৃচ্ছ্রজড়িত দিনযাপনের অনুপুঙ্খ সম্পর্ক, পৃথিবীর প্রতি এক অপ্রচ্ছন্ন অভিমান, 'মানুষটা ম'রে গেলে যদি তারে ওষুধের শিশি / কেউ দেয়—বিনি দামে—তাতে কার লাভ'।

একটি বিশেষ দুপুরের কথা মনে পড়ছে, আচমকা তাঁর বাসস্থানে হাজির হয়েছি, বাড়িতে আর-কেউ নেই। জীবনানন্দ একটা কথা বলবেন-বলবেন করছেন, অথচ বলতে গিয়েও থেমে যাচ্ছেন প্রতিবার, হয়তো তাঁর ভদ্রতাবোধে বাজছে, হয়তো নিজেকে বারবার ধমকাচ্ছেন, লজ্জা, সংকোচ, দ্বিধাগ্রস্ততা। হঠাৎ, প্রায় মরিয়া হ'য়ে উঠে, ইশারা ক'রে বারান্দার এককোণে হাঁটিয়ে নিয়ে গেলেন, সন্তর্পণে এদিক-ওদিক তাকালেন, দ্রুত আমার কানের পাশে মুখ এনে ফিশফিশ প্রশ্ন। গুজব শুনেছেন, তার সত্যতা যাচাই ক'রে নিতে চাইছেন আমার কাছ

থেকে। তাঁরই এক সমসাময়িক বন্ধু, কবিসাহিত্যিক, তাঁর মস্ত অনুরাগী ও শুভানুধ্যায়ী, গুজবটি সেই বন্ধু সম্পর্কে। বিস্ফারিত চোখ, রাজ্যের লজ্জা-কুণ্ঠা, সেই সঙ্গে আকীর্ণ কৌতূহল : 'আপনি কি জানেন, ব-বাবুর নাকি পঞ্চাশ হাজার টাকার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স আছে ?'

চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত, কিন্তু এখনো আমি সেই কণ্ঠস্বর শুনতে পাই, সেই ফিশফিশ প্রায়-অস্ফুট জিজ্ঞাসা, যাতে কোনো কলুষ নেই, শুধু ঔৎসুক্য আছে, পাপহীনতা আছে, সেই সঙ্গে খানিকটা অসহায়তাবোধও। মাসে যিনি তিনশো টাকারও সংস্থান করতে পারছেন না তাঁর কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকার উপাখ্যান দৈত্যপুরীর কল্পনাকাহিনীর মতো, তাঁর অতি-পরিচিত এক সহযোগী-কবি অত সম্পদের অধিকারী তা চিন্তা করতে গিয়েও তাঁর শিশুসুলভ বিস্ময়, অথৈ বিস্ময়, সেই সঙ্গে, সম্ভবত, সামান্য কুঁকড়ে-আসা : তাঁর নিজের ক্ষেত্রে যা অভাবনীয়, তাঁরই চেনা আর-একজনের অথচ সেই মণিমুক্তামাণিক্যে, জনপ্রবাদ, অবারিত অধিকার ; অসূয়া নেই, কিন্তু একটু গ্লানির ছাপ আছে, এবং, পাশাপাশি, এক বিমূঢ়তাবোধ।

প্যারিস থেকে চমকপ্রদ খবর আমাকে সেই গ্রীষ্মাপরাহ্ণের বিষণ্ণতায় ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

তৃষার দিশাহারা তীরে ?

গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউর ফ্ল্যাটে শিথিল সকাল। সঞ্জয় ভট্টাচার্য দাড়ি কামাচ্ছিলেন, হঠাৎ, ভ্রূকুঞ্চিত, ইশারায় কাছে ডাকলেন। 'শোনো, ভালো ক'রে কান পেতে শোনো।' আমার দু-চোখে বিব্রত, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত জিজ্ঞাসা, সঞ্জয়দার কণ্ঠ থেকে মৃদু, ক্ষিপ্ত স্বরক্ষেপ : 'আ'। 'শুনতে পেলে ? মাত্র একটা সিলেব্‌ল্‌'। 'কিন্তু, এবার ফের শোনো, আ-আ-আ···, চৌষট্টিটা সিলেব্‌ল্‌।' হতভম্ব আমি, কিন্তু সঞ্জয় ভট্টাচার্য ব'লেই চলেছেন : 'এখানেই বাংলা ভাষার অপার ঐশ্বর্যের গোপন উৎস, আমরা অবলীলায়, মুহূর্তের মধ্যে, স্বরের উৎক্ষেপণে সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়ে, মাত্র এক সিলেব্‌ল্‌ থেকে শুরু ক'রে চৌষট্টি সিলেব্‌লের উপত্যকায় পৌঁছে যেতে পারি, এমন সংকোচন-প্রলম্বনের সুযোগ, ভেবে দ্যাখো, পৃথিবীর অন্য-কোনো ভাষায় নেই।'

অন্য-একদিন। সঞ্জয়দা পরম ধৈর্যের সঙ্গে, অনেকটা সময় নিয়ে, আমার মতো আপাতনাস্তিককে বোঝাচ্ছেন : 'বুঝলে, ও-সব বাল্মীকি-ফাল্মীকি না, সংস্কৃতর জারিজুরি জানা আছে, যারা বলে তৎসম-তদ্ভবর সিঁড়ি বেয়ে, পালির প্রাচীর ভেঙে বাংলা ভাষার উৎপত্তি, তারা স্রেফ ধাপ্পা দিচ্ছে। আমি অনেক পুঁথি যোগাড় করেছি, তাতে প্রমাণিত পলিভূমি বঙ্গের যে-আদি ভাষা, তাকে জড়িয়ে একদা যে-সাহিত্যসংস্কৃতিসম্ভারসৌষ্ঠব গ'ড়ে উঠেছিল, তা থেকেই সংস্কৃত ভাষার উদ্ভব। আমাদের কৃত্তিবাস রামায়ণ আসলে আরো অন্তত দশ হাজার বছর আগে লেখা, তা থেকে টুকেই ঐ বাল্মীকি রামায়ণ।' উত্তেজনায় সঞ্জয় ভট্টাচার্যের দু-চোখ বিস্ফারিত, সকাল গড়িয়ে প্রায় দুপুর, বাইরে যানবাহনের ক্রমবর্ধমান ছুটোপুটি।

এমনধারা উদ্ভট কথাবার্তা বলতেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য। অনেক স্ববিরোধিতায় ঠাসা ব্যক্তিত্ব, আবেগথরোথরো প্রেমের কবিতা লিখছেন, পাশাপাশি জটিল তত্ত্বসমাচ্ছন্ন উপন্যাসও। বাঙালি ও বাংলা ভাষা নিয়ে তাঁর কূপমণ্ডুক অহমিকা প্রায় পাগলামির পর্যায়ে পৌঁছোনো, অথচ ট্রট্‌স্কির মহাভক্ত, বিপ্লবকে একদেশে আবদ্ধ রাখলে চলবে না, ঐ ব্যাটা স্তালিনের জন্য আন্তর্জাতিক সাম্যবাদ এত পিছিয়ে পড়েছে, দু-বেলা স্তালিনকে বেঁটে খেতেন সঞ্জয়দা, তাতেও তাঁর রাগ পড়ত না। তাঁর সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকা 'পূর্ব্বাশা', যার শুরু কুমিল্লা শহরে, কলকাতা থেকে মহা উৎসাহে পুনঃপ্রকাশ, 'কল্লোল'-'কালিকলমে'র প্রায় সমগ্র লেখককুলকে 'পূর্ব্বাশা'র পৃষ্ঠায় জড়ো করিয়েছিলেন, কী আশ্চর্য সময়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভারতবর্ষে' কিস্তির-পর-কিস্তি 'পুতুলনাচের ইতিকথা' লিখছেন, সঞ্জয়দার উপরোধে 'পূর্ব্বাশা'র পৃষ্ঠায় 'পদ্মানদীর মাঝি'ও সেই সঙ্গে। কোনোদিন ঔদার্য্যের অভাব ছিল

না, গোটা প্রথম বছর 'কবিতা' পত্রিকার ফর্মাগুলি পর্যন্ত বিনা মাশুলে ছাপিয়ে দিলেন 'পূর্ব্বাশা' পত্রিকার প্রেসে। অথচ সঞ্জয় ভট্টাচার্য, এবং তাঁর সদাসহচর সত্যপ্রসন্ন দত্ত, উভয়েই রাহুগ্রস্ত, সাহিত্যসাধনায় তাঁদের পূর্ণ তৃপ্তি নেই, বাঙালি জাতটাকে উজ্জীবনের রাস্তা দেখাতে হবে, হাতেকলমে শেখাতে হবে তেমন অধ্যবসায় নিয়ে নামলে বাঙালি মধ্যবিত্ত কৃষি ও শিল্পেও কেমন জাদু ঘটাতে পারে। সঞ্জয় ভট্টাচার্যরা গণেশ অ্যাভিনিউর ফ্ল্যাটের একতলায় ঝকঝকে-তকতকে দপ্তর বসালেন, অন্যদিকে কুষ্টিয়া এবং আর কোথায় যেন ট্র্যাক্টর নিয়ে বৈজ্ঞানিক চাষাবাদেও মেতে গেলেন। বরাবরই, এখন আমার সন্দেহ, বৈষয়িক বুদ্ধির অভাব : অচিরে ব্যাঙ্কের কাছে প্রচুর দেনা, দেশভাগের পরিণামে ট্র্যাক্টরগুলি সীমান্তের ওপারে কুষ্টিয়ায় আটকা প'ড়ে রইল, 'পূর্ব্বাশা'র রমরমে দিনের অবসান, সঞ্জয়দার ক্রমবর্ধমান মানসিক অবসাদ, ওঁরা উঠে চ'লে গেলেন সেলিমপুর অঞ্চলে, 'পূর্ব্বাশা' কয়েকমাস বেরুচ্ছে কয়েকমাস বন্ধ, সঞ্জয়দা কখনো একটু বেশি অসুস্থ, একবার ব্লেড দিয়ে হাতের নাড়ি কেটে আত্মহননেরও চেষ্টা করেছিলেন, তবে মাঝে-মাঝে খানিকটা সেরেও উঠছেন।

পাগলাটে মানুষ, কিন্তু চরিত্রবান, স্নেহসিক্ত। এবং আঁকড়ে-থাকা বিশ্বাস-আদর্শ ইত্যাদি যতই উটকো হোক, পরিবেশ যতই বৈরিতামণ্ডিত হোক, সঞ্জয় ভট্টাচার্য একদিনের জন্যও ব্রাত্য হননি। এরই মধ্যে 'পূর্ব্বাশা'র জন্য লেখা চেয়ে পাঠাতেন, শ্রদ্ধার সঙ্গে যথাশীঘ্র তাঁর অনুরোধ রক্ষা করার চেষ্টা করতাম। অথচ তাঁর পত্রিকাকে তিনি অপবিত্র হ'তে দেবেন না কিছুতেই। একবার ফরমায়েশ জানালেন হালের বাংলা কবিতার উপর একটি আলোচনা লিখে পাঠানোর জন্য। কিন্তু সেই লেখা হাতে পেয়ে সঞ্জয়দা ঘোর অসন্তুষ্ট। আমার বিভিন্ন মন্তব্যে নাকি স্তালিনীয় ঝোঁক, অতএব রেজিস্ট্রি ডাকে সঙ্গে-সঙ্গে সেই প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠানো, প্রবন্ধটি পরে 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এবংবিধ ঘোর মতান্ধতা সত্ত্বেও কিন্তু সঞ্জয়দার স্নেহবর্ষণে ক্ষান্তি নেই, তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবহারে-আচরণে ন্যূনতম কোনো ব্যত্যয় লক্ষ্য করিনি কোনোদিন।

স্তালিনে যেমন, রবীন্দ্রনাথের গানে-কবিতায়ও তাঁর সমান অরুচি, রবীন্দ্রনাথ বাঙালি জাতটাকে নাকি যুক্তি থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে আবেগের অন্ধ, ব্যর্থ গলিতে সেঁধিয়ে দিয়েছেন, সেজন্যই বাঙালির বর্তমান সর্বনাশ। তবে বেশিদিন আর এ-সমস্ত জাগতিক অনাচার তাঁকে সহ্য করতে হয়নি, মৃত্যু সঞ্জয়দাকে অব্যাহতি দিয়েছিল। শরীর নানা জটিল অসুখে জরাজীর্ণ, আকীর্ণ অর্থাভাব, আকীর্ণ মানসিক অস্থৈর্য। তাঁর হয়তো অনেক-কিছু বলবার ছিল, করবার ছিল, তাঁর অনেক ভালোবাসার ব্যাপার ছিল, কিন্তু কর্কশ পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর সাযুজ্য ঘটা অসম্ভব, একের-পর-এক অচরিতার্থতার অভিজ্ঞান, দিনের পর দিন বেঁচে থাকার প্রদাহ যন্ত্রণা, মৃত্যু শেষ পর্যন্ত মুক্তির রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়।

এখানেই রহস্য, যেন সব-কিছু মেলানো যায় না, পাশার ঘুঁটিগুলি কেমন অসংলগ্ন, বিশ্লিষ্ট হ'য়ে ইতি-উতি ছড়িয়ে থাকে। 'খোঁপায় দিতে কটকি রুপোর ফুল / কতো না ক্ষপা শুনেছি সেই তারা, / আজকে ক্ষ্যাপা হাওয়ায় সমাকুল / চুপি-চুপি তোমার চুলের ধারা। / আজকে হঠাৎ ঝরঝরিয়ে পড়ে / ক্ষয়ে-যাওয়া স্মৃতির মতো নীল / অপরাজিতার তন্বী থরে-থরে / তোমার চুলের আকাশ অনাবিল। / আমার মনে-পড়ায় তারা আসে / আসে ভালোবাসার ক্ষত-মুখ / চৈত্র-রাঙা সারা কুসুম-মাসে / এমনি তোমার মৌসুমি কৌতুক।' সঞ্জয়দার কবিতা। হেঁয়ালির মতো এই মৌসুমি-কৌতুকের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণের পরেও মাথা খুঁড়ে মরতে হয়, পৌঁছুতে হয় অন্য-এক উপলব্ধির উপান্তে : 'রাত্রিকে কোনো-দিন মনে হতো সমুদ্রের মতো ; / আজ সেই রাত্রি নেই, / হয়তো এখনো কারো হৃদয়ের কাছে আছে সে রাত্রির মানে ; / আমার সে-মন নেই / যে-মন সমুদ্র হতে জানে। / একবার ঝরে গেলে মন / সেই ঝরাফুল আর কুড়োবার নেই অবসর ; / তখন প্রখর সূর্য জীবনের মুখের উপর — ' তখন রাত্রির ছায়া জীবনের স্নায়ুর উপর —/ জীবন তখন শুধু পৃথিবীর আহ্নিক-জীবন।' পৃথিবীর আহ্নিক নিয়মের গতানু-গতিকতার চাপে, চৈত্র-রাঙা সারা কুসুম-মাস অপগত, জীবনের স্নায়ুর উপর রাত্রির ছায়া, এই সব-কিছু তো বিবৃতি, যা ঘটল সে-সম্পর্কে বুলেটিনের মতো, কী ক'রে প্রক্রিয়াগুলি ঘটে তা কিন্তু আমরা জানতে পারি না। জীবনধারার চাপ চেতনাকে গড়ে, তা হ'লেও এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন, আমাদের মধ্যে কেউ-কেউ আবেগ-সংকুল আবর্ত থেকে নিজেদের দিব্যি উদ্ধার ক'রে এনে ইতিহাসের হাতিয়ার হিশেবে আত্মনিয়োগ ক'রে চিত্তসুখ উপলব্ধি করছি, কয়েকজন তা পারছেন না, আহ্নিক-জীবন তাঁদের কাছে অখণ্ড অভিশাপ।

হয়তো সঞ্জয়দার চেয়েও দুর্জ্ঞেয়তর রহস্যে ছাওয়া তাঁর অগ্রজ অজয় ভট্টাচার্যের বিষাদ-কাহিনী। কিংবদন্তী পুরুষ, তীর্থপতি ইনস্টিটিউশনে বাংলার শিক্ষক, আমার বন্ধুবান্ধব যাঁরা ঐ বিদ্যালয়ে ছাত্র ছিলেন তাঁদের কথাবার্তা থেকে বুঝতে পারি, অতীব সুপুরুষ ছিলেন, পরিচর্যার সঙ্গে পোশাক করতেন, তিরিশ-চল্লিশের দশকে গীতিকার হিশেবে তিনি খ্যাতির শিখর থেকে শিখরে বিহার ক'রে বেড়াচ্ছেন, চলচ্চিত্রে এবং চলচ্চিত্রের বাইরে, তাঁর রচিত গানের পুঞ্জ-পুঞ্জ উপচার। এটা তো প্রায় বয়ানের মতো হয়ে গিয়েছিল, অজয় ভট্টাচার্যের কথা, সুরসাগর হিমাংশু-কুমার দত্তের সুর, শচীন দেববর্মণের কণ্ঠসম্ভার, বাংলা গানের যে-বিশেষ ধারা তখন থেকেই নাকি অভিহিত হ'তে থাকে 'আধুনিক' বলে, এই তিন প্রতিভার সম্মিলিত আনন্দসৃষ্টি। আমার স্মৃতিকে যে-গানটি সবচেয়ে বেশি আলোড়িত করে : 'আলো-ছায়া দোলা উতলা ফাগুনে বনবীণা বাজে / পথচারী অলি চলে যেথা কলি জাগে মধুলাজে। / মৃদু ফুলবাসে সমীর নিশাসে / অজানা আবেশ যেন ভেসে আসে…', এর পরেও আরো একটি-দুটি স্তবক, যা এখন আর স্পষ্ট মনে আনতে পারি না,

কিন্তু সেই গানের শ্বাসরুদ্ধকারী কুহক, কী ক'রে আলাদা করবো শচীনকর্তার কণ্ঠলাবণ্যকে, হিমাংশু দত্তর সুরক্ষেপণকে, অজয় ভট্টাচার্যের রচনার হৃদয়তাকে? হয়তো আলাদা করা সত্যিই সম্ভব ছিল না, সমন্বিত সৃষ্টি, যৌথ সৃষ্টি, যে-সৃষ্টির প্রসাদে আমার কৈশোর পারিজাতভূমিতে উত্তীর্ণ হ'য়ে যেত অহরহ।

অজয় ভট্টাচার্যকে নিয়ে বাঙালি সাংস্কৃতিক মহলে তখন লাফালাফি-লোফালুফি, প্রথাগত সফলতা ঢের তিনি ইতিমধ্যেই পেয়ে গিয়েছিলেন, আরো অনেকই তিনি অপ্রতিরোধ্যভাবে পেতেন। কিন্তু, অনেকেই জানতেন, আমরা কিশোররা যেহেতু জানতাম, জ্যেষ্ঠতরদেরও অবশ্যই জানা ছিল, কোথাও একটি ভয়ংকর অতৃপ্তির মাথা খুঁড়ে মরা, অজয় ভট্টাচার্য সব সময়ে গলায় চাদর জড়িয়ে থাকতেন, গলার নলি কেটে ইতিপূর্বে একবার আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন, তাঁর অনুজের মতোই, সেই চিহ্নটি ঢাকবার উদ্দেশ্যে। খ্যাতির শীর্ষে, সম্ভাষণের-অভ্যর্থনার বরণডালা প্রতিদিন তাঁর জন্য সতত-সজ্জিত, সমাজ তাঁকে উজাড় ক'রে সম্মান দিয়েছে, প্রগাঢ়তম ভালোবাসা জানিয়েছে। অথচ কিছুতেই কিছু হবার নয়, জীবনানন্দের বর্ণনায় সেই যে 'জানিবার গাঢ় বেদনার অবিরাম অবিরাম ভার', তা বয়ে বেড়ানো যেন সত্যিই সহ্যের বাইরে, অজয় ভট্টাচার্য তাই নিষ্ক্রান্তির সুযোগ খুঁজে বেড়ান, একবার অসফল হয়েছেন তাতে তিনি বিচলিত নন, দ্বিতীয় সুযোগ তৈরি ক'রে নেন, তাঁর লেখা গানের মূর্ছনায় আমাদের চন্দ্রাহত অবস্থা, আমাদের স্তব্ধ ক'রে দিয়ে তবু শেষ পর্যন্ত তিনি সুড়ুৎ ক'রে পালিয়েই গেলেন। তাঁকে তো আর বোঝানোর সুযোগটি রইল না, তাঁর অবসাদের চাইতেও তাঁর-প্রস্থানজনিত আমাদের অভিমান-অভাববোধ বহুগুণ বেশি ভারি।

পরাজয় মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই, দুই ভাইয়ের একজনকেও বাইরে থেকে বোঝা সম্ভব হয়নি, জীবনযন্ত্রণা চেতনার কোন্ তন্ত্রীকে ঠিক কত পরিমাণ আঘাত করলে নিজেকে অপসৃত ক'রে নেওয়ার বাসনা দুর্মর হয়ে ওঠে তা, সন্দেহ হয়, প্রথাগত অন্বীক্ষার ব্যাকরণে কদাচ ধরা পড়বে না। অথচ দৃশ্যটি কল্পনা করুন, বন্ধু হিমাংশু দত্ত পিয়ানো আগলে ব'সে আছেন, একটু-একটু ক'রে অজয় ভট্টাচার্য পংক্তি সংযোজন করছেন, সুরের প্রহারে ঐ ছোট্ট কামরায় নিশ্বাস-প্রশ্বাস প্রায় নিরুদ্ধ: 'বনের কুহুকেকা সনে / মনের বেণুবীণা গায়, / দখিনা মধু সমীরণে / অধরা ধরা দিতে চায়। / সহসা এলে তুমি ভুলে, / কানন ছেয়ে গেল ফুলে, / মুকুল মৃদু আঁখি তুলে / জাগিল সুখবেদনায়। / ঘুমের দেশে ছিনু ঘুমে, / স্বপনে এলে কে গো তুমি, / রাঙালে হিয়া আঁখি চুমে / উতলা বনভূমি। / তন্দ্রা তটছায়ানীড়ে / তৃষার দিশাহারা তীরে / কামনা আজি কেঁদে ফিরে, / প্রাণের এ কী খেলা হায়॥' অদ্ভুত শব্দ, 'সুখবেদনা'। অজয় ভট্টাচার্য-সঞ্জয় ভট্টাচার্যের শাদামাটা বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম, তাঁরা তাঁদের স্বজনপ্রতিষ্ঠার দায় সামলেও, গৃহী হ'তে পারতেন, বিষয়ী হ'তে পারতেন, চতুর হ'তে পারতেন। কেন

হলেন না, সুখবেদনা কেন তাঁদের প্রান্তসীমার দিকে তাড়িয়ে-তাড়িয়ে বেড়ালো, কেন তাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন যে কবিতা-গান রচনার অসহ্য উপভোগ থেকে অব্যাহতি অত্যাবশ্যক, তার একটা-দুটো দর্শনঠাসা উত্তর আমরা মনে-মনে তৈরি করতে পারি, তা শুনতে পেলে সঞ্জয় ভট্টাচার্য অবশ্যই অবজ্ঞার হাসি হাসতেন, তাঁর উন্মার্গগামিতার সঙ্গে আমাদের পাল্লা দেওয়ার প্রয়াস বালখিল্যতা, নয়তো বাতুলপ্রস্তাব। কিছু-কিছু রহস্য তাই কুয়াশার আড়ালেই ঢাকা থাক।

'ধূর্জটি, এই অবস্থায় একটু ইষ্টনাম করতে হয়'

ধুন্ধুমার কাণ্ড, যুক্তির বিশ্বাস বনাম ভক্তির আস্ফালন। ভক্তিবাদীর দল নিজেদের প্রত্যয় আগলে নিভৃতে নিমগ্ন থাকতে আর রাজি নন। পাড়াপড়শি সবাইকে তাঁদের প্রত্যয়ের সঙ্গে অন্বিত করতে আপাতত দৃঢ়বদ্ধ তাঁরা। যদি আমি-আপনি অন্বিত হ'তে না-চাই, হৈ-রৈ রামায়ণ কাণ্ড, আমাদের ঘাড়ে কটা মাথা, কোতল হবো আমরা। ভক্তি এখন অসহিষ্ণুতার নামান্তর, সুকুমার রায়ের 'তুমিও ভালো আমিও ভালো'র দর্শনবৃত্তান্ত থেকে ছিটকে অনেক দূর বেরিয়ে এসেছে আমাদের ভূমণ্ডল। যাঁরা ভক্তিকে আলতো করে পাশে সরিয়ে রেখে যুক্তির দোহাই পাড়বেন, তাঁদের স্থান নেই এই অখণ্ড ভারতবর্ষে, সংবিধানে সে যে-কথাই লেখা থাকুক না কেন।

ভক্তির এই হিংস্র রূপ হয়তো অচিরেই গোটা দেশ জুড়ে বিবমিষার উদ্রেক করবে, এখানে-ওখানে একটু-একটু ক'রে, প্রতিবাদের, ক্রমশ প্রতিরোধের প্রাচীর গ'ড়ে উঠবে, ভারতবর্ষের পাপস্খালন ঘটবে, যুক্তির অবৈকল্য পুনঃপ্রমাণিত হবে। আপাতত কয়েকটা দিন অশ্লীলতার ঘেরাটোপে বন্দী অবস্থায় কাটাতে হবে, এটা ঠিক নিয়তি নয়, পৌরুষ থেকে সাময়িক বিচ্যুতিজনিত পাপের শাস্তি। কিংবদন্তীর অজগর সাপের মতো হিংসায়-বিদ্বেষে-গরলাধিক্যের সমারোহে ভক্তি তার বিক্রম প্রদর্শন করছে, যে-কোনো মুহূর্তে যে-কাউকে কামড়ে দেবে যেন।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল ভক্তির এক সকাতর অতি-বিনম্র রূপও একদা প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

দিলীপকুমার রায়কে জীবনে ঐ একদিনই দেখেছিলাম। ১৯৬১ সালের গ্রীষ্মকাল, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কঠিন কর্কট পীড়াগ্রস্ত, আরোগ্যের বিন্দুতম সম্ভাবনা নেই, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীটে দ্বিজেন মৈত্র মশাইয়ের বাড়ির তেতলায় আছেন। প্রবাসে থাকি, মাসখানেকের ছুটিতে দেশে এসেছিলাম, ফিরে যাওয়ার সময় আসন্ন, তাঁর সঙ্গে শেষবারের মতো দেখা করতে গেছি। বৈশাখের রৌদ্র-প্রখর সকাল। ধূর্জটিপ্রসাদ বিছানায় শায়িত, পীড়ার অসহ্য যন্ত্রণা, কখনো সামান্য চেতনা ফিরছে, পরক্ষণে অচৈতন্যের ঘোর। যখন ঈষৎ জ্ঞানভাব ফিরে আসছে, কষ্টে চোখ মেলে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখছেন, কোনো-কিছু বলতে চাইছেন যেন, কিন্তু কণ্ঠনালিতে ভয়ংকর রোগ বাসা বেঁধেছে, যা নির্গত হচ্ছে তা ফিশফাশ প্রেতস্বর। রোগশয্যার পাশে অসহায় চুপচাপ ব'সে আছি, বৈশাখের রৌদ্রসমাচ্ছন্ন মন্থর সকাল।

হঠাৎ হুড়মুড় করে সিঁড়ি ভেঙে দিলীপকুমার রায়। টকটকে গেরুয়া-লাল বসন, গেরুয়া-লাল নামাবলি, শরীর থলথলে, কানে আদৌ শুনতে পান না। যে-ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গে সৌহার্দ্যে, সখ্যতায় বছরের পর বছর ধরে আড্ডা দিয়েছেন, তর্ক করেছেন, সংগীতের ধ্রুপদী-মাহাত্ম্য নিয়ে আলোচনায় বিস্তৃত হয়েছেন, পরস্পরকে ব্যঙ্গে-কৌতুকে আপন্ন করেছেন, তাঁকে, আমারই মতো, একবার শেষ দেখা দেখতে এসেছেন। সঙ্গে গেরুয়াধারী এক মৃদুভাষী সদালাপী শিষ্য, ইতিপূর্বে নাকি সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, নাম ইন্দ্রদেব। ঠিক মনে পড়ছে না, একজন শিষ্যাও বোধহয় ছিলেন, ইন্দিরা দেবী।

অতঃপর একটি অতি বিচিত্র দৃশ্যের অবতারণা। রোগাচ্ছন্ন, শয্যাশায়ী ধূর্জটিপ্রসাদকে ঐ অবস্থায় দেখে দিলীপকুমার রায় আবেগাকুল। দু-একবার ঝুঁকে প'ড়ে গমগমে গলায় সম্ভাষণ করলেন, ঘর কাঁপিয়ে উচ্চারণ : 'ধূর্জটি, আমি মন্টু, তোমাকে দেখতে এসেছি।' হয়তো, একটি চকিত মুহূর্তের জন্য, ধূর্জটিপ্রসাদ বুঝতে পারলেন, কষ্ট ক'রে চোখ মেলে তাকালেন, চিনতে পারলেন, পরক্ষণে চেতনা মিলিয়ে গেল. কয়েক মিনিট বাদে ফের হয়তো চোখ খুললেন, দিলীপ-কুমারকে স্তিমিত, দুর্বল দৃষ্টি দিয়ে খুঁজে বেড়ালেন।

ধূর্জটিপ্রসাদের অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণা, তার জন্য কাতরতাবোধ কিন্তু তা-ও ছাপিয়ে, দিলীপকুমারের প্রধান চিন্তা, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, পৃথিবীর মায়া ছেড়ে যাওয়ার অন্তিম মুহূর্তের কাছাকাছি প্রায় পৌঁছে গেছেন তাঁর আবাল্য সুহৃদ, ঐ মুহূর্তে ঈশ্বরের শরণ নেওয়া ছাড়া তো গতি নেই. ঈশ্বরই শান্তির প্রলেপ বুলোবেন, স্বস্তির আচ্ছাদনে ঢেকে দেবেন চৈতন্যের স্তরের পর স্তর।

যে-চেয়ারটিতে বসেছিলেন দিলীপকুমার, আরো একটু বিছানার কাছে টেনে নিয়ে এলেন, ধূর্জটিপ্রসাদের মুখের উপর অনেকটা ঝুঁকে প'ড়ে, দিলীপকুমারের ব্যাকুল মিনতি : 'ধূর্জটি, এই অবস্থায় একটু ইষ্টনাম করতে হয়। ধূর্জটি, আমি উচ্চারণ করছি, আমার সঙ্গে একটু ইষ্টনাম করো।' ভক্তির প্রত্যয়, প্রত্যয়ের নম্রতা-গভীরতা, ধূর্জটিপ্রসাদ যদি তাঁর সঙ্গে, অন্তত একবার-দুবার ঈশ্বরের স্তব করেন, স্বগত প্রার্থনা জানান ভগবানের পদপ্রান্তে, শান্তির ঢল নামবে, পীড়ার জ্বরজ্বালা মিলিয়ে যাবে, পরলোকে অপেক্ষমাণ থাকবে পরম স্বস্তি।

নাস্তিক ধূর্জটিপ্রসাদ, সারা জীবন বুদ্ধির চর্চা করেছেন, যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ ক'রে ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, মৃত্যুশয্যায় শায়িত, শরীরে পীড়াজনিত অসহ্য যন্ত্রণা, সাধক দিলীপকুমার, পরমভক্ত দিলীপকুমার তাঁর কাছে সকাতর প্রার্থনা জানাচ্ছেন : 'ধূর্জটি, আমি মন্টু, ধূর্জটি, এই অবস্থায় একটু ইষ্টনাম নিতে হয়। ধূর্জটি, ভাইটি আমার, সমস্বরে আমার সঙ্গে একটু ইষ্টনাম করো।'

কিন্তু না, যুক্তিবাদী ধূর্জটিপ্রসাদকে ঐ অবস্থাতেও টলানো সম্ভব হলো না, বুদ্ধির বাইরে কোনো অতিপ্রাকৃত সর্বশক্তিমান উপস্থিতি নেই, যুক্তির শাণিত থেকে

শাণিততর প্রহারে চেতনাকে, অনুভূতিকে, আবেগকে একটি বিশেষ মীমাংসার প্রান্তে, দিনের পর দিন, পৌঁছে দিয়েছেন : ঈশ্বর অলীক, নিজের ভাগ্য, নিজের ভবিষ্যৎ, মানুষ নিজেই রচনা করে। দিলীপকুমার রায় ঝুঁকে প'ড়ে উচ্চারণ ক'রে যাচ্ছেন, প্রায় আর্তনাদের মতো তাঁর সেই কাকুতি : 'ধূর্জটি, একটু ইষ্টনাম করো'। হঠাৎ, ধূর্জটিপ্রসাদ যেন বন্ধুকে উতোর শোনাচ্ছেন, সমস্ত রোগযন্ত্রণাকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ ক'রেই যেন, ক্রমান্বয়ে ফিশফিশ উচ্চারণরত হলেন : 'ঈশ্বর নেই, ঈশ্বর নেই, ঈশ্বর নেই…'। যেন তাঁর ভক্তিসমুদ্রে নিমজ্জিত অতি-অন্তরঙ্গ সখাকে শেষবারের মতো জানিয়ে দিতে চাইলেন, দিলীপকুমার যতই তদ্গত হোন না কেন, যতই তাঁকে, ধূর্জটিপ্রসাদকে, ইষ্টনাম জপাতে প্রয়াস করুন না কেন, কোনো অবস্থাতেই তিনি যুক্তিবাদ থেকে ব্রাত্য হবেন না : যুক্তি তাঁকে শিখিয়েছে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অপ্রাসঙ্গিক, যার প্রসঙ্গ নেই, তার অস্তিত্ব নেই, ঈশ্বর নেই, ঈশ্বর নেই, ঈশ্বর নেই।

কানে একেবারে শুনতে পান না, বুঝতে পারছেন ধূর্জটিপ্রসাদ নামতা উচ্চারণের মতো একটা-কিছু বলছেন, আমার দিকে ফিরে বারবার দিলীপকুমারের সকাতর প্রশ্ন : 'কী, কী বলছে ধূর্জটি? আপনিও ওকে একটু ইষ্টনাম করতে বলুন না?' একটি যুগলবন্দীর ঘটনা যেন। 'ধূর্জটি, এই অবস্থায় একটু ইষ্ট নাম শরণ করতে হয়', সনম্র, ভক্তিসম্পৃক্ত অনুরোধ। অন্য দিকে, কণ্ঠস্বর প্রায় নির্বাপিত, অবর্ণনীয় শারীরিক যন্ত্রণা, কিন্তু চেতনা ঐ অবস্থাতেও তার যুক্তির গর্ব থেকে বিচ্যুত হ'তে গররাজি, অতএব, বৈশাখের থমথমে সকালে ঘর কাঁপিয়ে গুঞ্জন : 'ঈশ্বর নেই, ঈশ্বর নেই'।

যুক্তির বিশ্বাস বনাম ভক্তির প্রত্যয়। ভক্তির কাছে ধূর্জটিপ্রসাদের যুক্তিবাদী চেতনা আত্মসমর্পণে অসম্মত। অথচ, এই এতগুলি বছর বাদে, দিলীপকুমার রায়ের ভক্তির ব্যাকুলতাকেও সম্মান, শ্রদ্ধা জানাতে ইচ্ছা হয় আমার।

সেই ভক্তি এখন বর্বরতার কুম্ভীপাকে।

তবুও বাড়ির নাম 'নীলমন'

সাহিত্যবিচারে আমি সম্পূর্ণ নিরক্ষর, আড়ি পেতে কখনো-সখনো পণ্ডিত মানুষদের আলাপ-আলোচনা শুনি। নাট্যসাহিত্য নিয়েও আলোচনা শুনি। একদা 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় শম্ভু মিত্র নাট্যচর্চা বিষয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, উৎকৃষ্ট নাটক রচনার সমস্যা শুধু নয়, অভিনয়কলা, মঞ্চসজ্জা, আলোক প্রক্ষেপণ, আবহসংগীত, সমস্ত কিছু নিয়েই তিনি বিশদ ক'রে লিখেছিলেন, শুনতে পাই সেই প্রবন্ধগুলি এখন বই আকারেও পাওয়া যাচ্ছে। গিরিশচন্দ্রের নাট্যকীর্তি নিয়ে উৎপল দত্তের বিশাল গ্রন্থ যুগপৎ পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধ্যের প্রমাণ বহন করছে। এখান-ওখান থেকে তথ্য সংগ্রহ ক'রে, তার সঙ্গে কল্পনার প্রলেপ মিশিয়ে, আদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক তত্ত্ব জুড়ে দিয়ে, সর্বোপরি তাঁর অসামান্য মঞ্চপ্রতিভার মণিকাঞ্চন সহযোগে উৎপল দত্ত নাটকের পর নাটক উপস্থাপন ক'রে একদিকে যেমন নাট্যচর্চাকে লোকায়ত ক'রে এনেছেন, সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রামের অস্ত্র হিশেবে নাটককে প্রয়োগ করতে শিখিয়েছেন, সেই সঙ্গে সর্বস্তরের জনসাধারণকে সম্মোহন দিয়ে কাছেও টেনে এনেছেন। বাংলা নাট্যের গত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে এই দুই ব্যক্তিত্বের প্রভাব আমরা স্বতঃসিদ্ধ হিশেবে এখন মেনে নিয়েছি। অথচ এই মেনে নেওয়ার পাশা-পাশি এক গভীর শূন্যতার অনুভূতিও। অনুবাদ হচ্ছে, ছায়ানুসরণ হচ্ছে, কিন্তু মৌলিক নাটক রচনার ধারা বাংলাসাহিত্যে প্রায় অবলুপ্ত, গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন থমকে দাঁড়ানো, কাঁহাতক আর অন্য দেশের সাহিত্য থেকে টুকে এনে সমকালীন বাঙালি সমস্যার সঙ্গে জোড়াতালি দিয়ে মেলানো, যে-প্রথা একাদিক্রমে প্রায় তিরিশ বছর ধ'রে চলেছে? আপাতত কেউই যেন এই সংকট থেকে পরিত্রাণের উপায় বাৎলাতে পারছেন না।

হঠাৎই অন্য-একটি প্রসঙ্গ মনে এল আমার। আজ থেকে পঁয়ষট্টি-সত্তর বছর পিছিয়ে যাচ্ছি, নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের গৌরবের শীর্ষ সময় সেটা, বাঙালি সাহিত্যিক-নাট্যকার সম্প্রদায় একটি বিশেষ সমস্যা নিয়ে ভাবিত হ'য়ে পড়েছিলেন। ঠিক সংকটের আবর্তে তাঁরা তখন নিপাতিত বলা বাড়াবাড়ি হবে, তবে একটি মৃদু অস্বস্তির মধ্যে ছিলেন: বাংলা সাহিত্যে একাঙ্ক নাটক আদৌ লেখা হচ্ছে না, ধ্রুপদী নাটকের আকার-বিস্তার-কাঠামো-পরিকাঠামোর ঐতিহ্য সংস্কৃত সাহিত্য থেকেই আহৃত, ইওরোপীয় নাটকের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে তেমন-কোনো বাড়তি বৈচিত্র্যের ঢেউ আমাদের উপকূলে এসে ধাক্কা দেয়নি। অথচ সেই বিশেষ অপূর্ণতাটি থেকে-থেকে বিঁধছিল: আমাদের নাট্যচর্চাপ্রয়াসীরা কিছুতেই এক

অঙ্কের নাটকের কুশলতার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারছিলেন না, ছোটো আর্শিতে গোটা পৃথিবীকে প্রতিবিম্বিত করতে যে-আলাদা প্রতিভার প্রয়োজন, যে-বিশিষ্ট দক্ষতা, কিছুতেই রপ্ত হচ্ছিল না তা।

দুজন যুবক যশোপ্রার্থী, বেপরোয়া উৎসাহে শূন্যস্থানটি পূর্ণ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন, দুজনেই তখনো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, দুজনেরই নাম মন্মথ। মন্মথ রায়, তাঁর 'কারাগার', 'বিদ্যুৎপর্ণা' প্রভৃতি নাটকের অভূতপূর্ব সাফল্যের হেতু, অচিরে বিখ্যাত হলেন, বাংলা একাঙ্ক নাটকের বিবর্তনের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে থেকেছে, এখনো জড়িয়েই আছে। অথচ অন্য যে-মন্মথ, মন্মথনাথ ঘোষ, যিনি একই সময়ে বেশ কয়েকটি মৌলিক একাঙ্ক নাটক মকশো করেছিলেন সেই বিশের দশকে, তিনি কোনো স্বীকৃতিই পেলেন না তাঁর রচিত নাটকগুলির জন্য। এখন বৃথা অন্বেষণ। যদি তেমন সৌভাগ্যবান কেউ-কেউ থাকেন, স্বল্পায়ু 'প্রগতি' পত্রিকার কীটদষ্ট কয়েকটি সংখ্যা সযত্নে রক্ষা করতে সফল হয়েছেন, তাঁদের সৌজন্যে মন্মথনাথ ঘোষের একটি-দুটি নাট্যপ্রয়াসের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার এখন একমাত্র সম্ভাবনা। এটাও সঙ্গে-সঙ্গে স্বীকার করতে হবে, এখন পড়তে গেলে তখনকার এ-সমস্ত প্রয়াসকে যথেষ্ট আড়ষ্ট, অসম্ভব কষ্টকল্পিত মনে না হ'য়ে হয়তো পারে না। শম্ভু মিত্র-উৎপল দত্তরা বাঙালির নাট্যসংজ্ঞায় এমন আমূল বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছেন, আজ থেকে সত্তর বছর আগেকার প্রেক্ষিত-অনুষঙ্গ ভুলে-মেরে দিয়ে যদি তৎকালীন নাট্যপ্রয়াসের বিচার করতে বসি, ভয়ংকর অনৈতিহাসিক হবে তা।

মন্মথনাথ ঘোষ হারিয়ে গেছেন, বাংলা নাট্যসাহিত্যের এমনকি পুরাবৃত্তেও তাঁর নামোল্লেখ থাকবে না, সর্ব অর্থেই তিনি বিস্মৃত। ইংরেজি সাহিত্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যুজ্জ্বল ছাত্র, পরে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েরই অধ্যাপক, আরো পরে আমাদের অনেকের শিক্ষক। সজ্জাবিলাসী ছিলেন, শৌখিন তাঁতের ধুতি মাটিতে লুটিয়ে পরতেন, মিহিন আদ্দির ধবধবে পাঞ্জাবি, অতি ফিনফিনে কারুকার্যখচিত চাদর গলায় একটা মোচড় দিয়ে মস্ত লম্বা মানুষটির পায়ের কাছে নামত, হাতে, প্রায় সব-সময় প্রজ্বলন্ত, দামী বিলিতি সিগারেট। তাঁর কাছে অধ্যয়নের সুযোগ না পেলে নন্দনতত্ত্বের নিগূঢ় আস্বাদ আমাদের অনেকের কাছে চিরদিনের মতো অপরিজ্ঞাত থেকে যেত। থেমে-থেমে কেটে-কেটে শেক্সপীয়রের নাটকের পংক্তি বা স্তবক, অথবা অন্য-কারো কবিতা, উচ্চারণ করতেন, উচ্চারণ, আবৃত্তি. নাকি মাঝামাঝি কোনো সংস্থান। পংক্তিটি বার-বার ক'রে পড়ছেন, তা থেকেই যেন বিশ্লেষণের আকর বেরিয়ে আসছে; ঐ পংক্তির অভিব্যক্তির, কে জানে, সম্ভবত অনেকগুলি স্তর, সেই প্রত্যেকটি স্তরে মন্মথবাবু আমাদের পৌঁছিয়ে দিতে চাইছেন, একটি বিশেষ নারী বা পুরুষের অন্তর্যন্ত্রণার সঙ্গে মানবসমাজের সার্বিক দ্বন্দ্ব-আর্তি-হৃদয়যন্ত্রণার সমান্তরলতা প্রতিষ্ঠিত-প্রমাণিত-দৃষ্টান্বিত হ'য়ে যাচ্ছে। পিরিয়ডের সারা সময় জুড়ে মন্মথবাবু নিজেকে এবং আমাদের আটকে রাখলেন হয়তো মাত্র

ছয় কি সাতটি পংক্তির পরিসীমায়, তাতে কী, আমরা এক মায়াবী রূপকথার রাজ্যে অনুপ্রবিষ্ট, এক অলৌকিক উপত্যকা, আবেগের উদ্বেল বেলাভূমি, পরতের পর পরত, স্তবকের পর স্তবক, উদ্বেগ-পীড়ন-আনন্দ-বেদনার নিষ্কাশন, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথাগত ক্লাস করতে এসেছিলাম, আমাদের অস্তিত্বকে দুমড়ে-মুচড়ে মন্মথবাবু অথচ আমাদের অসহায়ত্বের নির্বাসনে পাঠিয়ে দিলেন, নির্বাসনের একাকিত্ব, উপলব্ধির মগডালে এক অসহ্য আনন্দের আবিষ্কারের বিশেষ্যবিশেষণ-অতিক্রান্ত অভিজ্ঞতা। কম-বেশি যতই চেষ্টা করি না কেন, সেই নিঃসঙ্গতা থেকে ঠিক পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারিনি এখনও: সেই নৈঃসঙ্গের ঘোর, একটি বিশেষ মানুষের হৃদয়ের ইতিকথা উন্মোচনের কশাঘাতে তা পর্যুদস্ত, অথচ সেই ইতিবৃত্ত সামগ্রিক জগৎসংসারের মহত্ত্ব-গর্ব-গৌরব-ব্যর্থতা-শোক-অসাফল্যের ছেঁকে-তুলে-ধরা উপাখ্যানও। মানুষ ও সমাজ, মানুষ ও প্রকৃতি, মানুষ ও অপ্রাকৃত, কী ক'রে যেন পরস্পরের সঙ্গে একীভূত; মহৎ সাহিত্যের হয়তো সেটাই কষ্টিপাথর। ঘণ্টা পেরিয়ে যেত, মন্মথবাবু ছ-সাত পংক্তির বেশি অতিক্রম করতেন না, কিন্তু 'সাহিত্য' কেন 'সহিত' শব্দ থেকে উদ্ভূত আমাদের অভিজ্ঞানে সে-সম্পর্কে কোনো ফাঁকি থাকত না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, মুদ্রাস্ফীতি, মূল্যবৃদ্ধি, দেশভাগ। পরিচিত পৃথিবী আচমকা অন্যরকম হ'য়ে গেল। দেশ দু-টুকরো হবার কিছুদিন আগেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চ'লে গিয়ে দিল্লিতে অধ্যাপনায় ফের স্থিত হলেন মন্মথবাবু, কিন্তু একাঙ্ক নাটকের মোহ থেকে একদা যেমন মুক্ত হয়েছিলেন, সাহিত্য সম্বন্ধেও তাঁর সম্মোহন ততদিনে অবসিত। স্বাধীন ভারতবর্ষে, এবং তার রাজধানী নতুন দিল্লিতে, অঙ্গুলিমেয় কিছু ব্যক্তির কাছে পার্থিব সাফল্যের বিচিত্র নানা সুযোগ হঠাৎ অবারিত দ্বার। সাহিত্যের অধ্যাপক মন্মথবাবু যে অমৃত-নির্যাসে এত-এত বছর ডুবে ছিলেন, বুঝতে পারলেন পৃথিবীর বিচারে তা তুচ্ছাতিতুচ্ছ, বিমূঢ় চিত্তে তিনি নিরীক্ষণ করলেন অতি সাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির মানুষ বিবিধ চতুরালির সাহায্যে একটির-পর-আরেকটি সুবিধাকে কী ক'রে করতলগত আমলকী ক'রে ফেলেছেন, এমনকি অর্থ-নীতির বা বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপকেরা পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ধান্দার ভিড়ে মিশে গিয়ে সাচ্ছল্যে-বৈভবে পৌঁছুচ্ছেন, তাঁদের জীবনযাত্রায় ঐহিক পরি-তৃপ্তির ছোঁয়া লেগেছে।

মন্মথবাবুর পক্ষে এই পরিস্থিতি, এখন মনে হয়, মেনে নেওয়া দুরূহ হ'য়ে পড়েছিল, তাঁর সমগ্র সত্তা, চেতনা, বিচারবুদ্ধি একটি বিশেষ ক্রোধে ক্রমশ আক্রান্ত, এ-ধরনের অন্যায় মেনে নেওয়া যায় না, মেনে নেওয়া পাপ, অথচ তিনি একা লড়াই ক'রে বেবুঝ্যা পৃথিবীকে ন্যায়ের রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে পারবেন না। অতএব অন্য চতুরালির মধ্যবর্তিতার উপর নির্ভর করতে হবে। বৈশ্য পৃথিবীকে তিনি প্রমাণ করিয়ে ছাড়বেন, তিনিও এই ফড়েদের-ফেরেব্বাজদের-ধুরন্ধরদের-সুযোগসন্ধানীদের

সমকক্ষ হওয়ার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন। মন্মথবাবু সাহিত্যের বই পড়া ছেড়ে দিলেন, গ্রীক ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে তাঁর অনুরাগে যবনিকা পতন ঘটল, নাম-কা-ওয়াস্তে অধ্যাপনায় নাম লেখানো রইল, নিয়মরক্ষার জন্য সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা হয়তো ক্লাস নিতে যেতেন, কিন্তু আস্তে-আস্তে বিদ্যাচর্চা থেকে অনেক দূরে স'রে গেলেন তিনি। কবিতার বই বাক্সবন্দী রইল, ভুলে গেলেন একদা নাট্যসাহিত্য নিয়ে, শেক্সপীয়রের ভবিতব্য-তাড়িত নায়কনায়িকাদের যন্ত্রণার দাহনে জ্ব'লে-পুড়ে তাঁর দিনের পর দিন, রাতের পর রাত অতিবাহিত হয়েছে। সংসারে ব্যয়সংকোচ করতে হবে, একটি বিশেষ কারণে ব্যয়সংকোচ করতে হবে। খবরকাগজ নেওয়া বন্ধ ক'রে দিলেন, অতঃপর শুধু একটি ব্যাবসাসংক্রান্ত দৈনিক পত্রিকা তাঁর বাড়িতে আসত। প্রতিদিন ঐ ব্যবসায়িক কাগজ ঘেঁটে ফাটকাবাজারের গতিপ্রকৃতি-হালচাল-রীতিনীতি একটু-একটু ক'রে মন্মথবাবু নিজেকে শেখালেন, সংসারের অন্য-সমস্ত খরচ নির্দয়ভাবে ছেঁটে ফেলে প্রতি মাসে সঞ্চিত সমস্ত অর্থ ফাটকাবাজারে খাটাতে শুরু করলেন। মন্মথবাবু সাহিত্য ভুললেন, মানুষ, সমাজ, প্রকৃতি, অলৌকিকতা, তাদের পারস্পরিক বিনিময়-প্রতিবিনিময়ে যে-ভয়ংকর সৌন্দর্যের জন্ম, এমন সর্ববিধ প্রসঙ্গ মন থেকে বিসর্জন দিলেন, তাঁর ধ্যানজ্ঞানক্রিয়াকর্ম একমাত্র ফাটকাবাজার। তিনি সাফল্যে পৌঁছুলেন, ফাটকাবাজারে কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা করলেন, সেই টাকা বহু হিশেব ক'ষে ফের ফাটকাবাজারে ঢাললেন, পুনঃপৌনিক বিনিয়োগ, যা তাঁর প্রকৃতিগত অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল, তাঁর উপার্জন ক্রমশই ঊর্ধ্বতরগতি। বৈশ্য পৃথিবীকে তিনি প্রমাণ করিয়ে দেখালেন একদা-সাহিত্যের-অধ্যাপক অন্য স্বর্গের দুয়ারেও ইচ্ছা করলে পৌঁছুতে পারেন, যদিও নরকের দ্বারও হ'তে পারে সেটা।

তাঁর এই দক্ষিণায়ন আমাদের বিমূঢ় করেছিল, কিন্তু কী অধিকার আছে আমাদের বিচারের যূপকাষ্ঠে তাঁর আচরণকে চিরে-ছিঁড়ে বিশ্লেষণান্তে ফতোয়া জারি করার? শেষের দিকে যখন দেখা করতে যেতাম, বরাবরই অতি স্নেহপ্রবণ ছিলেন, সেই স্নেহের ফল্গুধারা অব্যাহত, তাঁকে যে ভুলে যাইনি, সেই কারণে খুশিতে উদ্ভাসিত, আপ্যায়ন-পরিচর্যার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠতেন। অথচ, মুহ্যমান বিষণ্ণতার সঙ্গে লক্ষ্য করতাম, তাঁর কাছে বৃত্তি আর বিনোদন এক হ'য়ে গেছে, যতবারই গেছি, কিছু নিরেট অতি শাদামাটা কয়েকজনের সঙ্গে ব'সে তাশ পিটে জুয়ো খেলছেন, খেলাতে খেলা হলো, টাকাতে টাকা হলো। মাঝে-মাঝে রঙ্গ ক'রে আমাকে বলতেন, তোমাদের 'স্বাধীন' অর্থনীতি তো এই কথাই বলে, যে যত মুনাফা দেখাতে পারবে, যে যত টাকা কামাতে পারবে, সে-ই দক্ষ, সে-ই মান্য, উপায় বা পদ্ধতি নিয়ে ভাবার প্রয়োজন নেই। আখের গুছোনোই তো মহত্তম ব্রত, সমাজের কী হলো তা নিয়ে ব'য়েই গেছে ভাবতে।

আমার চেয়ে পঁচিশ বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষকের সঙ্গে তর্ক আমাকে মানাত

না, মাথা নিচু ক'রে থাকতাম। শুধু বুকের মধ্যে একটি অস্থির আর্তনাদ, কারণ হঠাৎ চোখে পড়ত ততদিনে মন্মথবাবুর একমাত্র পাঠ্য হ্যারল্ড রবিনসের কিছু ছেঁড়া-খোঁড়া বই।

সমাজের কী হলো, নাটকের কী হলো, সাহিত্যের কী হলো সে-সব নিয়ে আর সময় নষ্ট করতে মন্মথবাবু রাজি ছিলেন না। তা হ'লেও, মাঝে-মাঝে, নিশ্চয়ই একটি তাড়না তাঁকে ধাওয়া ক'রে ফিরত, নইলে, নতুন দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্কে মস্ত বড়ো বাড়ি তুলেছিলেন, সেই বাড়ির নাম, নিজের নাম মন্মথ, স্ত্রীর নাম নীলিমা, এই দুই নাম মিলিয়ে কেন রাখতে যাবেন 'নীলমন'।

কয়েক বছর হলো মন্মথনাথ ঘোষ প্রয়াত, ইতিহাস থেকে তিনি নিশ্চিহ্ন, মানুষের আবেগের সঙ্গে প্রকৃতির ব্যভিচারকে, অপ্রাকৃতের রহস্যকে মেলানোর দায়ভার আর বইতে হবে না কাউকে।

ব্যাকুল বাদল সাঁঝে

আমরা বলতাম, তিন নম্বর দিলীপ রায়, পণ্ডিতচেরীর দিলীপকুমার ও রজনীকান্ত-দৌহিত্র থেকে আলাদা ক'রে চেনবার জন্য। বরাবরই একটু জেদি, একটু খ্যাপাটে, ছাত্র ফেডারেশনের তন্নিষ্ঠ কর্মী, সেই সঙ্গে অভিনয়-ছবি আঁকা-গান গাওয়া, দুর্দম প্রাণশক্তি, যা প্রপাতের মতো ছড়িয়ে পড়ত। ঘটনাটি অন্নদাশংকর রায় মশাই হয়তো পুরোপুরি বিস্মৃত হয়েছেন। পঁচিশে বৈশাখ ; কোন্ সংগঠনের পক্ষ থেকে এখন আর মনে নেই, পঁচিশে বৈশাখ উদ্‌যাপন। রজনীগন্ধা-সমাচ্ছন্ন সন্ধ্যা, বিশিষ্ট-সুবেশ ভিড়, অন্নদাশংকর অনুষ্ঠানের সভাপতি, আহূত হ'য়ে তিন নম্বর দিলীপ রায়ের প্রারম্ভ সংগীত: 'আমার দিন ফুরালো ব্যাকুল বাদল সাঁঝে'। দিলীপ রায়ের গান শেষ, ঠিক তার পরেই যে-মহিলা গাইতে সবে শুরু করবেন, তাঁর দিকে তাকিয়ে অন্নদাশংকরের অতর্কিত অনুরোধ: 'আপনি দয়া ক'রে একটু আনন্দের গান গাইবেন। আজ একে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন, তায় গ্রীষ্মকাল, এর মধ্যে ব্যাকুল বাদল সাঁঝে-ফাঁঝে গাওয়া কেন?' তিন নম্বর দিলীপ রায়, চিরকালের খ্যাপাটে, কাউকে ছেড়ে কথা কইবার পাত্র নয়, তড়াং ক'রে তার আসন থেকে উঠে দাঁড়ানো, রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে কেন সে 'আমার দিন ফুরালো' গাওয়াই সবচেয়ে উপযুক্ত মনে করেছে তার দার্শনিক ব্যাখ্যা, তর্কবিতর্কে অন্নদাশংকরও কিছু কম যান না, আধঘণ্টা ধ'রে উত্তেজিত বাদানুবাদ, প্রায় দক্ষযজ্ঞের হুলস্থুল, অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের কাঁদো-কাঁদো মুখ।

আসলে তিন নম্বর দিলীপ রায় ইতিমধ্যেই তার সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছিল, তার মতো মানুষের কথা ভেবেই হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-আবু সয়ীদ আইয়ুবেরা, সেই তিরিশের দশকে, 'অবৈকল্য' কথাটি প্রচলন করেছিলেন। ব্যাকুল বাদল সাঁঝে তার দিন ফুরিয়েছে, খ্যাপাটে দিলীপ তার সিদ্ধান্তে অবিচল, কয়েক বছর বাদে হঠাৎ একদিন পৃথিবী থেকে সে নিজেকে সরিয়ে নিল। পঁচিশে বৈশাখ প্রতি বছর নিয়ম ক'রে আসে, যায়, কিন্তু তিন নম্বর দিলীপ রায়ের দার্শনিক সমস্যা নিয়ে কাউকে আর মাথা ঘামাতে হয় না, এখনও টিঁকে-থাকা গুটিকয় বন্ধুর পারস্পরিক আলাপের বাইরে তিন নম্বর দিলীপ রায়ের আর অবস্থান নেই।

প্রত্যেকেরই সম্ভবত দিন ফুরোয়। অন্য এক সন্ধ্যার কাহিনী তাই বিবৃত করি। দেশের খাশ রাজধানী, উঁচু মহলের এক আমলার বাড়িতে নৈশভোজের নিমন্ত্রণ, মস্ত বড়ো বসবার ঘর জুড়ে আট-দশটি প্রতিভাধর যুবকের উদ্দাম আড্ডা, এরই মধ্যে চোখে পড়লো নিমন্ত্রণকর্তার বৃদ্ধ পিতৃদেব, অশীতিপর, এক কোণে চুপচাপ

ব'সে আছেন। মধ্যবিত্ত সৌজন্যবোধ, ওঁর কাছে গিয়ে সামান্য মামুলি আলাপ। সাধারণ বিনয়সম্ভাষণ, সাধারণ কুশলসংবাদ বিনিময়, হঠাৎ বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মৃদু কণ্ঠস্বরে সুস্পষ্ট উচ্চারণ : 'ইয়ং ম্যান, বেশি বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকার মতো বিড়ম্বনা নেই, আশীর্বাদ করি আমার মতো এত বেশি বয়স পর্যন্ত যেন তোমাদের কাউকে বেঁচে থাকতে না হয়'। অপ্রস্তুত আমি, তিনি আরো অনেকদিন বেঁচে থেকে সম্মান জানানোর সুযোগ দেবেন আমাদের, এ-ধরনের কিছু কথা বলতে চেষ্টা করছি, অশীতিপর বৃদ্ধ আমাকে থামিয়ে দিলেন। বহু বছর ধ'রে বিপত্নীক, নিজেও সরকারি চাকুরে ছিলেন. এখন আছেন কৃতী সন্তানের সঙ্গে, সুখের সংসার, ঐশ্বর্যের সংসার, পুত্র-পুত্রবধূ-একমাত্র পৌত্র, যত্নে-মমতায়-সম্ভ্রমে-পরিচর্যায় আপ্লুত রেখেছেন তাঁকে, তা হ'লেও তিনি বুঝতে পারছেন, ব্যাকুল বাদল সন্ধ্যা, তাঁর দিন ফুরিয়েছে। 'ইয়ং ম্যান, তা হ'লে বলি, শোনো। আজ তো রবিবার, সকালে আমার ছেলে-ছেলের বউ কোথাও গিয়েছিল, তাদের সঙ্গে নাতিও গিয়েছিল, কাজের লোকটি বাজারে, বাড়িতে আমি একা, এমন সময় দরজায় ঘণ্টা। দরজা খুলে দিলাম, সাইকেল থেকে নেমে একজন অপেক্ষমাণ, হয়তো কোনো ফিরিওলা, হয়তো এটা-সেটার দালাল। তার প্রশ্ন ; "সাব হ্যায় ?" "না, সাহেব বাড়ি নেই।" "মেমসাব হ্যায় ?" আমাকে ফের বলতে হলো "না, মেমসাহেবও বাড়ি নেই"। অতঃপর আরো অসহিষ্ণু প্রশ্ন : "বাবা হ্যায় ?" কবুল করতে হলো নাতিটিও বাড়ি নেই। এবার আগন্তুকের সখেদ সুতীব্র মন্তব্য : "কোই ভি হ্যায় নেই ?" ভ্রষ্টকাম, তার সাইকেলে পুনরারোহণ। ইয়ং ম্যান, ঘটনাটি তুচ্ছ, কিন্তু আমার কাছে জলের মতো পরিষ্কার হ'য়ে গেল, আমাদের মতো বৃদ্ধদের টি'কে থাকার সার্থকতা নেই, আমরা প্রাসঙ্গিকতারহিত। যেহেতু সাহেব-মেমসাহেব-বাবালোক কেউই নেই, অতএব "কোই ভি নেহি হ্যায়", আমি যে জলজ্যান্ত মানুষটি এই আশি বছরের ভার বহন ক'রে এখনো টি'কে আছি, তা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। সুতরাং, "ইয়ং ম্যান, তোমাদের শিষ্টাচারের জন্য কৃতজ্ঞ, কিন্তু সত্যিই আমার বয়সীদের এখন স'রে পড়াই সামাজিক কর্তব্য।'

তবে বৃদ্ধ-অতিবৃদ্ধদের অধিকাংশের মধ্যে দিলীপ রায়ের খ্যাপাটে সাহস নেই, তা ছাড়া সামাজিক অনুজ্ঞা পেতে এবংবিধ সাহসের এখনো ঢের বাকি। তাঁদের দিন ফুরিয়েছে, এটা তাঁদের প্রতীয়মান হ'তেও অনেক বৃদ্ধবৃদ্ধার আরো ঢের দিন ফুরোয়, অনেকটাই যেন রবীন্দ্রনাথের সেই অন্য গানটির মতো পরিস্থিতি : 'যেতে যেতে চায় না যেতে ফিরে ফিরে চায়'। সমাজকে এখনো যেন তাঁদের কিছু দেওয়ার আছে, তাঁরা নিজেদের গুটিয়ে নিতে প্রস্তুত নন, সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা তাঁদের তাই সভা-সমিতির ভিড়ে দেখা যায়, মায়া, মমতাবোধ, নাকি একাকিত্বের, নিঃসঙ্গতার আতঙ্ক। কে জানে, অপাংক্তেয় হ'য়ে যেতে তাঁদের ভয়, কিংবা নিছক এক অসহায় অবস্থার মধ্যে প'ড়ে গেছেন তাঁরা, নিজেদের সত্যি-সত্যি গুটিয়ে নিতে

চাইছেন, কিন্তু কী ক'রে গুটোতে হয় নিজেদের সেই প্রক্রিয়াটির সঙ্গে ধাতস্থ হ'তে পারছেন না। সমাজের চেহারা ইতিমধ্যে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় পাল্টে যাচ্ছে, নতুন থেকে নতুনতর প্রজন্ম, একদা-আঁকড়ে-ধরা নীতি-মূল্যবোধ-আদর্শচর্চা আপাতত আঁস্তাকুড়ে বিসর্জিত, উজ্জ্বল-ঝকঝকে-আধুনিকতম প্রযুক্তি, সেই প্রযুক্তির প্রয়োগে ক-খ-গ-ঘ-ঙ-র পারস্পরিক সামাজিক সংস্থান অহরহ পরিবর্তিত হচ্ছে, অথচ সেই বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা নিজেদের গুটিয়ে নেওয়ার বিদ্যা এখনো রপ্ত করতে পারেননি, পঞ্চম অঙ্কের উপান্তে কী ক'রে নিষ্ক্রান্ত হ'তে হয় জানা নেই তাঁদের, বিদ্রূপ-টিটকিরি-অবহেলা মাথা পেতে নিয়েও মঞ্চেই থেকে যান তাঁরা।

যার আসে, এই ছেড়ে-যাওয়ার জাদুবিদ্যা, সহজেই আসে। বোধহয়, কোনো বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই, কেউ কেউ রাতারাতি উধাও হ'য়ে যান, খবরের কাগজের শিরোনাম থেকে হঠাৎ পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন, অন্য কারো একটু-একটু ক'রে, ধাপে-ধাপে, নিষ্ক্রমণ। শৈশবে দেখা বিশেষ একজনের কথা মনে পড়ছে। জাতীয় আন্দোলনের সেই মুহূর্ত, 'দেশকা বন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশকা সুহৃদ শৌকত আলি, খোদার বান্দা মহম্মদ আলি, সাক্ষাৎ ধর্ম গান্ধীজি'-র উত্তেজনা-ঠাসা ক্রান্তিলগ্নে, এই মহাশয় ভদ্রলোক যুগপৎ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য। কয়েকটি বছর অতিক্রান্ত, আবেগে খানিকটা ভাঁটা, তিনি প্রদেশ কংগ্রেস থেকে সরে এসে জেলা কংগ্রেসের সভাপতি। দু-বছর বাদে মহকুমা কংগ্রেসের প্রধান। আরো তিন-চার বছর বিগত, পৃথিবীর ক্রমশ আরো কুঁকড়ে আসা, তিনি এখন ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি, বাচ্চা আই. সি. এস. মহকুমা শাসকের কাছে গিয়ে, কর্তব্যবোধের তাড়নায়, ঝুঁকে প'ড়ে অহরহ কুর্নিশ। ভিতরে তবু অস্থিরতা, আরো কয়েক বছর গত হ'লে শরিকি বিবাদে সালিশির ভূমিকা, তারপর কখন, তাঁরও হয়তো আর খেয়াল নেই, স্বয়ং সেই বিবাদে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী। একেবারে শেষ সময়ে ভদ্রলোককে দেখতাম, শরীর অসমর্থ, চোখে ভালো দেখতে পান না, দু-কানেই বধির, দাঁত সব কটি প্রায় খ'সে পড়ায় কথা ভালো বোঝা যায় না, তবু তাঁর প্রতীতি, তখনো তাঁর কিছু করার আছে, বলার আছে, দেওয়ার আছে। অপরিসর ঘর, শোবার চৌকিটি নিজেই টেনে-হিঁচড়ে সকালে এক কোণে নিয়ে যাচ্ছেন, বিকেলে আরেক কোণে, পরের দিন ভোরে অবস্থানের ফের পরিবর্তন, লেখবার-পড়বার টেবিলটার জায়গা পাল্টে যাচ্ছে, ঘরের জানালা দুটি কখনো এক সঙ্গে বন্ধ থাকছে, কখনো এক সঙ্গে খোলা, কখনও একটি খোলা অন্যটি বন্ধ, প্রথিতযশা বৃদ্ধ ভদ্রলোক পরিকল্পনা করছেন, পরিকল্পনায় রূপ দিচ্ছেন, নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার এক ভয়ংকর আরতি, বৃত্ত হ্রস্ব থেকে হ্রস্বতর হচ্ছে, কিন্তু যে-ক'রেই-হোক, পুরোপুরি স্থবির হওয়া নেই, স্থবিরতা তো মৃত্যু।

সুতরাং হিশেবের অনিয়ম, যাঁদের নিষ্ক্রান্ত হওয়ার সময় উপস্থিত, তাঁরা আসন জাঁকিয়ে বসে থাকেন, যাঁদের আরো কিছুদিন থাকা উচিত, তাঁরা আগাম না-

জানিয়েই চ'লে যান, অনেকটা তিন নম্বর দিলীপ রায়ের মতো। পুরোনো সংস্কার আমাদের ঘাড়ে চেপে বসে, যাঁরা থেকে যান, অকারণে, প্রসঙ্গবিযুক্ত হ'য়ে, বেঁচে থাকেন নেহাতই জৈবিক অর্থে, তাঁদের বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ করতে শিষ্টাচারে বাধে। তবে, তেমন বেশিদিন আর বোধহয় অপেক্ষা করতে হবে না; জনশ্রুতি, দেশে ধনতন্ত্র আসছে, নিখাদ ধনতন্ত্র, সেই ব্যবস্থায় সব-কিছু পরাকাষ্ঠার নিক্তিপাথরে বিবেচনা করা হবে, যার পরাকাষ্ঠা নেই, সে বরবাদ। ধনতন্ত্রে টিঁকে থাকতে গেলে, সফল হ'তে হ'লে প্রতিযোগিতায় নিজেকে প্রমাণ করতে হবে, প্রতিযোগিতায় যে-অসফল তার দিকে ফিরেও তাকানো হবে না। অধিকাংশ ধনতান্ত্রিক দেশে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা তাই অবলীলায় খারিজ হয়ে যান। যতদিন সমর্থ ছিলেন, প্রতিযোগিতার মধ্যাঙ্গনে ছিলেন, নিজেদের দক্ষতার-কৃতিত্বের পরিচয় দাখিল করতে পারছিলেন, সমাজ থেকে যথাযথ বিনিময়মূল্য পেয়ে যাচ্ছিলেন তাঁরা। কিন্তু এখন তো তাঁরা সামর্থ্যহীন, তাঁদের বুদ্ধিতে আর সেই প্রাখর্য নেই, তাঁদের প্রতিভায় ঢল নেমেছে, তাঁদের চিন্তা ক'রে সুপটু সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, এবং সেই সঙ্গে সিদ্ধান্ত-অনুযায়ী কর্মসূচি প্রণয়নের দক্ষতা, এখন নির্বাপিত, তাঁরা তাই পরিত্যক্ত-বিসর্জিত। তাঁদের সন্তানেরা তাঁদের বার্ধক্যনিবাসে ভর্তি ক'রে দিয়ে আসেন, বছরে একবার, বড়োদিনের ঋতুতে, কেক ও উপহারসহ দেখা করে আসেন। তাঁরা গত হ'লে নিয়ম-টিয়ম মেনে সমারোহ সহকারে ছেলেমেয়েরা অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা ক'রে থাকে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে একটু অন্যরকম হতো। সে-সব দেশে যেমন শিশুদের বিকাশ নিয়ে আলাদা ক'রে ভাবার ঐতিহ্য স্থাপিত হয়েছিল, বৃদ্ধবৃদ্ধাদের ক্ষেত্রেও ঈষৎ পৃথগীকৃত সমাজচিন্তা; রাষ্ট্র থেকে আবাসনের-চিকিৎসার-পরিচর্যার ব্যবস্থা, বিনোদন-ভ্রমণের ব্যবস্থা, আজীবন তাঁরা সমাজকে যা দিয়ে এসেছেন তার জন্য সকৃতজ্ঞ প্রতিবিনিময়, গোধূলি মুহূর্তেও যে-যতটুকু সমাজের জন্য দিয়ে যেতে পারেন, তাঁদের ঈষৎ অবসন্ন প্রতিভার সহায়তায়, তারও ব্যবস্থা ছিল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে।

কিন্তু হঠাৎ ফতোয়া জারি হল, ব্যাকুল বাদল সাঁঝে সমাজতন্ত্রের দিন শেষ, এখন থেকে শিশুপালনও যেমন সংক্ষিপ্ত হবে, বৃদ্ধবৃদ্ধাদের পরিচর্যার অধ্যায়েরও অন্ত। এখানে-ওখানে সমাজতন্ত্র যে এখনো ধুকপুক ক'রে টিঁকে আছে তাতেই অনেকের অপ্রচ্ছন্ন আপত্তি। আমার সবশেষের কাহিনীটি তাই এবার বলতে হয়। আশি-ছোঁয়া আশি-পেরুনো আধ ডজন বৃদ্ধের সান্ধ্য আড্ডা, অনেক শিশির-ভেজা গল্প, হঠাৎ লাঠি ঠুকঠুক ক'রে এক সপ্তম বৃদ্ধের আগমন, তাঁকে দেখে অন্য ছয় জনের তেমন-একটা প্রীতি উদ্রেক হলো না, বরঞ্চ তাঁর দিকে তেড়ে সুতীক্ষ্ণ প্রশ্নবাণ: 'তবে যে শুনেছিলাম আপনি মারা গেছেন'?

কী অন্যায় কথা, যাঁকে নিরাপদে-মৃত ভাবা হয়েছিল, তিনি এসে অযথা ভিড় বাড়াচ্ছেন, বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতা তীব্রতর করছেন। খাঁটি ধনতান্ত্রিক আপত্তি: আমরা, আমরাই শুধু বাঁচবো, আপনি আবার মরতে ফের বেঁচে আছেন কেন?

ষোলো নম্বর টাউনশেণ্ড রোড

ওরে ভীরু, তোমার হাতে নেই ভুবনের ভার। রবীন্দ্রনাথ তো বকুনি দিয়েই খালাশ, আমরা অথচ সাহস সঞ্চয় করতে পারি না, জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই, ছাড়াতে গেলে ব্যথা ঠিক না লাগলেও হাজার দ্বিধা এসে জড়ো হয়। কে জানে, ব্যাকরণের বইতে এই দোদুল্যমানতাকেই হয়তো মধ্যবিত্ত মানসিকতা ব'লে গাল পাড়া হয়: লোকটা চরিত্রহীন, কখনো এদিকে হেলছে, কখনো ওদিকে, শ্রেণীস্বার্থ তাকে এক দিকে টানছে, বুদ্ধিগত বিবেক অন্য দিকে, অতএব সে নিষ্ক্রিয় হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে চৌরাস্তার মধ্যবিন্দুতে, তাকে ঘিরে জনোচ্ছ্বাস, যানোচ্ছ্বাস, সে নিজে অথচ জবুথবু।

এবংবিধ সামাজিক সমস্যা নিয়ে অবশ্যই বিস্তু প্রবন্ধ ফাঁদা যায়, পণ্ডিতদের লেখা থেকে ইয়া লম্বা পাদটীকা জুড়ে দিয়ে। আমার আপাতত সমস্যা কিন্তু অনেক ছোটো মাপের। এক ধরনের পাপবোধ, সেই সঙ্গে সংকোচ। ভবানীপুর পাড়া, ষোলো নম্বর, টাউনসেণ্ড নয়, টাউনশেণ্ড রোড, ঠিকানাটি মুখস্থ, কিন্তু আজ পর্যন্ত যাওয়া হলো না আমার। ঐ রাস্তা দিয়ে বিস্তর হেঁটে গিয়েছি, পুরোনো কলকাতার এক আলাদা স্বাদ, হঠাৎ যেন দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী কোনো প্রহরে ফিরে গেছি, 'রামধনু' পত্রিকার স্মৃতি, বালক বয়সে প্রতি মাসে যখন তা হাতে আসত, কাগজের টাটকা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ত ঘরময়, সেই গন্ধে নতুন ক'রে উল্লসিত হওয়া। তবু, যা করণীয় কর্তব্য, ক'রে উঠতে সাহস পাইনি। ষোলো নম্বর বাড়ির দোরে কড়া নেড়ে বা বেল টিপে অধ্যাপক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যকে বিনীত নমস্কার জানিয়ে আসার মতো সাহস সঞ্চয় করতে পারিনি কোনোদিন।

বছরের পর বছর ঘুরে গেছে, 'রামধনু' পত্রিকার কথা মনে রেখেছেন এমন মানুষের সংখ্যা হয়তো এখন হাতের আঙুলে গোনা যায়, তা হ'লেও কী ক'রে অস্বীকার করি আমাদের মতো বেশ কয়েকজন, ভালো হোক, মন্দ হোক, যে-সব আদলমুদ্রাবিভঙ্গ নিয়ে টিঁকে আছি, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি-প্রকৃতি-আবেগ-স্বভাবের ঝোঁক, তাদের অনেকটাই 'রামধনু' পত্রিকার দান। তা হ'লেও সাহসে কুলোয়নি, টাউনশেণ্ড রোড থেকে তেমন বেশি দূরে আমার নিজের আবাসস্থল নয়, আজ যাবো-কাল যাবো ক'রে তবু কোনোদিন সাহসে ভর ক'রে শ্রদ্ধেয় ক্ষিতীন্দ্র-নারায়ণবাবুর কাছে যাওয়া হ'য়ে ওঠেনি, জড়তা, কাজে-কর্মে-জ্ঞানচর্চায় ব্যস্ত থাকেন, আমার মতো অকাটের পক্ষে কেন অকারণে অযথা তাঁর সময়ের অপচয় ঘটাতে যাওয়া। তা ছাড়া, কয়েকবছর আগে তাঁর বিদুষী-প্রতিভাময়ী

কন্যার প্রয়াণ সংবাদ কাগজে দেখেছিলাম, বৃদ্ধ বয়সে মস্ত দাগা পেয়েছেন, তিনি অবশ্যই শোকাচ্ছন্ন, এই অবস্থায়, বিরক্ত করতে যাওয়া তো আদৌ উচিত হবে না। নিজের সঙ্গে তর্কে অবতীর্ণ হয়েছি, টাউনশেণ্ড রোড দিয়ে বহুবার এদিক-ওদিক গেছি, কিন্তু কর্তব্যপ্রণামটি তাই শেষ পর্যন্ত জানিয়ে আসা হয়নি, তারপর, এই কয়েকমাস আগে, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণবাবু নিজেই গত হলেন ; আমার পাপ-বোধের ভাণ্ড টইটম্বুর।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সীমাচৌহদ্দি নির্ণয় বড়ো গোলমেলে ব্যাপার, ঘনশ্যামদাস বিড়লা মশাইও নিজেকে মধ্যবিত্ত ব'লে দাবি করতেন, অন্য পক্ষে বাঙালি সমাজে গত তিরিশ-চল্লিশ বছর লড়াই চালিয়ে, অবশেষে ব্যর্থমনস্কাম হ'য়ে, যাঁরা পাকা-বাড়ি থেকে বিচ্যুত, বস্তির ঘরে গিয়ে এখন কোনোক্রমে আশ্রয় খুঁজে পেয়েছেন, অথবা যাঁরা কলকাতার উপকণ্ঠে-শহরতলিতে কলোনি গ'ড়ে নতুন ক'রে জীবনের জয়গান গাইছেন, তাঁরাও তো প্রচলিত অভিধানে মধ্যবিত্ত ব'লেই আখ্যাত। সমাজবিন্যাসে যতদিন স্পষ্টতা না আসবে, তার এই গোছের এলোমেলো রূপ আমাদের খানিকটা মেনে নিতেই হবে। তথাচ মধ্যবিত্ততার মূল ধারাটি আবিষ্কার করতে তেমন বেগ পেতে হয় না কাউকেই। সেই সঙ্গে এটাও আমরা মেনে নিই, আমাদের মধ্যে অনেকেই যদিও শ্রেণীবিন্যাস খোলনলচে পাল্টানোর স্বপ্ন দেখে থাকি, আসলে আমাদের দেশের, বিশেষ ক'রে পশ্চিম বাংলার, রাজ-নৈতিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রধান ভূমিকা অত চট ক'রে শেষ হবার নয়। কিছুই পাইনি-পাচ্ছি না এই ধারণার যথার্থতা অস্বীকার করার আদৌ দরকার নেই, কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণী যতটুকু পেয়েছে কারখানার শ্রমিক-গাঁয়ের খেত-মজুর ততটুকুও আসলে পায়নি গত চল্লিশ-চুয়াল্লিশ বছরে। এই বিত্তহীন প্রায়-বিত্তহীনদের দিয়ে আশু জোট-বাঁধার প্রধান দায়িত্বটা এখনো মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত-দের কাঁধেই। যদি সমাজের কাঠামো আমূল পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখি আমরা, সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে গেলে যে-ত্যাগ-তিতিক্ষা-অধ্যবসায় নিয়োগ করা প্রয়োজন, তার প্রেরণা জোগাতে হবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্তদেরই। তাদের দিন তাই আপাতত ফুরোয়নি। সমাজের দাবি না মিটিয়ে তাদের নিস্তার নেই, তাদের এখনো সাহস জড়ো করতে হবে, সেই সাহসের সঙ্গে সাযুজ্য ঘটাতে হবে কল্পনা-শক্তির, দক্ষতার সঙ্গে মেলাতে হবে আবেগকে, শৃঙ্খলাবোধের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে ঔৎসুক্য-কৌতূহলপ্রবণতাকে। বিদ্যাসাগর মশাইদের কালে এ-সব ব্যাপার-গুলিকেই হয়তো এক সঙ্গে ক'রে বলা হতো চরিত্রগঠন, অত শক্ত-শক্ত কথার জালে আটকা পড়তে আমাদের ইচ্ছা বা আগ্রহ থাক না-থাক কতগুলি মধ্যবিত্ততাসম্পৃক্ত আচরণ-বিচরণ অনুশীলনের সামাজিক তাগিদ তো অস্বীকার করার জো নেই।

আমাদের বালকবয়সে, বাঙালি মধ্যবিত্তের ঈষৎ গণ্ডিকৃত পরিমণ্ডলে, 'রামধনু' পত্রিকা তাই একটি মস্ত সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছিল। অধ্যাপক মনোরঞ্জন

ভট্টাচার্য-অধ্যাপক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য মশাইদের পিতৃদেব—আশা করি নামোল্লেখে আমি ভুল করছি না—বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য মশাই, হয়তো বাইরে থেকে খুব রাশভারি মানুষ ছিলেন, সাত্ত্বিক বিবেকবান রক্ষণশীল শাস্ত্রজ্ঞ, 'রামধনু' পত্রিকা তিনি হঠাৎ প্রকাশ করতে শুরু করেন। কোনো ব্যবসায়িক প্রবৃত্তির তাগিদে না, নেহাতই সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে। শিশুদের-কিশোরদের আনন্দবর্ধন, কৌতুকে-কৌতূহলে তাদের উদ্দীপ্ত ক'রে তোলা, দেশ-সমাজ-পৃথিবী সম্বন্ধে প্রচ্ছন্ন বিভঙ্গে তাদের জ্ঞানবিতরণ, তাদের কল্পনাশক্তিকে তেপান্তরের ঘোড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড় পাড়তে শেখানো, এ-সমস্তই ন্যূনতম সামাজিক কর্তব্য, কাউকে-না-কাউকে এই কর্তব্য পালন করতেই হবে, যোগীন্দ্রনাথ সরকার-উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীরা যে-প্রবহমানতার সূচনা ক'রে গিয়েছিলেন, তার ঐতিহ্য যেন রুদ্ধস্রোত না হ'য়ে যায় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এই গভীর প্রতীতির প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে তো 'রামধনু'র জন্মরহস্যের ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মশাইদের পিতৃদেবকে ছবি দেখে খুব গম্ভীর, ন্যায়বাগীশ মনে হতো, কিন্তু বাচ্চাদের পত্রিকার 'রামধনু' নামকরণ করতে পারেন যিনি, তাঁর অন্তঃস্থিত ফল্গুরস তো স্বতঃপ্রমাণিত, নিজের সামাজিক সংস্থানে দাঁড়িয়ে, তাঁর যতটুকু করণীয় বাংলাদেশের শিশুদের জন্য, তা নিটোল ক'রে তিনি ক'রে দিয়ে গিয়েছিলেন।

'রামধনু' পত্রিকা, যে ক-টি বছর তা বেঁচে ছিল, সত্যিই সাত রঙের বিচ্ছুরণ। গল্প, ছড়া, কবিতা, রহস্যোপন্যাস, কল্পকথা, কৌতুক, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, আনন্দ বিতরণ, জ্ঞান বিতরণ, কৌতুক বিতরণ, কল্পনাকে পাখা মেলাতে শেখানো। মানছি, সীমিত মধ্যবিত্তশ্রেণীভুক্ত ছেলেমেয়েদের জন্য এই উপচার, কিন্তু তা তো কালের অনুশাসন মেনেই। ষোলো নম্বর টাউনশেণ্ড রোড ঠিকানার সেই বাড়ি দু-হাত ভ'রে দিয়েছে, 'ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি', 'হুকাকাশির গল্প', 'পদ্মরাগ', তিরিশ-চল্লিশ দশকের বাঙালি মধ্যবিত্ত, কিশোরকে রোমাঞ্চের সঙ্গে যেমন পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, বাইরের বিশাল পৃথিবীর সঙ্গেও। কল্পনার ডানা ঝাপ্‌টানো, অজানাকে জানবার, জয় করবার দুর্মর ইচ্ছা, বুদ্ধিকে প্রয়োগ করতে শেখা, সেখান থেকে শুরু ক'রে পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে একটু-একটু ভাবা, সমাজচেতনার প্রাথমিক উন্মেষ, 'রামধনু' পত্রিকার পাতা থেকেই তো একটু একটু ক'রে আমাদের, তা এখন অস্বীকার করতে যাওয়ার চেয়ে চরমতর অপরাধ কিছু হ'তে পারে না। অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, যতদূর মনে পড়ে, মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছিলেন, আমাদের উথ্‌লে-ওঠা শোকে, তাঁর বাবার মতোই ছবিতে ও-রকম গম্ভীর দেখালেও আমরা তো জানতাম এই মানুষটির অন্তঃকরণ ঔজ্জ্বল্যে কৌতুকে ঠাসা, তাঁর মৃত্যু আমাদের প্রত্যেকেরই পরমাত্মীয় বিয়োগ। তবু ভরসা, শ্রদ্ধেয় ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণবাবু পিতৃদেব ও অগ্রজের দায়ভার নিজের কাঁধে তুলে নিলেন, 'রামধনু' বেঁচে-বর্তে রইল, আমরা আর বেশ কয়েকটা বছর পারিজাতভূমিতে ঘুরে বেড়াবার সুযোগ পেলাম।

আমার একদেশদর্শী হবার অধিকার নেই। 'রামধনু'-র পাশাপাশি, আমি অবশ্যই কৃতজ্ঞচিত্তে উল্লেখ করবো 'মৌচাক'-এর কথা, সেই সঙ্গে 'শিশুসাথী', 'মাস-পয়লা' ইত্যাদি পত্রিকার ভূমিকাও। তা ছাড়া, প্রতি বছর রুদ্ধশ্বাস উৎসাহে অপেক্ষা করতাম যে-শরৎকালীন বার্ষিকীগুলির জন্য, 'ঝলমল', 'সোনার কাঠি', 'চিত্রদীপ', আরো নানা সব নাম, প্রকাশক প্রধানত দেব সাহিত্য কুটির, কিন্তু সেই সঙ্গে আরো অনেকেই। পরাধীন দেশ, সারা পৃথিবী জুড়ে আর্থিক মন্দা, বাচ্চাদের জন্য বই-পত্রিকা প্রকাশ ক'রে বড়োলোক হ'য়ে যাবেন এমন কল্পনাও কারো মাথায় ছিল না, সামাজিক কর্তব্যের পীড়নেই তাঁরা পত্রিকা ছাপাতেন, ফি বছর নানা রঙ্ জুড়ে দিয়ে শৌখিন কাগজে শিশুকিশোর বার্ষিকী বের করতেন। কর্তব্যবোধের সঙ্গে ভালোবাসার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক : অন্যথা সুকুমার রায়-হেমেন্দ্রকুমার রায়-মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য-শিবরাম চক্রবর্তীরা তো অন্য বৃত্তিতে চলে যেতেন।

টাউনশেণ্ড রোডের উল্লেখে তাই আমার কাছে এখনো এক সম্মোহনের বিদ্যুচ্চমক। টাউনশেণ্ড সাহেব কে ছিলেন তা আমার জানা নেই, হয়তো কোনো পাটের দালাল, কিংবা ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকের কোনো মাঝারি প্রশাসক। নয় তো তখনকার সুপ্রিম কোর্টের এক স্থিতধী বিচারক, নিজের দেশে হয়তো তাঁর পারিবারিক শেষ স্মৃতিচিহ্নটুকুও বিলুপ্ত। কে জানে, হুমড়ি খেয়ে রাস্তার নাম পাল্টানোর বারোমাসব্যাপী ধান্দায় যে-ক্ষমতাবান সম্প্রদায় ঘোরাফেরা করছেন, তাঁরা একদিন হঠাৎ টাউনশেণ্ড রোডকেও অন্য নামে খচিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। এমন নয় যে টাউনশেণ্ড রোডকে নরেন সামন্ত সরণিতে পরিণত করলে তেমন-কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে। কিন্তু, মধ্যবিত্তসুলভ ভাববিলাসিতাই হয়তো, তা, আমার কাছে অন্তত, এই নাম পরিবর্তন আকাশ থেকে হঠাৎ রামধনু খ'সে পড়ার মতো শোকান্তিক ব্যাপার হবে ; 'রামধনু' পত্রিকার পৃথিবী, যে-পৃথিবীতে আমি মাঝে-মধ্যে অন্তত স্বগত ভ্রমণে যেতাম, তা অবশেষে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবে। শ্রদ্ধেয় ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণবাবু গত হয়েছেন, আমার অপরাধবোধের শেষ নেই, টাউন-শেণ্ড রোড নতুন নামের আড়ালে হারিয়ে যাওয়ার আগে অন্তত একবার ষোলো নম্বর বাড়িটির দোরে দাঁড়িয়ে কড়া নাড়তে বা বেল টিপতে পারার মতো সাহস সঞ্চয় করতে পারবো কিনা কে জানে।

এত কাল নদীকূলে যাহা লয়ে ছিনু ভুলে

আর মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনাবলির ওপর তাঁদের স্বত্ব চ'লে যাওয়ার আশঙ্কায় বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ বিচলিত। বিবিধ কারণে তাঁদের সঙ্গে এ-ব্যাপারে আরো অনেকে সমপরিমাণ, বা অধিকতর, বিচলিত। তবে এ বিপুলা পৃথিবীর কতটুকুই বা রবীন্দ্রনাথ নিজে জানতেন, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষই বা, তাঁর মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরেও, জানেন? রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকাকালীনই তাঁর কবিতা-গানকে যে-পরিমাণ অনধিকার চর্চার শিকার হ'তে হতো, ভুবনডাঙার মাঠ পেরিয়ে তার খুব সামান্য বার্তাই উত্তরায়ণ-উদীচীর কর্তাব্যক্তিদের সমীপে পৌঁছুত। পঙ্কজ মল্লিক মশাই সাহস ক'রে 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা-পরা ঐ ছায়া' গানে সুর-সংযোজন করেছিলেন, তা নিয়ে প্রচুর জল ঘোলা হয়েছিল তখন, বৈয়াকরণ সম্প্রদায় সে-ধরনের সাহসিক দৃষ্টান্তকে রবীন্দ্রনাথের গান হিশেবে স্বীকার না ক'রে পঙ্কজসংগীত আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন। আরো অপেক্ষাকৃত সম্প্রতি, জনতাকে যেমন পড়ন্ত বিকেলে অফিসপাড়ায় রুখে দেয় ট্র্যাফিক পুলিশ, তেমনি, স্রেফ গায়ের জোর খাটিয়েই এখন মনে হয়, বিশ্বভারতীর রথীমহারথীরা রবীন্দ্রনাথের অনেক-অনেক গান, জর্জ বিশ্বাস মশাইয়ের রেকর্ড করার সাধ, তাঁর নিজস্ব আদলে, পূর্ণ হতে দেননি। বড়ো ক্লেদাক্ত কাহিনীর এক অধ্যায়, বাঙালি পরশ্রীকাতরতা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছুতে পারে তার দৃষ্টান্তস্বরূপ হ'য়ে থাকবে তা। কিন্তু যা বলছিলাম, রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেও অথচ বিশ্বভারতীর খবরদারি সর্বত্রগামী হয়নি। তিরিশের দশক, আমাদের স্কুলজীবন। একদা রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতাটি নিয়ে প্রচুর কণ্ডূয়ন হয়েছে। কোনো-কোনো উৎসাহী গবেষক রবীন্দ্রনাথের কাঁধে, এই কবিতাটির সাক্ষ্যের উপর ভর ক'রে, সমাজচেতনার জোয়াল চাপিয়ে দিয়েছিলেন। তাতে, এ-সমস্ত জিনিশ যাঁরা পছন্দ করেন না, মহাক্ষিপ্ত। বাঙালি পরশ্রীকাতরতা আর বাঙালি পণ্ডিতিপনার মধ্যে আসলে হয়তো তেমন তফাৎ নেই, একটি অন্যের পরিপূরক। আজ থেকে সেই চল্লিশ-একচল্লিশ বছর আগে কয়েক মাস ধ'রে 'সোনার তরী'র ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জড়িয়ে প্রচুর কুস্তিবিদ্যার প্রদর্শন চলল, তবে, মস্ত বাঁচোয়া, আমাদের একটু তাড়াতাড়ি দম ফুরিয়ে যায়, 'সোনার তরী'-ঘটিত সেই বিসংবাদেও তাই অচিরে যতিপতন ঘটে, নটেগাছ মুড়োয়।

আমার বর্তমান কাহিনীও আরো অন্তত পনেরো বছর পিছিয়ে গিয়ে, তিরিশের দশকের মাঝামাঝি। মফস্বলের সরকারি স্কুল। বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণ দিবস।

উৎসাহ, উদ্যোগ, উৎকণ্ঠা। উৎকণ্ঠা এই কারণে সাহেব জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নয়তো খোদ ডিভিশনের কমিশনার, অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ; তদীয় পত্নী, ঠোঁটে স্মিত হাসি, হাতে দস্তানা, পুরস্কার তুলে দেবেন। পুরস্কার বিতরণ তো উপলক্ষ, আসল লক্ষ্য বছর ভ'রে স্কুলটি কেমন-কতটা উন্নতি করেছে তার ফিরিস্তি সরকার বাহাদুরকে জানানো। পুরো এক মাস এই দিনটির জন্য অনেক তালিম দেওয়া হয়েছে, এখন প্রতীক্ষার পালা শেষ, অভিভাবকরা ইতিমধ্যে আসন গ্রহণ করেছেন, আয়োজন সম্পূর্ণ, মহামান্য অতিথিবৃন্দের গাড়ি স্কুলপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করা মাত্র ব্যাণ্ডের দুন্দুভি, অতঃপর প্রারম্ভ সংগীত, অধিকাংশ বছর 'ধনধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা তাহার মাঝে আছে দেশ এক', পণ্ডিত মশাই কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় স্বর ক'রে বোধন, মৌলভী সাহেবের কোরান থেকে পাঠ, মহামান্য সাহেব-মেমসাহেবকে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন, প্রধান শিক্ষক মশাইয়ের বার্ষিক রিপোর্ট, এবার উশখুশ, উশখুশ, খোদ পুরস্কার বিতরণের পালা, সহকারী প্রধান শিক্ষক মশাই তালিকা ধ'রে নামের পর নাম উচ্চারণ ক'রে যাচ্ছেন, একেবারে নিচের শ্রেণী থেকে উত্তরোত্তর উপরের শ্রেণীতে পৌঁছুনো, রঙিন ফিতেয় বাঁধা ঝকমকে-ঝলমলে বইয়ের আঁটি, হাততালি ছাপিয়ে আরো হাততালি, প্রধান অতিথি কমিশনার কি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের অতি সংক্ষিপ্ত পাঁচ মিনিটের বক্তৃতা, সব শেষে যে-কারণে সারা স্কুলময় উন্মুখ প্রতীক্ষা, ছাত্রদের বিচিত্রানুষ্ঠান, গান, আবৃত্তি, নাট্যাংশ, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ মিনিট সময়ের মধ্যে যতটা ঠেসে দেওয়া যায়, উপসংহারে ছাত্রশিক্ষক-মহামান্য অতিথি-তস্য পত্নীর সমবেত কণ্ঠে, 'গড সেইভ দ্য কিং লর্ড সেইভ দ্য কিং', প্রধান শিক্ষক মশাই একে খ্রীস্টধর্মাবলম্বী, তায়, জনশ্রুতি, ফৌজে যোগ দিয়েছিলেন, রাজভক্তির প্রকাশে তাঁর গলা অন্য সবাইর কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে।

অন্যান্য স্কুলে বাৎসরিক বিচিত্রানুষ্ঠানের তালিকায় যা-যা থাকত, এমনিতে তা থেকে তেমন-কিছু ব্যতিক্রম নয়, তবু আমাদের বাজিমাতের একটা আলাদা ব্যাপার ছিল, গোটা বঙ্গভূমিতে যা নাকি তখন অনন্য : গানের ভাবানুষঙ্গে তাৎক্ষণিক চিত্রাঙ্কন। মঞ্চে ইজেল দাঁড় করানো থাকবে, তাতে ড্রয়িং পিন দিয়ে আটকানো শাদা মোটা ছবি আঁকবার কাগজ, একটি ছাত্র রঙের খড়ির বাক্স নিয়ে তৈরি, মঞ্চের অন্য প্রান্তে অন্য দুই ছাত্র, তাদের মধ্যে একজন গাইবে, অন্যজন বেহালায় ছড় টানবে। একটি ছোটো টেবিলে হারমোনিয়ম, যা বাজাবার দায়িত্বে আমাদের সেই মাস্টারমশাই, যিনি কয়েক সপ্তাহ ধ'রে বাছাই-করা ছেলে তিনটিকে নিয়ে ঘড়ি ধ'রে গলদ্‌ঘর্ম অনুশীলন করিয়েছেন। যবনিকা যেই উঠবে, মাস্টারমশাই হারমোনিয়ম টিপবেন, বেহালা-বাজিয়ে ছেলেটি ছড়ে টান দিতে শুরু করবে, অন্য ছেলেটি একটি বিশেষ গান গাইতে শুরু করবে, সেই গানের ভাবার্থ ছবিতে ফুটিয়ে তুলতে ত্বরিতগতিতে নিজেকে নিয়োগ করবে ইজেলের পাশে অপেক্ষমাণ ছেলেটি।

হয়তো সব মিলিয়ে সাড়ে ছ'-মিনিট সময়, গানটি পুরো গাওয়া শেষ হবে যে-মুহূর্তে, সেই মুহূর্তে ছবি আঁকাও সম্পূর্ণ করতে হবে : গানে যে-বর্ণনা, ছবিতে তার বিশ্বস্ত প্রতিফলন ফুটিয়ে তুলতে হবে। সাড়ে ছ'-মিনিট সময় অতিক্রান্ত, মাস্টারমশাইয়ের হারমোনিয়ম টেপা শেষ, বেহালা-বাজিয়ের ছড় হঠাৎ স্থির, সংগীতপ্রতিভার অধিকারী তৃতীয় ছেলেটির শমেতে পৌঁছুনো, সঙ্গে-সঙ্গে চিত্রশিল্পীর সৃষ্টিকর্মও সমাপ্ত। যবনিকাপতন, হাততালির পর হাততালির ঢেউ, সারা স্কুল জুড়ে পরিপূর্ণতার পরিতৃপ্তিহেতু দীর্ঘশ্বাস, আমরা ফের সসম্মানে উত্তীর্ণ হলাম তা হ'লে, তাক লাগিয়ে দিলাম সারা শহরকে।

রবীন্দ্রনাথ তখনো বেঁচে, তাঁরও অগোচরে ছিল, কুচুটে বিশ্বভারতীরও অজানা, ছবিতে তাৎক্ষণিক চিত্রণে ভাব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে প্রধান ভূমিকায় এক বছর যে-গান বাছা হয়েছিল, তা 'সোনার তরী'। অনেকেই হেসে কুটিপাটি, 'সোনার তরী' তো গান নয়, কবিতা। তাতে কী, তাতে কী, 'রাশি-রাশি ভারা-ভারা, ধান কাটা হল সারা ভরা নদী ক্ষুরধারা' ছবিতে যা চমৎকার ফুটে উঠবে, মাস্টার-মশাইরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, তার তুলনা হয় না। অতএব প্রধান শিক্ষক মশাইয়ের ঘরে শিক্ষকমণ্ডলীর জরুরি বৈঠক, কে গান করবে-কে ছবি আঁকবে সেই নির্বাচন। বীরভূম জেলার বোলপুর স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে গোরুর গাড়ি চেপে শান্তিনিকেতনে পৌঁছে 'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা' স্বর ক'রে গাওয়ার জন্য প্রাক্-অনুমতি নিয়ে আসতে হবে, এমন উট্‌কো কথা তখন কেউ কোথাও শোনেননি। যিনি হারমোনিয়ম টিপতেন, তিনিই আমাদের সংগীতশিক্ষক, তবে তাঁর স্কুলে প্রধান দায়িত্ব ছিল ইতিহাস ও ভূগোল পড়ানো, কেন যেন মাঝে-মধ্যে 'মেঘনাদ বধ' থেকে স্তবক ব্যাখ্যা ক'রেও পড়িয়ে যেতেন তিনি। আমার সেই পরমশ্রদ্ধেয় শিক্ষক মহাশয় এখনো জীবিত, কলকাতা শহরেই আছেন, অশীতিপর বয়স, ইচ্ছা ক'রেই তাঁর নাম গোপন রাখছি, বলা যায় না, এই পঞ্চান্ন-ছাপান্ন বছর বাদে; স্বত্বভঙ্গের অপরাধে, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ হঠাৎ চড়াও হ'য়ে তাঁকে উত্ত্যক্ত করতে পারেন। তিনিই 'গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে, দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে'-সমেত পুরো 'সোনার তরী'-তে সুর বসিয়ে নিয়েছিলেন, সুরসংযোজনান্তে স্বরলিপি পর্যন্ত তৈরি ক'রে দিয়েছিলেন, মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের পরিশ্রমে, এক বসন্ত-অপরাহ্ণে আমাদের এই মাস্টারমশাই। সেই সুরে রাগরাগিণীর অভাব ছিল না, খাম্বাজও ছিল, ইমন-কেদারাও। ছাপ্পান্ন বছর মাঝখানে বিগত, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ হাহাকারের সঙ্গে অভিশাপ মিশিয়ে যথেচ্ছ গাল পাড়ুন, তাতে তো যা ঘটেছিল তা আর সংবৃত হবে না।

খটকা অথচ থেকেই যায়। আমাদের মাস্টারমশাইরা সত্যিই কি অক্ষমার্হ অপরাধ করেছিলেন? এমনকি 'সঞ্চয়িতা'ও নয়, নিছক 'চয়নিকা'র ঈষৎ আসর জমানো, তার বাইরে রবীন্দ্রনাথের গান-কবিতার বিশেষ পরিমণ্ডল ছিল না তখন,

নোবেল পুরস্কার, বিশ্বকবি শিরোপা, তা হ'লেও পরাধীন, প্রায়-নিরক্ষর দেশ, রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার সহচারিতায় সমগ্র জাতিকে কোন্ আশ্চর্য প্রজ্ঞায় টেনে তোলা যায়, তা নিয়ে কারো কোনো সম্যক্ ধারণা ছিল না। যে-উদ্ভট প্রণালী সহকারেই হোক, আমার স্কুলের মাস্টারমশাইরা তাঁদের মতো ক'রে রবীন্দ্রনাথের কবিতা-গানকে চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্রত সানন্দে-স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন, ব্যাকরণের ধুয়ো তুলে তাঁদের কেন, এই এত বছর বাদে, বিচার করতে বসবো? তা ছাড়া, না মেনেই বা উপায় কী, চল্লিশের দশকের গোড়া থেকেই রবীন্দ্রনাথের গান বাঙালিসমাজের প্রায় সর্বস্তরে যে ছড়িয়ে পড়ল, তার কৃতিত্ব, মাননীয় মহাশয়রা অপরাধ নেবেন না, পুরোপুরি বা অংশতও বিশ্বভারতীর নয়, প্রতি রবিবার সকালে পঙ্কজ মল্লিক মশাইয়ের বেতারে গান-শেখানোর অধ্যবসায়মণ্ডিত অধ্যায় সেই জাদুকলার জন্য দায়ী।

সুরে-সেঁটে-দেওয়া 'সোনার তরী' যে-ছাত্রটি কর্তৃক গীত হয়েছিল, তার নাম রূপজ্যোতি সেনগুপ্ত। সারা স্কুলে তার চেয়ে সুকণ্ঠ কারো ছিল না, 'শ্রাবণ গগন ঘিরে। ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে। শূন্য নদীর তীরে। রহিনু পড়ি'—। যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী' এই আর্ত অভিব্যক্তির সংবেদনা তার কণ্ঠে, বিশ্বভারতী-কর্তৃক অননুমোদিত স্বরলিপি নিপুণ অনুসরণ ক'রে, স্কুলের গোটা প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে পড়ত, আমরা সবাই সহসা এক উদাসীন নদীকূলে উপস্থাপিত হতাম।

স্কুলজীবনের পরিসমাপ্তিতে যা ঘ'টে থাকে, তিরিশ বছরের বেশি সময় রূপজ্যোতি সেনগুপ্তের সঙ্গে আদৌ দেখা হয়নি আমার। হঠাৎ সত্তর দশকের গোড়ার দিকে নতুন দিল্লিতে পুনঃপরিচয়, একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের উপরমহলে কর্মরত, দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়াতে হয়, কোনোদিন যে গানের গলা ছিল তার তা যেন সে প্রায় পূর্ণ বিস্মৃত। রূপজ্যোতি সেনগুপ্ত নিজে ব্যস্ত, আমিও বোধ হয় ব্যস্ত, তেমন আড্ডা দেওয়া হতো না আমাদের, ক্বচিৎ দু' একদিন বাড়ির সংলগ্ন মাঠে চেয়ার টেনে ব'সে, রাত্রি গভীরতর, আকাশে সম্ভবত শুক্লপক্ষের চাঁদ, কিছু শিশিরসিক্ত স্কুলের গল্প, 'সোনার তরী' গানের তাৎক্ষণিক চিত্রায়ণের সকৌতুক গল্পও হয়তো।

আমাদের দু'জনেরই ফের ছিটকে এদিক-ওদিক চ'লে যাওয়া, আর দেখা হয়নি গত দুই দশকের মধ্যে। হঠাৎ এই সপ্তাহে খবর চোখে পড়ল, রূপজ্যোতি সেনগুপ্ত দিল্লিতে প্রয়াত। অবান্তর প্রশ্ন, তবু না ক'রে পারি না: মৃত্যুর মুহূর্তে, বিশ্বভারতী-কর্তৃক অননুমোদিত সুরে, তার কি, শেষবারের মতো, সেই শেষ চরণটি গাইবার শখ হয়েছিল: 'যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী'?

এত বছর বাদে, কুন্তলাদিকে

সুরেশবাবু-তুষারবাবুদের ঢালাও ঔদার্য্য। কয়েক বছর বিনা বিচারে বন্দী থেকে সদ্যমুক্তিপ্রাপ্ত বাঙালি যুবক, সম্বল হয়তো একটা বি. এ. কি বি. এসসি. ডিগ্রি, কিংবা তা-ও না, কিন্তু তেমন অসুবিধা হতো না, একটু চেনা-জানা থাকলেই প্রায় প্রত্যেকেরই ঐ দুই খবরকাগজের দপ্তরের একটিতে কাজ জুটে যেত : সহকারী সম্পাদক, মাসমাইনে পঞ্চাশ টাকা। তখনকার দিনের পক্ষে, প্রায় সবাই ঘাড় নেড়ে বলবেন, যথেষ্ট। বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দা, সমস্ত পণ্যের দাম পড়ন্ত, কাগজের দামও। সুতরাং এমনকি এক আনার কাগজেও ষোলো ছাপিয়ে চব্বিশ পৃষ্ঠা, কিংবা তারও বেশি, যে-কোনো বিষয়েই বিস্তৃত ক'রে লেখা যেত। লেখা হতোও সে-রকম : শেয়ালদা বা হাওড়ার ভিড়ে কার পকেট কাটা গেছে, তা নিয়েও হয়তো আট-দশ লাইনের ঘনবদ্ধ বিবরণ।

যেমন, বিশেষ একটা বছরে, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ছাপিয়ে শ্রীমতী সু···সরকার মামলার প্রতিবেদন থাকত। কলকাতা শহর-তথা-মফস্বল জুড়ে রটনা-উত্তেজনা, কেলেঙ্কারি-ঢিটিক্কার, সংবাদপত্রসমূহের মস্ত মওকা, এখানে-ওখানে-সর্বত্র আলোড়ন। বড়োরা নিজেদের মধ্যে একটু সতর্ক আলোচনা করেন, ছোটোরা যাতে শুনতে না পায় ; ছোটোরা বড়োদের এড়িয়ে খবরকাগজ নিয়ে পালিয়ে গিয়ে রসালো বর্ণনা পড়ে। কুৎসিত সামাজিক অনাচারের কাহিনী, অথচ, সংবাদপত্রে তেরছা বিন্যাসে পরিবেশনের দরুন, তা মুখরোচক কালবিনোদনের উপকরণ হ'য়ে দাঁড়ায়। শাদামাটা মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে শ্রীমতী সু···সরকার, শেয়ালদা-রাজাবাজার অঞ্চলের একটি মহিলা কলেজের ছাত্রী, তার হয়তো একটু স্বপ্ন দেখার সাধ হয়েছিল, তাকে বোঝানো হয়েছিল সেই স্বপ্নকে, দুটো সাহসী ধাপ পেরুলেই, হাতের মুঠোয় পুরে ফেলা যায়, উঁচু মহলের মানুষজনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়, তাঁরা ইচ্ছা করলেই তাকে আরো অনেক সচ্ছলতার দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে পারেন, প্রতি-দিন এমনতর প্রলোভনের হাতছানি। হয়তো কোনো বিবেকহীন গুরুজনস্থানীয়ের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্ররোচনাও ছিল, সেই ব্যক্তি সম্ভবত বোন বা ভাইঝিকে সওদা ক'রে কিছু কমিশন হাতাবার তাল ক'রে ফিরত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কল্যাণে এ-সব ব্যাপার, মাত্র কয়েক বছর বাদে, কলকাতা শহরে জলভাত হ'য়ে গিয়েছিল, কিন্তু, অন্তত ১৯৩৭-৩৮ সালেও, বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের কাঠামো প্রাণপণে নিজেকে টিঁকিয়ে রাখার চেষ্টা ক'রে যাচ্ছিল। শ্রীমতী সু···সরকারের পক্ষে শেষ পর্যন্ত সব দিক সামলানো সম্ভব হয়নি, শৌখিন উঁচুতলার মহলে ফুরফুরে উড়ে বেড়ানো, সমাজে

সম্মানীয় নানা নাম, যে-সব নাম রোজ খবরকাগজে উল্লিখিত হয়, রাত বাড়লে তাঁদের আচার-আচরণ একটু অন্তরকম হয়, তাঁরা ফুলে-ফুলে ঢ'লে-ঢ'লে পড়েন, আর তাঁদের সঙ্গে মেশার খেসারত দিতে হয় মাঝে-মাঝে শ্রীমতী সু···সরকারদের মতো হতভাগ্য মেয়েদের। সু···সরকারের গল্প তেমন দীর্ঘায়ত করার সার্থকতা নেই, আরো বহুদিন ধ'রে সে জীবন উপভোগ করতে পারত, কোনো চিকিৎসকের ডেরায় অবৈধ অস্ত্রোপচারের ফলে তার অপমৃত্যু ঘটল। সন্দেহ হয়, সেই গুরুজনটির শোক ছাপিয়ে ব্যবসাবুদ্ধি, ফৌজদারির জন্য এজাহার, একটি-দুটি গ্রেপ্তার, জামিন, ফিশফিশ গুজব, খবরকাগজে প্রতিদিন সম্মানীয় যে-সব ব্যক্তির নাম বেরোয়, তাঁদের অনেকের মনে ত্রাস, এই গোছের মামলাতে কেউ, দায়িত্বহীন, তাঁদের নাম জড়িয়ে দেবে না তো ? লোকপ্রবাদ, পুলিশের লোক দু হাতে টাকা করেছিলেন সেই ক'টা মাস, যেমন করেছিলেন দু-পক্ষেরই আইনজীবীরা। সাঙ্গুভ্যালির টেবিলে হাজার আলোচনা হোক ক্ষতি নেই, কিন্তু ছাপার অক্ষরে খবরকাগজে একবার নাম বেরিয়ে গেলে মুশকিল, শ্রদ্ধানন্দ পার্কে গান্ধি-টুপি তেরচা ক'রে প'রে তখন বক্তৃতা দিতে গেলে, বলা যায় না, কিছু বয়াটে ছেলে মুখখিস্তির সঙ্গে পাটকেল ছুঁড়তে পারে। অতএব শ্রীমতী সু···সরকারের ক্লেদাক্ত কাহিনী গৌণ হ'য়ে গেল, কলকাতার উপর মহল কী ক'রে, সুরেশবাবু-তুষারবাবুদের ধ'রেই হোক, পুলিশ-ব্যারিস্টার-অ্যাডভোকেটদের টাকা খাইয়েই হোক, নিজেদের নামের উল্লেখ, আদালতে এবং সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়, আটকে দিতে পারেন, তা-ই জল্পনার কেন্দ্রবিন্দু হ'য়ে দাঁড়াল। উপরতলার এই তথাকথিত ভদ্রলোকেরা যথানিয়মে সফলও হলেন, ট্রামে-বাসে-এসপ্ল্যানেডের ঘুন্টিঘরে-সাঙ্গুভ্যালির টেবিলে যে যা বলে বলুক তাঁদের নাম খবর-কাগজে ছাপা হলো না, আদালতেও অনুল্লিখিত থাকল, বাঙালি উঁচু সমাজ সম্মানে অটুট রইল।

বুজরুকি। দেশবরেণ্য নেতাদের অমৃতবাজার-আনন্দবাজারে রোজ নাম বেরোয়, তরুণ-সম্প্রদায় নাকি তাঁদের আদর্শ অনুসরণ করতে শিখলেই জীবনের ধ্রুবতারা আবিষ্কার করতে পারবে। এই নেতৃকুলেরই, সন্ধ্যা গাঢ়তর হ'লে, অন্য চেহারা, তাঁদের রিরংসার বলি সরকারকুলজাতা সেই সদ্য-যৌবনে-পৌঁছোনো মেয়েটি, এবং তার মতো আরো শত-শত।

প্রতিবাদ হতো না আদৌ তখন, যাঁরা প্রধান অপরাধী তাঁরাই তো সমাজের মগডালে চ'ড়ে ব'সে আছেন, তা ছাড়া টাকা ছড়ালে পুলিশও হাতে থাকে, আইনজীবীরাও। এরই মধ্যে, তাঁর নিজের মতো ক'রে, প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন আমাদের কুন্তলাদি, প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তাঁর অকুতোভয় ব্যভিচার দিয়ে, সমাজকে মস্ত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে। অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন কুন্তলাদি, গলানো সোনার মতো রঙ, টিকোলো নাক, আয়ত চোখ, নিটোল দন্তকৌমুদী, ঠোঁটে সতত বুদ্ধি-উজ্জ্বল হাসির তির্যক ইঙ্গিত। প্রায় পাঁচ ফুট ন-ইঞ্চি লম্বা শরীর, রেশমের-

মতো-মসৃণ, প্রায়-বাদামি, ঘন কেশরাশি, বন্যার করাল জলোচ্ছ্বাসের মতো, শরীর ভেঙে হাঁটু পর্যন্ত লুটিয়ে পড়েছে। অঢেল পয়সাওলা জমিদারবাড়ির মেয়ে কুন্তলাদি, স্বামী সেই-তখনকার-দিনে কোনো সদাগরি-দপ্তরে উঁচুগোছের কাজ করতেন, হঠাৎ দু-দিনের অসুখে মারা যান, কুন্তলাদি এক ছেলে-এক মেয়ে নিয়ে বিধবা। মেয়ে, তাঁর মতো অতটা সুন্দরী না হ'লেও, দেখতে বেশ ভালো, প্রবেশিকা পরীক্ষার গণ্ডি পেরুবার সঙ্গে-সঙ্গেই সম্পন্ন পরিবারে বিয়ে দিয়ে দিলেন। শ্বশুরকুলের সঙ্গে কেমনধারা সম্পর্ক ছিল কুন্তলাদির তা এখন মাত্র অনুমান করতে পারি ; তাঁর ছেলে যদিও শহরে জ্যাঠাকাকাদের সঙ্গে থেকে স্কুলে-কলেজে যেত, কুন্তলাদির নিজের আদৌ শ্বশুরবাড়িতে যাতায়াত ছিল না। তিনি নিজেদের গ্রামে, পৈতৃক সম্পত্তি আগলে, থেকে গেলেন, জমিদারনন্দিনী, সারা শরীর বেয়ে গলিত সোনার মতো রূপের প্রপাত।

কুন্তলাদি চৈত্র-বৈশাখ থেকে শুরু ক'রে দুর্গাপূজা পর্যন্ত গাঁয়ের বাড়িতে থাকতেন, পরিধানে শাদা থান, বাঙালি হিন্দু বিধবার আচার-নিয়ম অতীব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন, জমিদারির নানা সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতেন, সমাজের বিবিধ চর্চার সঙ্গে দৈনন্দিন নিজেকে জড়িয়ে রাখতেন, সমাজবর্তিনী অন্য-যে-কারো থেকে তাঁকে পৃথগীকৃত করবার উপায় ছিল না। পূজা শেষ, বাংলাদেশময়, গ্রামের পর গ্রাম জুড়ে, হেমন্তের সন্ধ্যালগ্নে একের পর এক আকাশপ্রদীপ, কিন্তু কুন্তলাদিকে ঐ সময় থেকে আর গ্রামে পাওয়া যেত না। সবাইকে জানিয়ে-শুনিয়েই তিনি কলকাতা চ'লে আসতেন। তাঁর স্বামীর একদা বন্ধু ও সহকর্মীদের সূত্র ধ'রে তাঁর ক্রমশ কলকাতায় অভিজাততম মহলে অনুপ্রবেশ। আকাড়া অনুপ্রবেশ ঠিক নয়, অভিষেকের পর অভিষেক। তাঁর রূপে, বুদ্ধির প্রাখর্যে, আলাপের চতুরালিতে কলকাতার দেশবরেণ্য নেতৃবৃন্দের বেশামাল অবস্থা। কলকাতা পৌঁছোনো মাত্র কুন্তলাদির বেশভূষায় আমূল পরিবর্তন। বিধবার বাস তোরঙ্গের কোণে অবহেলায় নির্বাসিত, কুন্তলাদির অঙ্গে প্রতি সন্ধ্যায় ঝলমলে বারাণসী-কাঞ্চিপুরম্, সারা অঙ্গ জুড়ে হিরেখচিত অলংকারের ঠিকরে-পড়া দ্যুতি, ঠোঁটে রঙ্, চোখে লাস্য, দুই ভুরু-কেশদামের ভঙ্গিমায় চাপল্যের সঙ্গে রহস্যের জড়াজড়ি। তাঁকে ঘিরে সম্মোহ, মধ্যযুগীয় সম্ভোগের অখণ্ড পরিবেশ। অনুরাগীর পর অনুরাগী, রাশ না-মানা ভিড়, কলকাতায় স্বদেশী রাজনীতির যাঁরা নির্ধারক তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের তাঁকে ঘিরে দেহিপদপল্লবমুদারম-ধরনের স্তবস্তুতি-আরাধনা, প্রতি সন্ধ্যায় বরানগরের গঙ্গাতীরবর্তী বাগানবাড়িতে, নয়তো বিলাসী হোটেলের নিভৃততম মহলে, অথবা বালিগঞ্জ-আলিপুর পাড়ার মার্বেলমণ্ডিত অট্টালিকায়, সুরা ও সুরচর্চা, যার মধ্য-বিন্দুতে সম্রাজ্ঞীর মতো বিরাজমানা, কুন্তলাদি। চোখের কোণ থেকে কখনো অবশ-করা দৃষ্টি হেনে, কখনো ঠোঁটে হাসির ঈষদাভাস ফুটিয়ে, কখনো আপাত-অবজ্ঞায় কাঁধ ঝাঁকিয়ে, কুন্তলাদি তাঁর প্রতিটি অনুরাগীর কাছে যথাযথ যা জানাবার জানিয়ে

দিতেন, তিনি সকলের ধরাছোঁয়ার মধ্যে, অথচ ধরাছোঁয়ার বাইরেও। গভীর ঔদাসীন্যের সঙ্গে কুন্তলাদি উপহার-উপঢৌকন কুড়োতেন, শাড়ি-গয়না-আতরের উপচার, কোনো মহারথী কলকাতায় তাঁকে একটা ফ্ল্যাট কিনে দিতে চাইছেন, অন্য-এক কেষ্টবিষ্টু তাঁর জন্য সাদার্ন এভিনিউতে একটা আস্ত বাড়ির ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন, কুন্তলাদি কাউকে নিরাশ করতেন না, অথচ নিজের গরিমা থেকেও কদাপি বিচ্যুত হতেন না। ক্রমে কলকাতায় বড়োদিনের সমারোহ ঘনীভূত, সপরিবার বড়োলাট এসে পড়েন, রাজা-মহারাজারা পৌঁছোন সেলুনগাড়িতে চেপে, ইডেন উদ্যানে ক্রিকেট, পাথুরেঘাটা-বেলগাছিয়া থেকে শুরু ক'রে ল্যান্সডাউন রোড পর্যন্ত সংগীতজ্ঞদের সারা-রাত-জোড়া অনুষ্ঠান, কুন্তলাদি ব্যস্ত, কুন্তলাদিকে নিয়ে কাহিনীর পর কাহিনী, কুন্তলাদি সবাইয়ের কাছ থেকে উপচার গ্রহণ করছেন, কিন্তু আলাদা ক'রে বিশেষ কাউকে অনুগ্রহ বিতরণ করছেন না। তিনি সম্ভোগের গভীরে ডুবে যাচ্ছেন, ব্যভিচারিণী, তা হ'লেও অধরাই থেকে যাচ্ছেন।

কলকাতায় শীত শেষ, এ-পাড়া ও-পাড়া জুড়ে ঝরাপাতার ভিড়। কুন্তলাদির মনস্থির, চৈত্র মাস শুরু হ'তে-না-হ'তে ট্রেনে-জাহাজে চেপে তাঁর গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসা। হয় তো গিয়েছিলেন দুটি তোরঙ্গ নিয়ে, ফিরে এলেন অন্তত ছয়টি নিয়ে। ট্রেনে কিংবা স্টিমারে কখন এক ফাঁকে ধরাচূড়া পাল্টে নিয়েছেন, গ্রামের ঘাটে জেটি বেয়ে যখন জাহাজ থেকে নামলেন, সনাতন বাঙালি হিন্দু বিধবার বেশ। ছ-মাসের জন্য, কুন্তলাদির জীবনধারার পুনঃপটপরিবর্তন। এমনি ক'রে বছরের পর বছর, প্রতি বছর।

কুন্তলাদি লুকোতেন-ছাপাতেন না। কোনো শিথিল মুহূর্তে গাঁয়ের মেয়েরা বেড়াতে এলে অসংকোচে দেরাজ খুলে দেখাতেন, এই বালুচরী শাড়িগুলি দেখছো সব ক'টি ক্যাপ্টেন অমুক মিত্তির দিয়েছেন, মরকতের এই কণ্ঠহারটি ব্যারিস্টার অমুক গুপ্তের উপহার, এই শৌখিন মুক্তোখচিত ভেলভেট-মোড়া জুতো-জোড়া ইস্তানবুল থেকে বিশেষ অর্ডার দিয়ে বিখ্যাত চিকিৎসক সান্যাল মশাই আমার জন্য করিয়ে নিয়ে এসেছেন। টিটিক্কারকে কলা দেখিয়ে অন্তত এক কুড়ি বছর এভাবে চালিয়ে গিয়েছিলেন কুন্তলাদি। বাঙালি সমাজ অন্তহীন বুজরুকিতে ঠাসা, তার সুবিধা শুধু পুরুষরাই কেন ভোগ করবে, মেয়েরা সেই সরকার-দুহিতার মতো শুধুই নিপীড়িত-নিষ্পেষিত হবে কেন, অসম ব্যবস্থা, পুরুষশাসিত সমাজ, তবু এরই মধ্যে পুরুষদের দুর্বলতার এবং সেই সঙ্গে সমাজের ভণ্ডামির, সুযোগ গ্রহণ ক'রে অন্তত একজন নারীও তার অভিলক্ষ্যে পৌঁছুবার চেষ্টা করবে না কেন : বোধ হয় কুন্তলাদির মনে এই জিজ্ঞাসা পরিব্যাপ্ত ছিল। তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়ম ভেঙেছেন, নীতি ভেঙেছেন, কিন্তু সমাজের ঘাড়ে ক'টা মাথা তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে, সমাজের মাথা ঐ-ঐ দেশনেতাগুলি সবাই-ই তো তাঁর চাহনির প্রহারে জর্জরিত।

নারীদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন গত এক-দুই দশকে ধাঁ-ধাঁ

এগিয়েছে। যাঁরা এই আন্দোলনের পুরোভাগে, মাঝে-মাঝে ইচ্ছা হয় তাঁদের কাছে গিয়ে অনুযোগ জানাই, নারীমুক্তির তো অনেকগুলি দিক, শ্রীমতী সু··· সরকারের কলঙ্ককাহিনী জড়িয়ে যেমন তার এক অধ্যায়, কুন্তলাদির দৃপ্ত বিদ্রোহও ফেলনা নয়, কুন্তলাদি নিজেকে ব্যবহৃত হ'তে দেননি, অন্যায় সমাজব্যবস্থার ভণ্ডাচারের পুরো সুযোগ গ্রহণ ক'রে, তাঁর নিজের মতো ক'রে, পুরুষজাতির দুই গালে বিশাল চপেটাঘাত করেছিলেন তিনি, ইতিহাসের পাতায় তা অস্বীকৃত থাকবে কেন ?

'উইল ইউ হ্যাভ অ্যান আম, বাবা ?'

শর্বরী দাশগুপ্ত, বাবা-মা অনেক বেছে-টেছে বোধহয় নাম রেখেছিলেন, খাঁটি ধ্রুপদী। অতীব সপ্রতিভ, চোখে-মুখে কথা বলে মেয়েটি। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য বেরিয়েছে, মনস্থির করতে পারছে না কোন্ পেশায় স্থিত হবে, আপাতত শখের সাংবাদিকতা। কী-একটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে এসেছে, কিন্তু, ছন্দপতন, অমন চমৎকার ধ্রুপদী নাম, এবং যদিচ বাবা-মা দুজনেই নিকষ বাঙালি, ও হরি, মেয়েটি বাংলাতে আদৌ একটি বাক্য সম্পূর্ণ করতে পারে না, বাংলায় প্রশ্ন করলে ইংরেজিতে জবাব। মেয়েটিকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, সামাজিক সংজ্ঞায় বাবা-মা যে-উপার্জনস্তরে বিরাজ করেন, সেখানে বাংলা ভাষার ঠাঁই নেই, এমনকি বাড়িতেও বাংলাতে কথা-বলার পাট প্রায় উঠে গেছে, বাংলা প্রায় অপভাষায় পর্যবসিত, ভৃত্য-সম্প্রদায়কে নির্দেশ দেওয়ার জন্য একমাত্র যা ব্যবহৃত হয়। মেয়েটি বরাবর কলকাতাতেই থেকেছে, এখানেই বড়ো হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু মাতাপিতৃভাষাবিবর্জিত জীবন। স্বাধীন ভারতবর্ষে পশ্চিম বাংলা একটি অঙ্গরাজ্য মাত্র, সালতামামি থেকেই তো মালুম হয়, বাঙালিরা হ'টে যাচ্ছে, প্রতিযোগিতায় হ'টে যাচ্ছে, বেসরকারি সংস্থাগুলির উপরতলায় তেমন সেঁধিয়ে যেতে পারছে না, সরকারি নানা পরীক্ষাতেও সুবিধা করতে পারছে না। বাবা-মারা তাই দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ, নিজেদের ভাষা শেখার শৌখিনতায় সময় নষ্ট ক'রে লাভ নেই, হয় ইংরেজি, নয় হিন্দি, অথবা দুটোই, ভালো ক'রে রপ্ত করা ঢের বেশি জরুরি। ছেলেমেয়েরা ক্রমশ তাদের নিজেদের ভাষা ভুলে যাচ্ছে-যাবে তাতে কী, ভাবালুতা ধুয়ে তো আর জল খাওয়া যাবে না। শর্বরী দাশগুপ্ত-বিপাশা বসুমল্লিক-মেঘনাদ মজুমদাররা চোখে-মুখে কথা বলে, জীবনে উন্নতি করবেই, তবে বাংলা ভাষার সঙ্গে শুধু নামমাত্র পরিচয়। এপার বাংলা-ওপার বাংলায় কী প্রচণ্ড তফাত, ওখানে সমস্ত-কিছু নিজেদের ভাষার মধ্যবর্তিতায়, আর এখানে, আস্তে-আস্তে বাংলা ভাষা হয়তো মিলিয়ে যাবে, বাংলা চলচ্চিত্র যেমন ইতিমধ্যেই যাচ্ছে।

পর-পর কয়েকটি রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের পরিণাম, সুতরাং বাবা-মাদের দোষারোপ করাও, একটু ভয়ে-ভয়েই বলছি, খানিকটা অযৌক্তিক। আমরা তো ইদানীং খোলা হাওয়া পালে লাগিয়ে ডুবতে রাজি আছি, ভারতবর্ষের মুক্তাঙ্গনে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হ'য়ে যদি আমাদের সন্তানসন্ততি বেরিয়ে আসতে চায়, তা হ'লে মাতৃভাষা সম্পর্কে দুর্বলতা বিসর্জন দিতে হবে। সুতরাং, আক্ষেপ ক'রে লাভ নেই, ইতিহাসের নিয়ম, এই সব চমৎকার-চমৎকার ছেলেমেয়ে তাদের

সু-উচ্চ আলাদা সমাজশ্রেণীতে বিলীন হ'য়ে যাবে, দেশটা ধুঁকবে, কিন্তু তারা নিজেরা সুখী হবে, সমৃদ্ধ হবে, দেশ জুড়ে ধনতন্ত্র যত প্রসারিত হবে তারা তত ব্যক্তিগত সাফল্যের মগ্‌ডালে চড়বে।

কিন্তু তারপর? এক ভয়ংকর অসম, অন্যায় সমাজব্যবস্থা তৈরি হবে, তা তো তেমন বেশিদিন টেঁকবার নয়। হয় অচিরে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে বিপ্লবের আগুন দাউদাউ ক'রে জ্বলবে, নয় তো, বিচক্ষণ দেশনায়কদের সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও, ভারতবর্ষ একটু-একটু ক'রে টুকরো-টুকরো হ'য়ে যাবে। কোন্‌টা ভালো আর কোন্‌টা মন্দ সেই প্রশ্ন তুলে লাভ নেই, শ্রেণীগত বা অঞ্চলগত শোষণ একটা স্তর ছাড়িয়ে গেলে প্রতিক্রিয়া দেখা দেবেই, আমরা অতি প্রাচীন সুভব্য-সুসংস্কৃত জাতি, অতএব ইতিহাসের নিয়ম আমাদের ক্ষেত্রে খাটবে না, তা তো হবার নয়। তখন কী গতি হবে এদের, শর্বরী দাশগুপ্ত, মৌসুমী বসু, ইন্দ্রনীল সমাদ্দারদের, পাঁচতারা হোটেল, ক্লাবের বাইরে সমাজের অন্য সর্বত্র কী ঘটছে-না ঘটছে তা নিয়ে যাদের উপস্থিত আদৌ কিছু জানা নেই।

অথচ যা ধ'রে নেওয়া হয় অনেক সময় তা না-ও ঘটতে পারে। জীবনধারার ছাপ চেতনাকে গড়ে, চেতনার ছাপ জীবনধারাকে নয়। পরিবেশ-পরিস্থিতি বদলে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে, সমাজের যে-স্তর থেকেই আসি না কেন, আমরাও পাল্টে যাই, এ-রকম অন্তত একটি গোত্রান্তরের দৃষ্টান্ত আমারই চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

বাইশ বছর বয়স, অজ মফস্বলের ছেলে, হঠাৎ বাংলার বাইরে ঠিকরে গিয়ে পড়েছি, যাঁদের আগ্রহে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ পেলাম, তাঁদেরই মধ্যে একজন উদ্যোগ নিয়ে আমার বাসস্থানেরও ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত কয়েক বছরের ছুটি নিয়ে দিল্লি চ'লে গেছেন, কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য হিশেবে যোগ দিয়ে, লোকজন-সমেত ওঁর বাদশাবাগের বিশাল সাজানো বাড়ি প্রায় খালি প'ড়ে আছে, মাঝে-মাঝে শ্রীযুক্তা চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত এসে একদিন-দু-দিন থেকে যান, কয়েক সপ্তাহ বাদে ওঁদের মেয়ে রঞ্জনা—যার ডাক নাম অপু—আমেরিকা থেকে ডিগ্রি নিয়ে ফিরবে, তারও বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ হয়েছে, কিন্তু তা হলেও, অনেকগুলি ঘর, আমার থাকবার অসুবিধা হবে না।

অসুবিধা অথচ হয়েছিল। যখন চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত থাকতেন না, কিংবা যতদিন পর্যন্ত রঞ্জনা এসে পৌঁছোয়নি, আমার অপর্যাপ্ত, অবারিত স্বাধীনতা, বাড়িময়, প্রতি ঘরময় প্রচুর বই, সাহিত্য-দর্শন-কবিতা থেকে শুরু ক'রে গোয়েন্দা কাহিনী পর্যন্ত, আমার খুশি উপ্‌চে পড়ে, সন্ধ্যায় আড্ডা দিয়ে ফিরে আসার পর অনেক রাত পর্যন্ত বই পড়া, সকালে দেরি ক'রে ঘুম থেকে উঠে ধীরে-সুস্থে তৈরি হওয়া, বিলাসী প্রাতরাশ, এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না। কিন্তু সমস্যা। চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত হঠাৎ-হঠাৎ দিল্লি থেকে চ'লে আসতেন, সদ্য মফস্বল-ছাড়া গবেট ছেলে আমি,

ইংরেজি বলতে গিয়ে জিভ জড়িয়ে আসে, একবচন-বহুবচন গুলিয়ে ফেলি, ক্রিয়াপদের ব্যাকরণে বীভৎস ভুল অনুপ্রবেশ করে, অথচ সিদ্ধান্ত পরিবারে রেওয়াজ অধিকাংশ সময় নিজেদের মধ্যেও ইংরেজিতে কথোপকথন, দ্রুত, চাতুর্যমণ্ডিত, সুবিশুদ্ধ উচ্চারণ, ইংরেজি বচনের তোড়, আমার বুকের মধ্যে রাজ্যের লজ্জা-শঙ্কা-ভয়ের-ডঙ্কা। সবচেয়ে আতঙ্ক খাবার টেবিলে ব'সে শ্রীযুক্তা সিদ্ধান্তের — এবং অপুর — সঙ্গে ব্রেকফাস্ট সমাপনে। দুপুরবেলা বিশ্ববিদ্যালয়ে উধাও হ'য়ে যেতে পারি, সায়ংকালে এর-ওর-তার ওখানে নেমন্তন্নের ছুতো, কিন্তু সকালে তো খাবার-টেবিলে গিয়ে বসতেই হতো, ইংরেজি বলতে গিয়ে গলদ্‌ঘর্ম হাবাগোবা আমি, আমার দু-পাশে মাতা ও কন্যা, ইংরেজি যাঁদের কাছে স্বভাবজ ভাষা। একদিকে রঞ্জনা অনর্গল ব্রডওয়ের গল্প করছে, কিংবা মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ম্যাকার্থিপনা কতটা ছড়াচ্ছে তা নিয়ে উত্তেজিত হচ্ছে, নয়তো হেনরি মিলারের শেষ বইটার প্রসঙ্গে বিস্তারিত হচ্ছে, অন্যদিকে চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত পণ্ডিত নেহরু অথবা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত তাঁকে গত মঙ্গলবার বা বিষ্যুদ্‌বার কী বলেছেন তার প্রলম্বিত বর্ণনা, আমি ভয়ে আড়ষ্ট।

অথচ অপুর মধ্যে বড়োঘরের মেয়ে হওয়া সম্পর্কে কোনো উন্নাসিকতা সত্যিই ছিল না। চিত্রলেখা সিদ্ধান্তের আন্তরিকতাতেও কোনো ত্রুটি নেই, বাচ্চা ছেলে, সদ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে ঢুকেছে, কিংবদন্তীস্বরূপা-তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথের গান শুনতে চেয়েছে, তিনি হর্ষিত-আনন্দিত, চেয়ারটি একটু কাছে টেনে এনে রোজই অন্তত একটি-দুটি গান আমাকে শোনাতেন। বয়সের ঢল নেমেছে, কণ্ঠস্বর সামান্য খাদে, কিন্তু এতটুকু কাঁপুনি নেই, তালে ঈষদতম বিচ্যুতি নেই : 'শুধু যাওয়া-আসা, শুধু স্রোতে ভাসা', কিংবা 'এখনো গেল না আঁধার', অথবা 'দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামলো।' আমি মুগ্ধ, সেই সঙ্গে হতভম্ব, কারণ, পরমুহূর্তেই, চিত্রলেখা সিদ্ধান্তের ইংরেজিতে আমাকে সস্নেহ প্রশ্ন, 'উইল ইউ হ্যাভ অ্যান আম, বাবা ?' রবীন্দ্রনাথের গান বিরাম স্তম্ভের মতো, তার দু-পাশে, ঝাঁকে-ঝাঁকে, অভিজাত উচ্চারণে, ইংরেজি বুলির উদ্দাম ডানা-ঝাপ্‌টানো, আমি পালাবার পথ পাই না।

সদ্য-আমেরিকা-ফেরত রঞ্জনা, পৃথিবীর সবচেয়ে বড়োলোক দেশের গল্পে সে সততমুখর, কিন্তু সব-কিছুই ইংরেজির জবানিতে। এত কাছে থেকে এত শৌখিন এত শাণিত এত বুদ্ধিতীক্ষ্ণ মহিলা তো আর দেখিনি, ইংরেজিতে কথোপকথন চালাতে গিয়ে আমি ভাষা খুঁজে পেতাম না, ব্যাকরণ কোথায় উধাও। মা-মেয়ে আমাকে, ধ'রেই নিচ্ছি, প্রচুর করুণা করতেন, সম্ভবত, মনে-মনে, দু'জনেরই একই ভাবনা : গাঁয়ের ছেলে, ইংরেজিতে কাঁচা, সহবত শিখতে কিছু সময় লাগবে, তবে শিখে নেবে হয়তো।

তারপর হঠাৎ লক্ষ্ণৌ থেকে অন্যত্র চ'লে গেলাম আমি, পঞ্চাশ দশকের শুরু থেকে শেষ, ঐ দশকের উপান্ত, ষাটের দশক, সিদ্ধান্ত পরিবারের অবস্থানেও অনেক

পরিবর্তন ঘটলো। নির্মল সিদ্ধান্ত মশাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হলেন, কয়েক বছর বাদে প্রয়াত হলেন, চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত ও রঞ্জনা দুজনেই বিলেতে প্রবাসিনী। ইতিহাসের বিধান, ক্রমশ পৃথিবীর প্রকৃতি পাল্টায়, পরিবেশ পাল্টায়, জীবনধারা পাল্টায়। রঞ্জনা বিলেতেই থেকে গেল, ওখানে এক সাহিত্যিকের সঙ্গে পরিণীত হলো, ভিয়েতনাম যুদ্ধের ভয়ংকর ধাক্কা একটু-একটু ক'রে সাহিত্য থেকে রাজনীতির দিকে তার মনকে ফেরাল, উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে সে রপ্ত হলো, খানিকটা ঘোর বামপন্থী স্বামীর প্রভাবে প'ড়ে, ক্রমশ মার্কসবাদের প্রজ্ঞায় নিজের চেতনাকে সমাচ্ছন্ন করল। রঞ্জনা, অপু, এখনো বিলেতেই, কিন্তু অনেকগুলি শ্রেণীস্তর, ধাপের পর ধাপ, সে পেরিয়ে এসেছে, খবরকাগজের পরিভাষায় তার বর্তমান পরিচয়, বলতেই হয়, প্রচণ্ড অতি-বিপ্লবী। নোংরা জামাকাপড়-পরা খেটে-খাওয়া বিলেত-প্রবাসী যাবতীয় ভারতীয় শ্রমিকের সঙ্গে তার এখন দোস্তি। যতই বছর গড়িয়েছে, তার রাজনৈতিক ঝোঁক আরো নিবিড় বাম-ঘেঁষা হয়েছে, তার পুরোনো বংশপরিচয়, সিদ্ধান্ত, সে আর ব্যবহার করে না, তার স্বামীর বংশপরিচয়েও তার প্রয়োজন নেই, সে এখন পুরোপুরি কমরেড রঞ্জনা, আসন্ন বিশ্ববিপ্লবের বাইরে যে-কোনো প্রসঙ্গ তার কাছে তুচ্ছাতিতুচ্ছ, আমার মতো বেহদ্দ প্রতিক্রিয়াশীলের সঙ্গে সে দু-দণ্ড ঘাড় বেঁকিয়ে কথা বলতেও আর রাজি হবে না।

শর্বরী দাশগুপ্ত কোনোক্রমে দুটো শব্দ বাংলায় উচ্চারণ করতে গিয়ে যে হাঁপিয়ে ওঠে, যার পৃথিবী আপাতত পাঁচতারা হোটেলের সুডৌল চৌহদ্দিতে সীমাবদ্ধ, বর্গাদার কাদের বলে তা জানতে যার বিন্দুতম আগ্রহও নেই, তার সম্বন্ধেও তাই ঠিক পরিপুষ্ট অনীহা জড়ো করতে পারি না। ইতিহাস এই কণ্টকাকেও হয়তো, কে জানে, একদিন তার নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করবে।

বাধে না, বাধানো হয়

১৯৪৭ সালের গতবসন্ত, বাংলা নববর্ষ সত্য শুরু হয়েছে কিংবা হবো-হবো করছে। পূর্ববর্তী অগস্ট মাসের সেই বীভৎস হত্যামহোৎসবের পর কলকাতার কেমন বিস্ফারিত চেহারা, কিছুটা অপরাধবোধ, খানিকটা ত্রাস, খানিকটা সামনের দিকে তাকিয়ে কী ঘটতে যাচ্ছে তা আদৌ বোঝা যাচ্ছে না, সেই অনিশ্চয়তা-জড়ানো আচ্ছন্নতা। খুচরো সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা মাঝে-মাঝে তখনো হচ্ছে, চোরাগোপ্তা ছুরি বসানো, অথবা রাতের অন্ধকারে হঠাৎ কোনো গরিব বস্তিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া, বড়ো ধরনের অশান্তি যদিও ঠিক হচ্ছে না, সবাই যেন প্রতীক্ষায়, এর পরবর্তী অধ্যায়ে কোন্ কাহিনী বিধৃত। পরের ছয় মাসে অবশ্য গোটা ভারতবর্ষের পরিস্থিতি আমূল পাল্টে গেল, নতুন ভূগোলের সঙ্গে পরিচিত হ'তে হলো আমাদের, ইতিহাসের রুদ্ধশ্বাস প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের সঙ্গে সংগতি রেখে। অথচ এত দ্রুত যে সব-কিছু ঘ'টে যাবে ১৯৪৭ সালের বসন্তশেষেও তা বোঝা যায়নি। কলকাতার এপাড়ায়-ওপাড়ায় ঈষৎ থমথমে ভাব, দিনের বেলা বাজার-স্কুল-কলেজ-দপ্তর-কাছারিতে যাতায়াত অব্যাহত, কিন্তু সন্ধ্যা নামলেই একটু অন্যরকম, সবাই যথাশীঘ্র নিজেদের আস্তানায় ফেরবার জন্য ব্যস্ত। হ্যারিসন রোড—যা এখন মহাত্মা গান্ধি রোড—এবং কলেজ স্ট্রীটের সংযোগস্থলে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ওভারটুন হলের দালানটি এখনো দাঁড়িয়ে আছে, যদিও তার ঝলমলে-ঝকমকে ভাব বহুদিন অপগত, জরার চিহ্ন আষ্টেপৃষ্ঠে। এখন নেই, কিন্তু তখন এই দালানে ওয়াই. এম. সি. এ.-র কলেজ শাখার অধিষ্ঠান ছিল। কলেজ শাখা, কিন্তু আবাসিকদের মধ্যে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকুল ছাপিয়ে তরুণ চাকরিজীবী বা অন্যান্য পেশাযুক্তদেরই বেশি ভিড়। মহানগরীর প্রায় কেন্দ্রবিন্দু, কলেজপাড়া, বইপাড়া, দুই রেল স্টেশনের সমদূরত্বে স্থিত, ওয়াই. এম. সি. এ.-র কলেজ শাখায় জায়গা পেতে ইচ্ছুক অগুনতি যুবক। মাসে পঁয়ত্রিশ টাকায় সকালে ঘরে চা পৌঁছে দেওয়া থেকে শুরু ক'রে পাঁচ দফা খাবারের ব্যবস্থা। নানা ঘরানার যুবকদের সহ-অবস্থান, বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত, বেশ-কিছু অন্য প্রদেশের তরুণরাও আছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন থেকে আগত।

এক শনিবার সন্ধ্যা, তখনো বোধহয় সান্ধ্য আইন জারি আছে, বাইরে বেরুবার উপায় নেই, কার ঘরে যেন ঘোর তর্কের সূচনা। দাঙ্গা নিজে থেকে বাধে না, দাঙ্গা পরিকল্পিত উপায়ে বাধানো হয়, কিছু ধান্দাবাজ ধড়িবাজ বিবেকহীন মানুষ ধর্মকে অছিলা ক'রে বাধান, সমস্ত সম্প্রদায়ের অসহায় গরিব মানুষজন

দাঙ্গার শিকার হয়ে পড়েন, তাঁদেরই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছুরিকাহত বা গুলিবিদ্ধ হ'তে হয়, এই হতভাগ্যদের মধ্যে কেউ-কেউ মারা যান, নয়তো দীর্ঘদিন হাসপাতালে কাটিয়ে পঙ্গু হ'য়ে ফেরেন, হয়তো তাঁদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে বস্তি থেকে উৎখাতও ক'রে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে, অস্থির অবস্থার জন্য যেহেতু কলকারখানার কল বা অন্য কাজকর্ম বন্ধ, তাঁদের রুটি-রুজিরও তাই উৎকীর্ণ সমস্যা।

তর্ক বাধলেই পক্ষ-প্রতিপক্ষের দ্বান্দ্বিকতা। ধান্দাবাজ-ধড়িবাজদের ষড়যন্ত্রের তত্ত্বে যাঁরা বিশ্বাসী নন, তাঁরা ধর্মীয় ইতিহাস, অধ্যাত্মবাদ, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত হলেন : যারা দাঙ্গা করে—প্রতিবেশীর পেটে ছুরি চালায়—প্রতিবেশীর জীর্ণ কুঁড়েঘরে আগুন লাগায়, তারাও ঠিক নিজে থেকে এ-সব করে না, তাদের উপর এক অপ্রতিরোধ্য প্রবৃত্তি ভর করে, সেই প্রবৃত্তির উৎসে ইতিহাস, ধর্ম, পুরাতত্ত্ব এবংবিধ জটিল সমস্যাবলী। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অতএব প্রায় নিয়তির লীলা, এই দাঙ্গার পিছনে যে-ভবিতব্য কাজ করছে, তা দূর করবার ক্ষমতা আমার-আপনার নাকি নেই। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম নয়, মহানিয়তির ইচ্ছায়, ইতিহাস মহানিয়তির বশংবদ।

আমার বন্ধু স্বরঞ্জন সরকার জাত-নাস্তিক, প্রমাণ না ক'রে ছাড়বেন না দাঙ্গা বাধে না, বাধানো হয়, বাধায় কিছু স্বল্পসংখ্যক স্বার্থান্বেষী খলচরিত্রের মানুষ, ধর্ম যাদের কাছে মুনাফা-ব্যবসায়ের উপকরণ মাত্র। স্বরঞ্জন সরকার প্রমাণ উপস্থাপনে উদ্‌গ্রীব, তাৎক্ষণিক প্রমাণ, যে-কেউ দাঙ্গা বাধাতে পারে, তেমন-তেমন যদি তার মতিগতি হয়, দাঙ্গা বাধিয়ে যদি বাড়তি ফায়দা তুলতে চায়। অতএব, ইতিহাসের ঘাড়ে নিয়তির বোঝা চাপিয়ে দেওয়া ঘোর অসাধুতা। স্বরঞ্জন সরকারের কণ্ঠস্বর অন্য সকলের কণ্ঠ ছাপিয়ে, রাত না ফুরোতেই নাকি প্রমাণ ক'রে দেখিয়ে দেবেন যে-কেউ যে-কোনো ছুতোয়, অথবা ছুতো ছাড়াই, দাঙ্গার সূচনা ক'রে দিতে পারে।

নৈশ আহারের ঘণ্টা, তর্কের যবনিকা পতন। প্রায়-গ্রীষ্ম, গুমোট, সব ঘরে পাখা নেই, যার-যার ঘরে পাখা রাত্রিযাপনের জন্য তাদের অপরিসর ঘরে সারিবদ্ধ অভিযান। রাত সাড়ে এগারোটা পেরিয়ে গেছে, কারো-কারো ঘুম এসেছে, কারো-কারো আসেনি। এমন সময় হৈ হৈ রৈ রৈ, এক প্রায়-অবিশ্বাস্য আতঙ্ককাহিনী।

ওভারটুন হলের চারতলার ন্যাড়া ছাদে একটি চানের জায়গা, যা নিয়মিত ব্যবহৃত হয়, অথচ যার দরজাটি ভাঙা অবস্থায় প'ড়ে আছে বেশ কয়েক বছর ধ'রে। জলে প'চে কাঠের দরজা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়, কিছুদিন করোগেট টিনের পাত কেটে মেপে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তা-ও দুদিনে ছ্যাঁদা হ'য়ে গেছে, এখন শুধু একটি চটের পরদা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষকে বহুবার ব'লেও কোনো সুরাহা হয়নি; মাসে মাত্র পনেরো বা কুড়ি টাকা ঘর ভাড়া দিচ্ছে সবাই,

কর্তৃপক্ষের সংগতির হিশেবে কিছুটা অসাচ্ছল্য, শৌচাগারের নতুন দরজা তাই আর লাগানো হয় না, চটের পরদাই ঝুলে থেকে আবরু রক্ষা করে।

রোমাঞ্চকর কাহিনী পরে যা শোনা গেল : আরো কয়েকজনের সঙ্গে সুরঞ্জন সরকার চারতলার সেই খোলা ছাদে শয্যাশায়ী, গুমোট এড়ানোর জন্য। হঠাৎ, মধ্যযামিনীর কাছাকাছি মুহূর্তে, তড়াক ক'রে বিছানা ছাড়লেন সুরঞ্জন। ধীরে-সুস্থে একটি দেশলাই কাঠি বাক্সের গায়ে ঠুকলেন, উজ্জ্বল আগুনের স্ফুলিঙ্গ, কয়েক পা হেঁটে শৌচাগারের দরজায় বিকল্প-হিশেবে-ঝোলানো পর্দায় আগুন ছুঁইয়ে দিলেন। সদ্য-গত বসন্তের বিশুষ্ক পরিমণ্ডল, হাওয়াতে ন্যূনতম আর্দ্রতা নেই, পলকের মধ্যে আগুনের শিখা, ঐ চারতলার ছাদে, আকাশকে রক্তরাঙা ক'রে ঊর্ধ্বমুখী।

ওভারটুন হলের পিছনে, দেড়শো-দুশো গজ পশ্চিমে, কলাবাগান বস্তি, এক বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত খেটে-খাওয়া গরিব মানুষজনের গাদাগাদি ভিড়, এ-মানুষগুলি গরমের অবর্ণনীয় প্রকোপে কাতর, অনেকেই বস্তির বাইরের রাস্তায় খাটিয়া পেতে শোওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। ওভারটুন হলের পুবে, দুশো-আড়াইশো গজ এগুলে, পোটোটুলি, অন্য-এক সম্প্রদায়ভুক্ত মধ্যবিত্ত পরিবারে ঠাসা, পুরনো বাড়িঘর, অনেকেরই ছাদে শোওয়ার ব্যবস্থা।

সুরঞ্জন সরকারের প্রতিভার তুলনা নেই। চটের পরদা থেকে উৎসারিত আগুন মাত্র মিনিট পাঁচেক জ্বলল, তারপর তা থিতিয়ে এল, শুধু ধিকি-ধিকি কালো ফিকে ধোঁয়া অনেকক্ষণ ধ'রে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে কৃষ্ণপাক্ষিক রাত্রির আকাশকে আরো কলঙ্কিত করতে থাকল।

কলাবাগান সচকিত, পোটোটুলিও সমান চঞ্চল। মাসের পর মাস গ্লানিকর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়ে এখন সতত সন্দেহ, এই বুঝি আরো কোনো ভয়ংকর সর্বনাশ ঘটতে যাচ্ছে। কলাবাগানের বস্তিবাসীরা দেখছেন দাউ-দাউ ক'রে আগুন জ্বলছে, পুবের আকাশ লাল, অতএব, ধ'রেই নেওয়া যায়, পোটোটুলির দাঙ্গাবাজরা আক্রমণ শুরু করেছে, রাস্তার দু-ধারে আগুন দিতে-দিতে এগুচ্ছে। কলাবাগানে অতএব আত্মরক্ষার আয়োজন, পরমেশ্বরের কৃপাভিক্ষা। পোটোটুলিতেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্ত থেকে গুজব, কলাবাগান বস্তি ভেঙে কাতারে-কাতারে আক্রমণ-কারীরা এগুচ্ছে, তাদের হাতে জ্বলন্ত মশাল ও বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র, তারা দোকানপাটে অগ্নিসংযোগ করতে-করতে এগুচ্ছে। সুতরাং এদিকেও প্রতিরোধের প্রস্তুতি, ওদিকেও তাই, এক পক্ষের চিৎকারে ঈশ্বর-আরাধনা, অন্য পক্ষের ঠিক ঈশ্বরকে নয়, দেশমাতৃকাকে স্মরণ।

মস্ত সৌভাগ্য আগুনের উজ্জ্বলন্ত শিখা অচিরেই থিতিয়ে যাওয়ায় উভয় পক্ষেই একটু দ্বিধাগ্রস্ততা, তবে কি আক্রমণকারীরা রণে ভঙ্গ দিল, না কি তারা অন্য কোনো মতলব আঁটছে। ঘুমের প্রশ্ন নেই, যে যেখানে দাঁড়িয়ে বা ব'সে, কলাবাগানে এবং পোটোটুলিতে, পরমেশ্বর ও দেশমাতার বন্দনার গিটকিরি ঘণ্টাখানেক ধ'রে অব্যাহত।

মিনিট দশেক বাদেই অবশ্য তিন-ট্রাক-বোঝাই পুলিশ-শান্ত্রী এসে হাজির, সঙ্গে গোরা সার্জেণ্ট একজন-দুজন ; ব্যাপারটা বুঝে নিতে তাদের মিনিট দশেক লাগল, তারপর সিঁড়ি কাঁপিয়ে ওভারটুন হলের একতলা-দোতলা-তিনতলা-চারতলা থেকে টেনে-হিঁচড়ে, যতদূর মনে পড়ে, চব্বিশটি যুবককে গ্রেপ্তার ক'রে ট্রাকে তোলা। এই চব্বিশজনের সমাবেশে আশ্চর্য সর্বধর্ম সমন্বয়, হিন্দু, মুসলমান, সিরিয়ান গির্জাভুক্ত খ্রিস্টান, নিকষ-খাঁটি ক্যাথলিক, সিংহলী বৌদ্ধ, একটি-দুটি কাবুলি বা তিব্বতীয়ও হয়তো বা। হঠাৎ মনে এল, টেস্ট খেলোয়াড় জামশেদপুরের প্রয়াত পুটু চৌধুরীও ঐ দুই ডজনের মধ্যে।

সুরঞ্জন সরকার ফৌজদারি অপরাধযোগ্য দায়িত্বজ্ঞানহীনতা দিয়ে তাঁর তত্ত্বের ফলিত প্রয়োগ ঘটালেন, দাঙ্গা বাধে না, বাধানো হয়, তেমন-কোনো কুমতিমনা থাকলে অতি-সামান্য ছুতোয় কিংবা ছুতোহীনতা থেকেও দাঙ্গা বাধানো যেতে পারে। তার প্রমাণ দেখানো কী ভয়ংকর পরিণাম নিতে যাচ্ছিল তা নিয়ে অনু-যোগ তুলে লাভ হলো না, কিছু-কিছু মানুষ আছেন, থাকেন, যাঁরা অপাপবিদ্ধ, যথা সুরঞ্জন সরকার।

মাত্র একটি বাড়তি তথ্য সংযোজন করতে হয়। ঐ চব্বিশজন জামিন পেয়ে বেরিয়ে আসার আগেই শৌচাগারের জন্য কাঠের পাকাপোক্ত ঝকঝকে নতুন দরজা ব'সে গেল। এবং, অন্য একটি আপেক্ষিক অজরুরি তথ্য, কর্তৃপক্ষ সুরঞ্জন সরকার ও তাঁর সহচর আরো কয়েকজনের হাতে কলেজ শাখা থেকে বিতাড়িত হবার চিঠি ধরিয়ে দিলেন।

খাটুদা, লীনাদি কেন

পশ্চিম বাংলার মফস্বল শহর, নামোল্লেখ না করলেও কিছু যায় আসে না, প্রত্যেকটি শহরের একই আদল, একটু এবড়ো-খেবড়ো, জীবনের চেয়ে জরার প্রভাবই যেন বেশি। বাজার পেরিয়ে রেল-স্টেশন। পৌষ মাসের মন্থর দুপুর, সাইকেল রিকশায় এগুচ্ছি, হঠাৎ একটা চায়ের দোকানের পাশে, গোটা-গোটা অক্ষরে, গাঢ় হলুদ কালিতে, দেয়াল-লিখন : 'খাটুদা, লীনাদি কেন'। না, প্রশ্নবোধক চিহ্ন নেই, প্রয়োজন বোধ করা হয়নি ব'লেই হয়তো নেই, নয়তো, কে জানে, যিনি লিখছিলেন, তাঁর অন্যত্র তাড়া ছিল, কিংবা হঠাৎ, বিপদের গন্ধ পেয়ে লিখন অসম্পূর্ণ রেখেই স'রে পড়তে হয়েছিল তাঁকে।

কিংবা, যা বলার তা বলা হয়েই গেছে, একটি সংহত সামাজিক উপাখ্যান 'খাটুদা, লীনাদি কেন'-তে বিধৃত, আমি বাইরের মানুষ, আমার অধিকার নেই সেই রহস্যের শরীরে অনুপ্রবেশের। হয়তো ব্যাকুলতা, নয়তো ক্ষোভ, অথবা সতর্কতাসংকেত। বাজার পেরিয়ে রেল-স্টেশন, শীতের দুপুরে মন্থর সাইকেল রিকশা, খাটুদা, লীনাদি কেন।

খাটুদা, লীনাদি কেন স্কুলশিক্ষয়িত্রীর পদটি পেয়ে গেলেন, যোগ্যতর আরো বেশ কয়েকজন তো ছিলেন। অথবা, লীনাদি কেন পেলেন না, ওঁর চেয়ে উপযুক্ত তো কেউ ছিলেন না। খাটুদা, লীনাদি কেন প্রকাশ্য সভায় ও-রকম হেনস্থার মুখোমুখি হলেন, উনি যা বলেছিলেন পাড়ার অন্য-সবারও তো তাতে সায় আছে। খাটুদা, শেষ পর্যন্ত আপনি লীনাদিকে কেন বিয়ে করতে মনস্থ করলেন, শেফালিদি কী অপরাধ করেছিলেন আপনার কাছে? খাটুদা, বলুন লীনাদি কেন শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হলেন? খাটুদা, লীনাদি কেন মহিলা সমিতির দায়িত্ব থেকে অপসৃত হলেন, লীনাদিকে কেন পঞ্চায়েত প্রধানের পদ থেকে, নিছক মহিলা ব'লেই, বঞ্চিত করা হলো? খাটুদা, আপনাদের পরিবারের যথেষ্ট বিষয়-আশয় থাকা সত্ত্বেও লীনাদি কেন এ-রকম পরম দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন? খাটুদা, আমাদের মফস্বল শহরে এই প্রথম 'তিন পয়সার পালা' মঞ্চস্থ করার মতো দুঃসাহস দেখানো হলো, তবে কেয়া চক্রবর্তীর অভিনীত চরিত্রে আপনি কেন অমন একচোখো হয়ে লীনাদিকে বাছলেন, কিংবা কী এমন অমার্জনীয় অপরাধ করেছিলেন লীনাদি, যে তাঁকে বাদ দিয়ে শ্যামলীকে রিহার্সালে আসতে বললেন?

একটির পর আরেকটি বিকল্প প্রশ্ন। শহর পেরিয়ে রেল-স্টেশন, পিছনে ফেলে

আসা দেয়াল-লিখন। মফস্বল শহরের কোনো দুস্তর উপন্যাস-সম্ভাবনার ইঙ্গিত চারটি শব্দের আড়ালে বিন্যস্ত, না কি, পৌষের উজ্জ্বল দুপুরে, অন্য-কোনো না-বলা বাণীর ঘনযামিনী? খাটুদাকে কি আমি চিনি? লীনাদিকে? গতকাল সন্ধ্যায় যে-আলোচনাসভায় যেতে হয়েছিল, তাতে কি ওঁরা ছিলেন? না কি ওঁদের দুজনের কেউই আর এখানে নেই। খাটুদা, লীনাদি কেন আরো কয়েকটা দিন অপেক্ষা করার সুযোগ পেলেন না, আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে আপনি নিজে তো গেলেনই, সঙ্গে লীনাদিকেও কেন নিয়ে গেলেন?

ছেলেবেলায় স্কুলের পরীক্ষায় শূন্য স্থান পূর্ণ করতে হতো, কিন্তু সেখানে আদৌ দ্বন্দ্বমূলক সমস্যা ছিল না, মাস্টারমশাইরাও জানতেন, আমরাও জানতুম, শূন্যস্থানে মাত্র একটিই যথার্থ প্রয়োগ। খাটুদা-লীনাদিকে নিয়ে অর্ধোচ্চারিত প্রশ্নের সমস্যার, হায়, যদি সে-রকম কোনো স্বচ্ছন্দ একক সমাধান সম্ভব হতো! অর্ধস্ফুট প্রশ্ন, যেখানে জিজ্ঞাসাই সম্ভবত পরিপূর্ণ অবয়ব পায়নি, কোথায় তার উত্তর হাতড়ে বেড়াবো তা হ'লে?

পশ্চিম বাংলার মফস্বল শহর এখনো গড়ে উঠছে না ইতিমধ্যেই ধ'সে পড়ছে ঠিক বোঝা যায় না, আসলে দ্বন্দ্বমূলক জটিলতা। কোথাও সামাজিক সম্পর্কগুলি আদ্যন্ত পাল্টে যাচ্ছে, অন্য-কোথাও স্থবিরতায় আবদ্ধ। কোথাও আর্থিক সংগতি-অসংগতির প্রাসঙ্গিকতা ইতিহাসের প্রলেপ বুলোচ্ছে, অথবা সবাই যেন অপেক্ষায় আছে গোটা ভারতবর্ষে যা ঘটছে তার ঘাত-প্রতিঘাতে পশ্চিম বাংলা কোন্ অবস্থানে পৌঁছুবে, তার কতটা ধাক্কা গড়িয়ে পড়বে এই জেলাতে। এবং, সেই সঙ্গে, এই মফস্বল শহরে? তবে এই শহরের যে-আলাদা আদল, তাকেই বা অস্বীকার করি কী ক'রে? এই শহর হুবলি নয়, মীরাজ নয়, মীরাট নয়, সমস্তিপুর নয়, বিজয়পদ বা মাদুরাই নয়, ইরিনজালাকুড়া বা কায়ংকুলাম নয়, কর্নাল বা হিসার বা ভিলোয়াড়া নয়, খাটুদা-লীনাদিদের জড়িয়ে এই শহর তার আলাদা মাধুরী নিয়ে, তার আলাদা হার্দ্যতা কিংবা হৃদয়হীনতা নিয়ে, তার নিজস্ব লাবণ্য কিংবা রুক্ষতা নিয়ে, টিঁকে আছে, থাকবে: প্রতি মুহূর্তে মনে হবে আগামীকাল মুখ থুবড়ে পড়বে এই শহর, অথচ সে-রকম কিছুই ঘটে না, খাটুদা-লীনাদিদের নিয়ে দেয়াল-লিখন অব্যাহত থাকে।

মারাত্মক অপ-উক্তি দিয়ে শুরু করেছিলাম, এমনকি পশ্চিম বাংলাতেও, সুতরাং মফস্বল শহরে-মফস্বল শহরে প্রকৃতিভেদ হতে বাধ্য, খাটুদা-লীনাদিদের শহরের সঙ্গে প্রশান্তদা-বিনীতাদিদের শহরে একটু তফাত থেকে যাবেই। সামাজিক বিন্যাসকেও ভূগোল মানতে হয়, বিশেষ অবস্থানের ইতিহাসপরম্পরাকে কুর্নিশ জানাতে হয়। কোথাও কৃষ্ণচূড়া-পলাশের সমারোহ, কোথাওই বা শিউলি ফুলের; সেই বিশেষ দ্যোতনা মফস্বলের চরিত্রকে ঘনত্ব দান ক'রে যায়।

গ্রাম গড়া হবে-ধুঁকবে-নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে খরা-বন্যায়। মফস্বল শহর কখনো

প্রগতির দিকে হেলবে কখনো পুষ্টির অভাবে আবর্জনার জঞ্জালপুঞ্জে পর্যবসিত হবে, একপাশে উজ্জ্বলতার পালিশ, অন্যদিকে, বর্ষাকালীন কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া-তৃতীয়ার চাঁদের প্রতিভার মতো, মলিনতাকে আরো কাছে টেনে আনবে। খাটুদা-লীনাদিদের উপাখ্যান জড়িয়ে থাকবে এই মফস্বল-ইতিবৃত্তের সঙ্গে, রহস্য ও রহস্যহীনতা একীভূত হবে, জটিলতা সরল হবে, নয়তো আরো গভীর কুয়াশায় মিলিয়ে যাবে।

লীনাদি-খাটুদাদের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আলাদা ক'রে লেখা হবে না, হয় না কোনো দেশে কোনো দিনই। অথচ আমি-আপনি সবাই জানি লীনাদি-খাটুদারাই ইতিহাসের আকর, একটি যুগের সঙ্গে আরেকটি যুগের সংযোগসাধন করছেন তাঁরা, অথবা অন্য অবস্থায়, একটি যুগের সঙ্গে আরেকটির নির্মম বিযুক্তি ঘটাচ্ছেন, তাঁদের মহত্ব দিয়ে, তাঁদের তুচ্ছতা দিয়ে, তাঁদের পরশ্রীকাতরতা দিয়ে, তাঁদের ইতিহাসচেতনা দিয়ে, তাঁদের ইতিহাসচেতনাহীনতা দিয়ে।

খাটুদা, লীনাদি কেন। কেউ উপন্যাসের প্রারম্ভিক অধ্যায়ে প্রবেশ ক'রে যাচ্ছেন, কেউ ধ'রে নিচ্ছেন ছোটোগল্পের শেষ এখানে, অন্য-কেউ রবীন্দ্রনাথ কপ্‌চাচ্ছেন, শেষ নাহি যে। খাটুদা-লীনাদিরা সম্ভব প্রতিটি মফস্বল শহরে, তাদের আদল-বহির্বিন্যাস-মুদ্রাদোষ ইত্যাদি কখনো-কখনো ঈষৎ পাল্টে যায় মাত্র। ইতিহাসগুলি এক, অথচ সামান্য পৃথগীকৃতও।

খাটুদা, লীনাদি কেন। ট্রেনের চাকা ঘুরছে, বেগবান হচ্ছে, এক মফস্বল শহরের স্টেশন পেরিয়ে অন্য-এক মফস্বল শহরের স্টেশনে, চাকা ঘুরছে, প্রথমে আস্তে, পরে সবেগে, কখনো আর্তনাদের মতো, কখনো কৌতুকে দ্রবীভূত হয়ে, কখনো দ্বিধাতে ভেঙে খান্‌খান্, লীনাদি কেন, লীনাদি কেন। এক মফস্বল শহরের খাটুদা-লীনাদি-উপাখ্যান পরবর্তী শহরের খাটুদা-লীনাদিদের কাহিনী থেকে একটু হয়তো স'রে যেতে বাধ্য, অথবা, কে জানে, হুবহু একইরকম। বাইরে থেকে, ক্ষণিকের অতিথি হিশেবে হাজির হয়ে, সে-সব প্রগাঢ়তায় প্রবেশ সম্ভব নয়। মোটামুটি একটি ধারণা ক'রে নিতে হয় তাই ; এই কারণে নিতে হয় যে অন্যথা প্রশাসনব্যবস্থাকে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, ব্লক তথা মহকুমা তথা জেলার রাজনীতির বিন্যাসে চিড় ধরে তা হ'লে, অথবা যে-চিড় অবশ্যম্ভাবী ব'লে মনে হয়েছিল গতকাল তা হতচকিত হ'তে বাধ্য হয়। তাই পূর্বকল্পনা মিশিয়ে আমরা খাটুদা-লীনাদিকে এদিক-ওদিক চালান ক'রে দিই, কিংবা, দ্বিধাহীন, তাঁদের স্তিমিত মফস্বল শহরের দরমার বেড়া-দেওয়া চায়ের দোকানের আড়ালে, তোলা উনুন, কেতলিতে ধোঁয়া উড়ছে, দেয়াল, ওপাশে দেয়াল-লিখন, খাটুদা-লীনাদি রহস্যজনকভাবে হারিয়ে যান।

ইতিহাস এগোয়, অথচ এগোয় না। খাটুদা, লীনাদি কেন আত্মহত্যা বেছে নিলেন ? খাটুদা, ওঁকে সর্বস্বান্ত ক'রে লীনাদির সমস্ত সম্পত্তি কেন আপনি হাতিয়ে নিলেন ? খাটুদা, লীনাদি দল থেকে বহিষ্কৃত হবার আগে কেন একবার আত্মপক্ষ

সমর্থনের শেষ সুযোগ পেলেন না? পশ্চিম বাংলার মফস্বল শহর কথা বলে না, অথবা একই সঙ্গে অনেক কথা বলে, কোন্‌টা গ্রহণ করবো, কোন্‌টা ঝেড়ে ফেলবো। ট্রেনের চাকা ঘুরছে, গোড়ার দিকে ফিশফিশ উচ্চারণ, খানিক বাঁদে আর্তধ্বনি, খাটুদা, লীনাদি কেন, খাটুদা, লীনাদি কেন।

মণ্টু ভঞ্জ নেই, কিন্তু মণ্টু ভঞ্জরা আছেন

প্রতাপাদিত্য রোড ধ'রে খানিক এগিয়ে একটি বিশেষ জায়গা যখন অতিক্রম করতে যাই, বুকের মধ্যে ধক্! পলেস্তারা-খ'সে-আসা একটি দোতলা বাড়ির একতলায় দে'ড়খানা ঘর নিয়ে মণ্টু ভঞ্জের টাইপিং শেখানোর স্কুল ছিল, সকাল-বিকেল আট-দশটি ছেলে-মেয়ে টাইপরাইটারে খটাখট শব্দ তুলে হাত পাকাত। স্কুলটি উঠে গেছে, দরজায় তালা ঝুলছে। বেশ কয়েকবছর ধ'রে মণ্টু ভঞ্জ হাঁপানিতে ভুগছিলেন, সেই সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের দৌর্বল্য, কিছুদিন আগে গত হয়েছেন। প্রতাপাদিত্য রোড দিয়ে যখনই যাই, একটি শূন্যতা বোধ করি; মণ্টুবাবুর অবর্তমানে ও-পাড়ার আদলটাই যেন, অন্তত আমার কাছে, পাল্টে গেছে।

কলকাতার উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম প্রতিটি পাড়ায় মণ্টু ভঞ্জের মতো হাজার-হাজার গৃহস্থ মানুষ ছড়িয়ে আছেন। কয় পুরুষ আগে এঁরা গ্রাম থেকে শহরে এসেছিলেন, কবে কখন অনেকেই আর স্পষ্ট ক'রে বলতে পারবেন না, গ্রামের সঙ্গে সংযোগ শিথিল হ'তে-হ'তে এখন প্রায় অন্তর্হিত। কলকাতার বসতবাড়ি, শস্তার আমলে পূর্বপুরুষ কেউ পাকা দালান তুলে গিয়েছিলেন, একটু-একটু ক'রে হয়তো তা বাড়ানো হয়েছে, কিংবা একটু-একটু ক'রে ক্রমশ ভাগ হয়েছে। বাড়ির রোজগেরে পুরুষরা সম্ভবত কোনো সরকারি বা সওদাগরি দপ্তরে কাজ করেন, কেউ হয়তো কোনো প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, কারো বা ছোটোখাটো ব্যবসা। এঁদের মধ্যে ঠিক কেউই জাগতিক সাফল্যের মগ্‌ডালে তা বলা চলে না। এ-বাড়ি অথবা ও-বাড়ি থেকে হঠাৎ একটি-দুটি ছেলে যদি পরীক্ষায় খুব ভালো করে, পাড়াসুদ্ধ মাতামাতি অনেকদিন ধ'রে চলে। তবে প্রধানত মধ্যবিত্ত পাড়া, স্বপ্নগুলিতেও তাই মধ্যবিত্ততার আমেজ। বাড়ির মেয়েরা বাইরে বেরুতে এখনো তেমন সড়গড় হয়নি, কিন্তু, একেবারে হালে, তাদের মধ্যেও কেউ-কেউ, সাংসারিক অবস্থার চাপে, বাড়তি রোজগারের ধান্দায় কাজে-কর্মে যোগ দিচ্ছে এখানে-ওখানে।

ফুটবলের ঋতুতে অথবা সর্বজনীন পালা-পার্বণ অনুষ্ঠানে এ-সমস্ত পাড়া জুড়ে বেশ খানিকটা আবেগগত ঐক্য চোখে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে, দুটো-তিনটে বড়ো দলের বাইরেও, আনুগত্য প্রকট-হয় পাড়ার নামে যদি কোনো দল থাকে, তাকে ঘিরে। পৃথিবীর, দেশের, রাজ্যের সমস্যা নিয়ে রকে-রকে আলোচনা, সর্বদা সরব, কখনো সকৌতুক, রাজনৈতিক তর্ক-বিতর্ক। পাড়ার ঘরোয়া কাঠামোটি অটুট থাকে, কিন্তু রাজনৈতিক আলোচনায় দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা প্রকট হ'য়ে আসে। সম্ভবত

দপ্তরে-দপ্তরে ইউনিয়নের সঙ্গে যে-যোগসূত্র স্থাপিত, তার প্রভাব চিন্তাধারার উপর পড়ে, দপ্তরের রাজনীতি পাড়াতেও ক্রমে-ক্রমে অনুপ্রবেশ করে। ইউনিয়নের প্রভাবের কথাই বা শুধু বলি কেন, শিক্ষক আন্দোলনের প্রভাব আছে, ছাত্রযুব আন্দোলনের জেরও পাড়াতে ঢেউ তোলে। দলভিত্তিক রাজনীতির অনুশাসন খুব যে বজ্রকঠিন তা নয়, রাজনৈতিক মতামত নিয়ে সারা বছর খুব যে রেষারেষি-ঝকাঝকি তা-ও না। অতি সম্প্রতি একটা-দুটো পাড়ায় একটু-আধটু পটকা ছোঁড়া-ছুঁড়ির সংস্কৃতি অবশ্যই অনুপ্রবেশ করেছে, তা হ'লেও বছর ভ'রে প্রধানত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।

নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়লে কিন্তু হঠাৎ রাজনৈতিক আনুগত্যগুলি গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে। দলীয় সংগঠন অবশ্যই মুখ্য নিয়ামক, তবে সেই সঙ্গে সাহায্য জোগাতে তখন এগিয়ে আসেন পাড়ার সমর্থকরা। এই মানুষগুলি সারা বছর বিবিধ সাংসারিক সমস্যায় নিমজ্জিত, ছেলের চাকরির জন্য উমেদারি—মেয়ের বিয়ে—বাড়ির রঙ ফেরানো—পুরোনো ধার শোধ ইত্যাদি। এদের মধ্যে কারো-কারো কোনো বিশেষ দলের খাতায় অবশ্যই নাম লেখানো আছে। তবে দলের জন্য তেমন যে একটা সময় বছর জুড়ে দিতে পারেন তা মনে হয় না। হয়তো প্রতিমাসে স্রেফ চাঁদা ধ'রে দিচ্ছেন, বিশেষ-কোনো উপলক্ষে দলের হ'য়ে টাকা তুলতে বেরিয়েছেন, কিংবা মিছিলে যোগ দিয়েছেন, তার বেশি খুব একটা জড়িয়ে পড়তে ইচ্ছা থাকলেও বোধহয় পারেন না। দলের উৎসাহী সমর্থক এঁরা, কিন্তু সব অবস্থাতে যে সক্রিয় সমর্থক তা বলা চলে না।

মণ্টু ভঞ্জের অবস্থান মনে হয় ছিল এই মাঝামাঝি জায়গায়। আছেন, দলের সঙ্গে আছেন, সব অবস্থাতেই আছেন, এক দফা কয়েক মাস আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ ক'রে জেলও ঘুরে এসেছেন, তবে আপাতত সংসারের ঝুঁকি সামলাতে হচ্ছে, খেলার মরশুমে খেলা-দেখার নেশা আছে, বাংলা সিনেমার মোহ, শ্যামবাজার-হাতিবাগান পাড়ায় গিয়ে শনি-রবিবার সন্ধ্যায় মাঝে-মধ্যে নাটক দেখার বাতিক, ঈষৎ পুরোনো ধাঁচের নাটক, ময়দানপাড়ার নাটকগুলির সঙ্গে এঁদের রুচির বা বোধগম্যতার ঠিক মিল হয় না। তা ছাড়া পাড়ার নানা ব্যাপারে এঁরা জড়িয়ে আছেন, কিছু-কিছু পাড়াগত সমস্যা, এঁরা অন্তত মনে করেন, রাজনৈতিক বিশ্বাস পাশে সরিয়ে রেখেও নিরসন করা সম্ভব।

এই মোটামুটি সুগৃহস্থ মানুষগুলি নির্বাচনের ঋতুতে খোল-নলচে বদলে যান। অনেকেই দপ্তর থেকে ছুটি নিয়ে ফেলেন, কিংবা ব্যবসায় ঢিলে দেন, মণ্টু ভঞ্জ তাঁর টাইপিং স্কুল বন্ধ ক'রে দিতেন, অথবা তা নামমাত্র খোলা থাকত। নির্বাচন রাজনৈতিক সংগ্রামের অন্যতম অঙ্গ, কিন্তু মণ্টু ভঞ্জদের কাছে, সেই সঙ্গে, তার আলাদা একটি সম্মোহনও, সুখে-দুঃখে-হরিষে-বিষাদে-গ্রীষ্মে-বর্ষায় পাড়ার লোক-জনের সঙ্গে জড়িয়ে আছি আমরা, আমাদের রাজনৈতিক আদর্শ পাড়াময় হয়তো পুরোটা ছড়িয়ে দিতে পারিনি, তবে এটা প্রমাণ ক'রে দেখিয়ে দেবো পাড়ার

লোকজনের আনুগত্য আমাদের দিকেই। মণ্টু ভঞ্জদের অতএব ঘোর-লাগা অবস্থা, তা ধিন্ তা ধিন্। বড়ো রাস্তা, মেজো রাস্তা, সেজো রাস্তা, বড়ো গলি, ছোটো গলি, এঁদো গলি, এদিককার পাকা বাড়ি, ওদিককার বস্তি, অনুকম্পায়ী ভোটদাতাদের সম্ভাব্য ফর্দ তৈরি করেছেন, তাঁদের দিকে ঝুঁকে-থাকা যাদের-যাদের নাম ভোটারতালিকা থেকে বাদ পড়েছে তাদের দিয়ে দরখাস্ত করিয়ে যথাস্থানে জমা দেওয়া, পাড়ার প্রচারের কৌশল স্থির করা, কবে থেকে ও কতটা বাড়ি-বাড়ি যাওয়া হবে তা নির্ধারণ, সকাল-বিকেল মিছিলের ব্যবস্থা, কোথায় কোন্ আয়তন-আকারের নির্বাচনী সভা হবে সে-সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রতিপক্ষের ক্রিয়াকলাপের ব্যাপারে একটু-আধটু গোয়েন্দাগিরির আয়োজন, দেওয়াল-লিখনের জন্য সরঞ্জামাদি কেনা-কাটা, এই নির্বাচনী শাখাদপ্তরের সঙ্গে এপাশের-ওপাশের শাখাদপ্তরের সংযোগ রক্ষা। অগুনতি কাজ, খুঁটিনাটি কাজ, দলের প্রার্থীকে যে-বিশেষ কয়েকটি জায়গায় ঘুরিয়ে না আনলে চলবে না সে-জায়গাগুলি বাছা আর প্রার্থীর সময়ের সঙ্গে সময় মিলিয়ে নেওয়া, গানের স্কোয়াডের জন্য যথাস্থানে যোগাযোগ করা, সুতো কেনা, আঠা কেনা, কাগজ কেনা, পেরেক কেনা, চেয়ার-টেবিল ভাড়া করা, মাইকের ব্যবস্থা করা, থানাতে সন্ধ্যার মিটিঙের খবর পৌঁছোনো। প্রতিপক্ষীয়রা কী কুৎসা রটাচ্ছে দলকে তা অবহিত করা, কোন্ ভোটদাতা চারমাস আগে অন্য পাড়াতে উঠে চ'লে গেছে, ভোটের দিন তাকে হাজির করানো যায় কিনা তা নিয়ে চিন্তায় নিমগ্ন হওয়া।

দলের সংগঠন আছে, প্রায়-নিটোল ব্যূহবদ্ধতা আছে, প্রতিটি পাড়া নিয়ে আগে থেকে ছক কাটা আছে, কোথায় কীভাবে এগুতে হবে তা মোটামুটি পূর্বনির্ধারিত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক দলকেই বিকেন্দ্রীকরণ বস্তুটিকে কুর্নিশ জানাতে হয়, নির্বাচন প্রচারে প্রস্তুতিপর্ব-মুষলপর্ব-সমাপ্তিপর্বের দায়িত্বে পৌঁছে যান মণ্টু ভঞ্জরাই, তাঁদের বাদ দিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান অকল্পনীয়।

দলীয় প্রার্থীকে সম্ভবত মণ্টু ভঞ্জরা আদৌ চিনতেন না, কিংবা তাঁর সঙ্গে অতি যৎসামান্য পরিচয় ছিল। পাড়ার সঙ্গে তাঁকে মানিয়ে নেওয়ার কর্তব্যটি মণ্টু ভঞ্জদের উপরে গিয়েই পড়ে, তাঁরাই প্রার্থীকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নেন, কোন্ রাস্তার কোন্ বিশেষ বাড়িতে কেন একটু বেশি সময় কাটাতে হবে। উনষাট নম্বর বস্তির প্রধান কী-কী সমস্যা, আজ বিকেলের বক্তৃতায় অমুক-অমুক শহিদের নামোল্লেখ করতে প্রার্থী যেন ভুলে না যান। বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেগুলি ভোর রাত থেকে পোস্টার সেঁটেছে, হাতে যথেষ্ট পয়সা ছিল না তাই ওদের জলখাবার পর্যন্ত কিনে দেওয়া যায়নি, ওরা কিছু মনে করেনি ; তবে প্রার্থী যদি দু-দণ্ড একটু কথা ব'লে যান, ভালো হয়।

প্রার্থীকে 'মানুষ' করার দায়িত্ব মণ্টু ভঞ্জদের, তাঁকে সতর্ক করার, উৎসাহ দেওয়ার দায়িত্বও। নিজের প্রথম নির্বাচন প্রচারের কথা মনে পড়ছে। বৈশাখের তপ্ত দুপুর, দলীয় সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে পাড়ার প্রথম সাধারণ সভা একটু

আগে শেষ হয়েছে। মণ্টু ভঞ্জ টেনে নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়িতে। রোদ্দুরের প্রকোপ এড়াতে দরজা-জানালা বন্ধ, কী-একটা সংগোপন জিনিশ আমাকে দেখাতে মণ্টুবাবু বদ্ধপরিকর, আরে মশাই একটু পা ছড়িয়ে বসুন না, চা-টা শেষ ক'রেই দেখাচ্ছি আপনাকে। ঘরের কোণে একটি বহুব্যবহারজীর্ণ তোরঙ্গ, পকেট থেকে চাবি বের ক'রে মণ্টু ভঞ্জ তোরঙ্গের তালা খুললেন, উপরের আলগা ডালাটি তুলে এনে মেঝেতে রাখলেন, তারপর নিচের দিকে হাত বাড়ালেন ডুবুরি যেমন মণি-মুক্তার অন্বেষণে সমুদ্রের গভীরে হাত ডুবোয়। একটি লম্বাটে ধরনের রুল-টানা খাতা মণ্টুবাবু তোরঙ্গের অন্ধকার থেকে উঠিয়ে আনলেন। খুশিতে আনন উদ্ভাসিত, সেই সঙ্গে লজ্জা-মেশানো সামান্য গর্ববোধ। সুদূর ১৯৫২ সাল থেকে শুরু ক'রে প্রতিটি নির্বাচনে, পুরসভার নির্বাচন, বিধানসভার নির্বাচন, লোকসভার নির্বাচন, তাঁদের পাড়ায় কে কবে কত ভোট পেয়েছেন তা সযত্নে গ্রন্থিত। সেইসঙ্গে মণ্টুবাবুর যুগ্ম গণিত-জ্যোতিষ চর্চা। গতবারের তুলনায় এবার দলের ভোট এ-রাস্তায় কত বাড়বে, ঐ গলিতে কত কমবে, বাড়া-কমার সম্ভাব্য কারণগুলি তারকা-চিহ্নিত ক'রে পাদটীকায় লিপিবদ্ধ, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা অঙ্কের হিশেবে ভরিয়ে দিয়েছেন মণ্টুবাবু। এই পুঙ্খানুপুঙ্খ গাণিতিক বিশ্লেষণ অনুধ্যায়ের পর তাঁর সতৃপ্ত-সহর্ষ মন্তব্য : দেখলেন তো মশাই, এবার ওদের একেবারে ছেঁচে দিচ্ছি, আমরা কম ক'রে অন্তত অত হাজার ভোটে জিতছিই, নিন, আরেক পেয়ালা চা খান।

নির্বাচনঋতুর ঐ একমাস-দুমাস মণ্টু ভঞ্জরা সংসারের সঙ্গে ছিন্নসম্পর্ক, সারা বছর এঁরাই যে নিষ্ঠাশীল গৃহস্থ তা বিশ্বাস করা মুশকিল হয়ে পড়ে। জ্যাবদ্ধ ধনুর মতো টান্‌টান্‌, সুসংহত নির্বাচনী সংগঠন, কারো আলাদা সত্তা নেই, জ্যাবদ্ধ ধনুকের চেতনা সকলের সম্মিলিত চেতনা ; আশা, উদ্বেগ, প্রেরণা, প্রতিজ্ঞা, প্রার্থনা, সব-কিছু পরস্পরের সঙ্গে লেপ্টে-যাওয়া, এ-লড়াই বাঁচার লড়াই, এ-লড়াই জিততে হবে।

নির্বাচনপর্ব সমাপ্ত, ভোটগণনার দিন কালেক্টরেটে কিংবা গোপালনগরে আবেগের শেষ নিষ্কাশন। জয় অথবা পরাজয়। জয় ঘোষিত হ'লে আকাশ চৌচির-করা উল্লাস, ঝাণ্ডা উঁচু ক'রে তুলে ধরা, স্লোগানের মুখরতা, গোটা পৃথিবী পায়ের তলায় এমন অনুভব। দু-চারদিন পাড়ার চায়ের দোকানে আনন্দের বাঁধ-ভাঙা উচ্ছ্বাস, পাড়ায় একটি-দুটি বিজয়মিছিল অথবা কর্মীস্বেচ্ছাসেবক সবাইকে নিয়ে কারো বাড়ির ছাদে এক সন্ধ্যায় একটু ভালো খাওয়া-দাওয়া। আর নির্বাচনের ফল যদি অন্যরকম হয়, ঝাণ্ডা গুটিয়ে নিঃশব্দে পাড়ায় ফেরা, ঘর অন্ধকার ক'রে শুয়ে পড়া, দু-দিন বাদে মন খারাপের পালা শেষ, গার্হস্থ্যে প্রত্যাবর্তন, যতদিন না দলের কাছ থেকে ফের ডাক আসে।

নির্বাচনের ঋতু পুনরায় আগত, কিন্তু এবার মণ্টু ভঞ্জ নেই। চকিত মুহূর্তের জন্য বিষণ্ণতাবোধ, পরমুহূর্তে নিজেকে প্রবোধ দিই : মণ্টু ভঞ্জ নিজে নেই, কিন্তু

মণ্টু ভঞ্জরা তো আছেন, তাঁদের নিঃস্বার্থতা নিয়ে, তাঁদের উজাড়-করা উৎসাহ নিয়ে। হঠাৎই কথাটা মনে এল, শরীর পাত ক'রে সপ্তাহের পর সপ্তাহ খেটে গেছেন, বিনিময়ে কোনো দিন কোনো কিছু চাননি আমার কাছে মণ্টু ভঞ্জ। একবার শুধু মুখ ফুটে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, আমাকে তো কার্যব্যপদেশে গ্রামের দিকে যেতে হয়, হুগলি জেলার গ্রামাঞ্চলেও যেতে হয়, একদিন যদি ওঁকে একটু সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাই, ওঁদের আদি বাসস্থান পুড়শুরার কাছাকাছি এক গাঁয়ে, কলকাতার এত সন্নিকট, তবু কোনোদিন যাওয়া হয়নি, আমি যদি একটু নিয়ে যাই। এমনই স্মৃতিভ্রংশ, মণ্টু ভঞ্জের সেই অনুরোধ রক্ষা করতে পেরেছিলাম কিনা তা পর্যন্ত আর মনে আনতে পারি না।

বিজয় পাল বেঁচে গেলেন

আকাশবাণী-দূরদর্শনে বিচ্যুতি ঘটবার কথা নয়, সন্ধ্যাকালীন যথাযথ সংবাদ সম্প্রচার, প্রধান-প্রধান ঘটনাবলির উল্লেখ দিয়ে শুরু, অবশ্যই তাতে খবরটি উহ্য, একেবারে শেষের দিকে, আবহাওয়ার প্রসঙ্গে আসার ঠিক আগে, উল্লেখ : প্রাক্তন স্বাধীনতা-সংগ্রামী আসানসোলের একদা-বিধায়ক বিজয় পাল মশাই গত হয়েছেন। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলা সম্ভব হলো, বিজয়বাবুর মান বাঁচিয়েছে আকাশবাণী-দূরদর্শন, দায়সারা ঘোষণা, যেমন আশা করা গিয়েছিল, তাঁকে নিয়ে কোনোরকম আদিখ্যেতা হয়নি। পরের দিন খবরকাগজের পাতাতেও তাই : কোনো-কোনো পত্রিকায় তৃতীয়, চতুর্থ কি পঞ্চম পৃষ্ঠার সর্বশেষ স্তম্ভে, একেবারে নিচের দিকে, দু-তিন লাইনে সুসংক্ষিপ্ত উল্লেখ। বাকি কাগজগুলিতে আদৌ কোনো উল্লেখই নেই। আকছার প্রাক্তন বিধায়ক গত হচ্ছেন, যুদ্ধের খবরের জন্য জায়গা করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে, মফস্বলের কোনো অর্ধখ্যাত রাজনৈতিক কর্মীর দেহান্তর ঘটেছে, তার জন্য স্থান সংকুলান সম্ভব নয়।

কমরেড বিজয় পাল তাই হেনস্তার হাত থেকে বেঁচেছেন। অন্তরালের মানুষ, মৃত্যুর মুহূর্তেও অন্তরালেই থেকে গেলেন। মামুলি কিছু স্তুতি উচ্চারণের শিকার হ'তে হলো না তাঁকে, নটে গাছটি নিজে থেকেই মুড়োলো। অথচ, এখানেই মজা, খবরের কাগজে নিত্য যাঁদের নাম বেরোয়, তাঁরা কিন্তু ইতিহাস গড়েন না, গড়েন বিজয় পালের মতো অন্তরালবর্তী ব্যক্তিরাই। তাঁরাই ইতিহাস গড়েন, তবে ইতিহাসের পৃষ্ঠাতে তাঁদের নামের আঁচড় পড়বে না। তেমন-তেমন প্রয়োজন দেখা দিলে, চক্ষুলজ্জানিবারণের খাতিরে, বড়ো জোর অতিহ্রস্ব কোনো পাদটীকায় ঈষৎ উল্লেখ। তার বাইরে বিজয় পালরা অনুচ্চারিত থাকবেন, তাঁরাই আসলে ইতিহাসের আদল তৈরি ক'রে দিচ্ছেন যদিও, যাকে ইংরেজি থেকে বাংলা ক'রে 'তৃণমূল' বলা হয়, সেখানে সমাজকে নতুন ক'রে সঞ্জীবিত করছেন, আমাদের চার-পাশের পৃথিবী পাল্টে যাবার সুযোগ পাচ্ছে কারণ বিজয় পালরা, গ্রামেগঞ্জে, মহকুমায়, দোকানে, পাটে, কলে-কারখানায়, শ্রমিকঘাঁটিতে, তাঁদের নিষ্ঠা দিয়ে, অধ্যবসায় দিয়ে, ত্যাগ দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে সমাজটাকে আগাপাশতলা পাল্টে দেওয়ার প্রয়াসে লেগে আছেন ব'লেই।

বৈচিত্র্যে ঠাসা জীবন, তা-ও, অনেকে হয়তো একটু তাচ্ছিল্যভরে মন্তব্য করবেন, এমন তো তখন হ'য়েই থাকত। হাওড়ার শিবপুর অঞ্চলে জন্ম, সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে। আরো হাজার-হাজার বাঙালি যুবকের মতো, স্বদেশপ্রেমের আগুনে

পরিস্নাত হওয়া, রাওলাট আইনে একবার-দুবার আটক। জেল থেকে বেরিয়ে বোমা-পিস্তলের রোমাঞ্চ। অস্ত্র আইনের কবলে প'ড়ে বাংলা থেকে বহিষ্কৃত, বিজয় পাল প্রথমে কাশী, পরে কানপুর, তারও পরে, নাকি মধ্যবর্তী খানিকটা সময়, জয়পুরেও। ধীরে-ধীরে বিপ্লববাদ থেকে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদে উত্তরণ, ক্রমশ চোস্ত হিন্দি-উর্দু রপ্ত করা, শ্রমিক আন্দোলনে হাতেখড়ি, কিংবা ঘুরিয়ে এটাও বলা চলে, শ্রমিক আন্দোলনকে হাতেখড়ি। পরিপার্শ্বের অভিজ্ঞতার সঙ্গে অধীত জ্ঞান মিলিয়ে নেওয়া, সমাজকে চেনা, শোষকদের থেকে শোষিতদের আলাদা ক'রে চিনতে শেখা। তিরিশের দশকের মাঝামাঝি বাংলা দেশে ফেরা, সেই সময় থেকে শুরু ক'রে, পঞ্চান্ন বছর জুড়ে রানীগঞ্জ-আসানসোলের খনিঅঞ্চলে প'ড়ে থাকা। দেহাতি, কেউ-কেউ আদিবাসী, দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত যে-সরল শ্রমজীবী মানুষগুলিকে ঠকিয়ে মুনাফা লুটছে বিদেশি-স্বদেশি কারখানার মালিক-খনির মালিক-অতি-লোভী ঠিকেদার দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, তাদের নিয়ে সংগঠন গ'ড়ে তোলা। জোট বাঁধো, মালিকের হুমকির বিরুদ্ধে এক সঙ্গে রুখে দাঁড়াও, তোমাদের সম্মিলিত শক্তির কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হবে অসাধু ঠিকেদাররা-উদ্ধত মালিকপক্ষ। ইতিহাসে উল্লেখ থাকবে না, কিন্তু এক আশ্চর্য রোমাঞ্চকর অধ্যায় : বিজয় পাল আঁকড়ে প'ড়ে রইলেন কয়লাকুঠি অঞ্চলে, ঋতুর পর ঋতু, পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধ'রে, লাঞ্ছনা-কারাবরণ-আত্মগোপন, সংগ্রাম, সাধনা। পাশাপাশি দুই লক্ষ্য : মার্কসবাদ অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে প্রজ্ঞার অনুসন্ধান, পাশাপাশি, সর্বস্তরের শ্রমিকদের শ্রেণীচেতনা বিকাশের আয়োজন-যজ্ঞ। ইতিমধ্যে শিল্পের চেহারা বদলাচ্ছে, শ্রমিকশ্রেণীরও মিশ্র চরিত্র, খনির শ্রমিক, রেলের শ্রমিক, ইস্পাত কারখানার শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার শ্রমিক, বিদ্যুৎ শিল্পের শ্রমিক, পরিবহন শ্রমিক, সেই সঙ্গে শহরের ধাঙর, মেথর, কামার, কুমোর, ছুতোর, ওস্তাগর, গ্রাম-শহরতলির মৃৎশিল্পী-তন্তুবায় প্রভৃতি। এঁদের আলাদা ক'রে সংগঠিত করা, তারপর মেলানো সুসংবদ্ধ-সম্মিলিত যৌথ আন্দোলনে, সেই আন্দোলনকে ফের মেলানো মধ্যবিত্ত মানুষের, কৃষিজীবী মানুষের, অন্যান্য বিভিন্ন কর্মজীবী মানুষের আন্দোলনের সঙ্গে। বিজয় পাল এই জাদু ঘটাতে পেরেছিলেন, কারণ নিজেকে নিংড়ে দিতে পেরেছিলেন। ভালো কমিউনিস্ট হ'তে গেলে সর্বাগ্রে বোধহয় ভালোমানুষ হ'তে হয়, যে-মানুষ একমাত্র অন্যের ভালো নিয়ে ভাবেন। যিনি নিখাদ কমিউনিস্ট, তিনি দিতে জানেন, নিতে অনাগ্রহী, বিজয় পাল যেমন ছিলেন। নিঃশব্দ, নিরহংকার, নিরলংকার মানুষ। সাহিত্য-কাব্য-দর্শন-লোকসংস্কৃতি ইত্যাদি নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা, আন্তর্জাতিক ইতিহাস ও রাজনীতি নিয়ে সুস্বচ্ছ নিজস্ব চিন্তাভাবনা, অথচ বাইরে থেকে বোঝবার উপায় নেই, জ্ঞান কিংবা বিদ্যা তো জাহির করবার জন্য নয়, নিজেকে শুদ্ধতর, সংস্কৃততর ক'রে তোলার জন্য, যাতে খেটে-খাওয়া বঞ্চিত মানুষদের আন্দোলন শুদ্ধতর, সংস্কৃততর হ'তে পারে।

ভালো কমিউনিস্ট হ'তে গেলে নিপাট ভালোমানুষ হ'তে হয় : বিজয় পালের ভালোত্ব নিজেকে জাহির করত না, তবু তা উপ্‌চে পড়ত। স্নেহের বন্ধনে অপরকে জড়ানো, কী ক'রে অন্যের একটু বাড়তি সুবিধা ক'রে দেওয়া যায় অপর কারো অসুবিধা না-ঘটিয়ে তা নিয়ে অহোরাত্র চিন্তা, সেই চিন্তানুযায়ী ক্রিয়া। এবং সেই সঙ্গে স্বভাববিনয়। বোঝবার উপায় ছিল না কয়লাখনি অঞ্চলের কুলিকামিনরা এই মানুষটিকে দেবতার সম্মান দিয়ে থাকে। অতি পরিশ্রমে, অযত্নে ভগ্নস্বাস্থ্য, শরীর পঙ্গু, একই সঙ্গে নানা ব্যাধির আক্রমণ, সামান্য হাঁটতে গেলেও অন্যের সাহায্য না নিয়ে উপায় নেই, কিন্তু বিজয় পালদের বিশ্রামবিহীন দিনলিপি, পার্টির ক্লাস নিচ্ছেন, কোনো কারখানায় ধর্মঘট, কর্মীদের ইতিকর্তব্য নিয়ে উপদেশ দিচ্ছেন, কোনো সদ্যপ্রয়াত কমরেডের স্মৃতিসভায় যাচ্ছেন, তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের ভবিষ্যৎ-নির্বাহের উপায় খুঁজে বার করছেন, রানীগঞ্জের কোন্ প্রান্তে কী প্রচণ্ড ধ্বস নেমেছে, কোনো অসাধু ব্যবসায়ীর লুকিয়ে কয়লা উত্তোলনের জন্য, তার প্রতিবিধানে দিল্লি-কলকাতা ছুটছেন, আদিবাসী সাহিত্য-সংস্কৃতির রসে খানিকক্ষণের জন্য নিমজ্জিত হচ্ছেন, পরমুহূর্তে স্থানীয় কলেজের বিশেষ-কোনো সমস্যার জট খুলতে, অথবা রবীন্দ্রভবনের ব্যবস্থাপনা আরো একটু শিজিলমিছিল করতে, এখানে কিংবা ওখানে ছুটছেন।

বাষট্টি সালে চীনের সঙ্গে সংঘাত, দেশ জুড়ে জেলে-পোরো, জেলে-পোরো, দেশদ্রোহীদের জেলে-পোরো আন্দোলন, বিজয় পালরা ফের রাজবন্দী। ষাটের দশকের শেষে ইতিহাসের গতি ক্ষিপ্রতর, সত্তর দশকে ফের ত্রাসের, আতঙ্কের, হামলার আস্ফালন, জরুরি অবস্থার টালমাটাল, বিজয় পালরা, স্থিতপ্রাজ্ঞ, সব ক'টি অবস্থা অতিক্রম ক'রে এসেছেন। যাঁদের চেয়ে বড়ো দেশপ্রেমিক হওয়া আদৌ সম্ভব নয়, তাঁদের বারবার দেশদ্রোহী বানানো হয়েছে, বেতারে সরকারি ঘোষণায়, খবরের কাগজের ফতোয়ায়। ইতিহাসের প্রকৃতিবিন্যাস তাতে অবশ্য প্রতিহত হয়নি, বিজয় পালরা ইতিহাস রচনা ক'রেই গিয়েছেন, সর্বস্ব-খোয়ানো চালচুলোহীন স্বাস্থ্যবর্জিত বুভুক্ষু নিরক্ষর কাতারে-কাতারে মানুষজন, যারা পরিত্রাণের জন্য আঁকুপাঁকু করছে, তাদের প্রতিরোধের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছেন। একটু-একটু ক'রে সংগঠন-আন্দোলন শক্তিশালী হয়েছে, একটু-একটু ক'রে পার্টি বিরাট মহীরুহে পরিণত।

আজেবাজে খবরে ঠাসা দৈনিক পত্রিকা, বিজয় পাল গত হলেন, বুকে হঠাৎ একটি মস্ত শেল এসে বিঁধল, বাইরের পৃথিবীর কিছু যায় আসে না তাতে, কারোরই কর্মক্রমে ছেদ পড়ল না, ইরাকি যুদ্ধ আরো ভয়ংকর মোড় নিল, অস্ট্রেলিয়ার টেনিসে ইভান লেণ্ডল বরিস বেকারকে কিংবা বেকার লেণ্ডলকে হারিয়ে দিল, বিজয় পাল, তাঁর আদর্শ-নীতিবোধ-সংস্কৃতি-রুচির সঙ্গে সম্পূর্ণ সংগতি রেখে, নীরবে চ'লে

গেলেন। অসমাপ্ত সমাজবিপ্লবের জন্য সম্ভবত কিছু খেদ নিয়ে গেলেন সঙ্গে ক'রে, কিন্তু বিশ্বাসের উত্তাপটুকু রেখে গেলেন কমরেডদের জন্য।

আকাশবাণী-দূরদর্শন তাঁর মান রেখেছে। হেঁজিপেঁজি কতই তো প্রাক্তন বিধায়ক মারা যাচ্ছে, তাদের নিয়ে আদিখ্যেতা শোভা পায় না, বিজয় পাল তাই বেঁচে গেলেন, তাঁর মৃত্যু নিয়েও কোনো হৈচৈ হলো না।

'মাখন, একটা পান'

অতীত দিনের স্মৃতি, কেউ ভোলে না কেউ ভোলে। নজরুল কোনো প্রশ্নবোধক চিহ্ন জুড়ে দেননি গানটি লেখবার সময়, অথচ দ্বিধাগ্রস্ততা থেকেই যায়।

দেশ জুড়ে নির্বাচনের হুজ্জোতি, ক'জনেরই বা চোখে পড়েছে জোড়া শোক-সংবাদ। আজ থেকে পঞ্চান্ন বছর আগে, কলকাতার মাঠে জাঁদরেল দুই ফুলব্যাক, মহামেডান স্পোর্টিং-এর জুম্মা খাঁ, আর ইস্টবেঙ্গলের রাখাল মজুমদার, কয়েক দিন আগে-পরে মারা গিয়েছেন। ক'জন আর এখন মনে রেখেছেন, স্বাধীনতাপূর্ব ভারতবর্ষে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শহরে, তিরিশের দশকের অপরাহ্ণসময়ে ফুটবল নিয়ে উত্তেজনা-রোমাঞ্চ। কোনো গোরাদের দলও যা পারেনি, মহামেডান স্পোর্টিং সেই আপাতঅসাধ্য সাধন করেছিল, পর-পর পাঁচবার, ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত, লীগ জিতেছিল। লীগজয়ী মহামেডান দলে তিন পাঠান—গোলে ওসমান জান, ব্যাকে জুম্মা খাঁ, হাফে বাচ্চি খাঁ; মজবুত শক্তপোক্ত চেহারা, যা দেখেই বাঙালি দর্শকদের আলাদা সম্ভ্রম। তা ছাড়া, দিশি দলগুলির মধ্যে মহামেডান স্পোর্টিং-ই সর্বপ্রথম খেলোয়াড়দের সবাইকে স-বুট মাঠে নামানোর চর্চা শুরু করেন, যে-কারণেও জুম্মা খাঁদের সম্পর্কে খেলাপাগল কলকাতার বাড়তি আগ্রহ। ধস্তাধস্তি ক'রে খেলতেন জুম্মা খাঁ, গায়ের জোর খাটিয়ে, ওঁর একটি স্বগত উক্তি, অন্তত লোকপ্রবাদ-অনুযায়ী স্বগত উক্তি, মুখে-মুখে আলোচিত-সমালোচিত হতো: বোল যায়েগা তো আদমি কিধার যায়েগা; বল যদি আমার আয়ত্তের বাইরে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে থাকে চিন্তার ব্যাপার কী আছে, প্রতিপক্ষের ফরোয়ার্ডটির পা বুট দিয়ে চেপে ধ'রে রাখতে তো বাধা নেই, কিংবা তাকে ধাক্কা মেরে ধরাশায়ী করতে, সুতরাং কোন্ মোল্লা আছে যে আমাদের বিরুদ্ধে গোল ঠুকে দেবে? বাচ্চি খাঁ-জুম্মা খাঁকে পেরিয়ে গোলসীমানায় ওসমান জান পর্যন্ত তেমন-তেমন বল পৌঁছুতে সত্যিই পারত না সেই পাঁচ বছর, আর বল যদিও বা পৌঁছুতই, কোই হরজ নেই, আদমি কিধার যায়েগা, মহমেডান স্পোর্টিংকে গোল ঠুকে দেওয়া অত সোজা না। উপমহাদেশের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যাতায়াতও সহজ ছিল না তখন, কিন্তু পেশোয়ারের মেওয়াওয়ালার সন্তান জুম্মা খাঁ কলকাতায় ধাতস্থ হ'য়ে গেলেন, বোল যায়েগা তো আদমি কিধার যায়েগা।

এরই মধ্যে কী ক'রে যেন রেওয়াজ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, মহামেডানরা ইস্ট-বেঙ্গলের কাছে প্রতিবছরই লীগে অন্তত একবার হারবেই, হয় মুর্গেশ নয় লক্ষ্মীনারায়ণ সুযোগ বুঝে ওসমানকে ধোঁকা দিয়ে একটা গোল ঠুকে দেবেনই, জুম্মা খাঁর

সমস্ত সতর্কতা এড়িয়ে। এটাও রেওয়াজ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল, গোল করার মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই জুম্মা খাঁর চোরাগোপ্তা আক্রমণে ঘায়েল হ'য়ে লক্ষীনারায়ণ-মুর্গেশকে হাসপাতালে যেতে হতো। রক্ষণভাগে তাঁর প্রহরা ব্যর্থ, জুম্মা খাঁ এটা ঠিক মেনে নিতে পারতেন না, সুতরাং মুর্গেশ-লক্ষীনারায়ণরা গোল দিয়েই হাস-পাতাল-মুখো।

ইস্ট বেঙ্গলের ফরওয়ার্ড লাইনে মুর্গেশ-লক্ষীনারায়ণরা, ফুলব্যাকে, প্রথাগত জায়গায়, বছরের পর বছর ধ'রে, রাখাল মজুমদার। মহামেডান স্পোর্টিংয়ে জুম্মা খাঁ যেখানে খেলছেন, ইস্ট বেঙ্গলে তিনিও সেই অবস্থানে, অথচ আকারে-প্রকৃতিতে প্রচণ্ড বৈপরীত্য। রাখাল মজুমদার বেঁটে, ছোটোখাটো আমুদে মানুষ। অতি ক্ষিপ্রগতিতে বল ধ'রে অন্য প্রান্তে পাঠিয়ে দিতে পারতেন, তাঁর ক্ষিপ্রতার অন্যতম কারণ দৌড়ঝাঁপে তাঁর পটুত্ব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন্ বছর যেন খোদ স্পোর্টস চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। ময়মনসিংহের ছেলে রাখাল মজুমদার, পোশাকি নাম সত্যব্রত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, ক্লাস কাটিয়ে সপ্তাহে কয়েকটা দিন তাঁকে কলকাতায় খেলতে যেতেই হতো: মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকা থেকে ট্রেনে চেপে নারাণগঞ্জ, নারাণগঞ্জ থেকে স্টীমারে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ ক'রে গোয়ালন্দ, গোয়ালন্দ থেকে রাতের রেলগাড়ি, বুধবার ভোরে শেয়ালদা। বুধ থেকে শনি এই চারদিনে লীগের অন্তত দুটো ম্যাচ খেলে রাখাল মজুমদারের রবিবারে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন, মঙ্গলবার ফের ট্রেন-ধরা। এই ছক-কাটা জীবনধারা অবশ্য বদলে যায় বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে পাশ ক'রে বেরিয়ে কলকাতায় তাঁর কাজ জুটে যাওয়ার পর। তবে ক্রিকেটের মরশুমে রাখাল মজুমদার উল্টোমুখো হতেন। কলকাতার ক্লাব ক্রিকেটে তাঁর ঠাঁই হতো না, তিনি খেলতে যেতেন ময়মনসিংহের পণ্ডিতপাড়া ক্লাবে নয়তো ঢাকায় ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং দলে। কিংবদন্তী খেলোয়াড়, মফস্বলের যুবক সম্প্রদায় সীমাহীন বিস্ময় নিয়ে রাখাল মজুমদারের হাঁটা-চলা-ফেরা-ক্রিজে দাঁড়াবার কায়দা-বল ছোঁড়ার ভঙ্গি নিরীক্ষণ করত, সেই নিরীক্ষণের প্রসাদেই তাদের দিনযাপনে হঠাৎ এক উচ্ছলতার ছোঁয়া লাগত।

বলা হবে, অতীত দিনের স্মৃতি, নিছক ব্যক্তিগত স্মৃতি, যাঁরা ভোলেন না তাঁদেরও ভুলে যাওয়াই উচিত, এই অতীতবিহারের তো কোনো সামাজিক সার্থকতা নেই। আজ থেকে পঞ্চান্ন-ষাট বছর আগে কলকাতার মাঠে কারা দাপিয়ে বেড়াতেন, বাংলাদেশের স্তিমিত মফস্বলে দ্বিপ্রহর বা অপরাহ্ণকে কারা সেই যুগে তাঁদের ক্রীড়ানৈপুণ্য দিয়ে শিহরিত করতেন, তা জেনে কী লাভ? জুম্মা খাঁ-রাখাল মজুমদার, এঁরা খুব কাছাকাছি সময়ে প্রয়াত হলেন, এই কাকতালীয়েরই বা কী ঐতিহাসিক তাৎপর্য?

কাটা-কাটা, কড়া-কড়া প্রশ্ন, পালাবার পথ নেই আমার। তবে তার আগে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের সওয়াল জবাব। স্মৃতি রোমন্থনের অন্তত এটুকু সার্থকতা:

নিজেদের মনে করিয়ে দেওয়া, খেলা তখন খেলাতেই সীমাবদ্ধ ছিল, অর্থকরী পেশায় দাঁড়িয়ে যায়নি, সমাজবিরোধীদের বোমা-গুলি-আস্ফালনের উপলক্ষ হ'য়ে দাঁড়ায়নি। খেলোয়াড়রা দলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতেন, আনুগত্যে কখনো চিড় ধরত না, ক্লাব থেকে ঈষৎ পরোক্ষ সাহায্য পেলেই তাঁরা নিজেদের কৃতার্থ বিবেচনা করতেন। পরাধীন দেশের সাধারণ মানুষকে যে-পরিমাণ আনন্দ তাঁরা বিতরণ করেছিলেন তাঁদের নৈপুণ্য প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে, টাকার নিক্তিতে তার বিচার সম্ভব নয়। হালের বৈশ্য পৃথিবীকে সেই অলৌকিক যুগের খানিকটা গালগল্প শোনানোর মধ্যে, কে জানে, সামাজিক কর্তব্যের হয়তো ঈষৎ দায়ভার।

স্মৃতিরা পরম্পরাসূত্রে আবদ্ধ, বিশেষ-কোনো স্মৃতি অন্য আরেক ঝাঁক স্মৃতিকে সভাকক্ষে এনে হাজির করে। ভদ্রলোকের নামটি এখন ভুলে গেছি, সুবিনয় রায়চৌধুরী কিংবা অন্য-কিছু, হবিগঞ্জে বাড়ি, ফুটবলপাগল, মোহনবাগানের স্বীকৃত খেলোয়াড়, যতদূর মনে পড়ে রাইট-আউটে খেলতেন। ওঁকে রাজশক্তি বিনা-বিচারে বন্দী ক'রে রেখেছে ছ-মাসের উপর সময়, হঠাৎ ভোর ছ'টায় দমদম জেল থেকে ছাড়া পেলেন, এমনই দুর্দমনীয় শখ, সেদিনই লাল-সবুজ জামা গায়ে চড়িয়ে লীগের খেলায় মোহনবাগানের হয়ে নেমে পড়লেন। অপর-একজনের কথা মনে হয়, মোহিনী বাঁড়ুজ্যে, কলকাতার প্রথম ডিভিশন লীগ খেলেছেন মোহনবাগান-কালীঘাটের হয়ে, পরিশ্রমী তন্নিষ্ঠ বিবেকবান খেলোয়াড়। ঢাকা শহরে আমাদের ক্লাব স্থানীয় লীগের দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলছে, যে ক'রেই হোক প্রথম ডিভিশনে উত্তীর্ণ হ'তে হবে, তার জন্য একজন-দু'জন ভালো খেলোয়াড় প্রয়োজন। মোহিনী বাঁড়ুজ্যেকে নিয়ে যাওয়া হলো কলকাতা থেকে, উনি প্রতিটি ম্যাচ খেলে আমাদের দলকে জিতিয়ে দিলেন, দলের অভীষ্ট সিদ্ধ। একটি বিশেষ দিনের খেলার কথা মনে পড়ছে, কর্নার কিক, মোহিনী বাঁড়ুজ্যে ডান পায়ে শট মারলেন, হয়তো হাওয়ার কোনো গুণ ছিল, কর্নার থেকে তাগ করা সেই বল সোজা গোলপোস্টের মধ্যে গ'লে গিয়ে ভিতরের জালে আটকা পড়ল। মোহিনী বাঁড়ুজ্যে মশাই, কাগজে দেখছিলাম, এখন শিয়ালদার কাছাকাছি কোথাও থাকেন, তাঁর হয়তো আদৌ মনে পড়বে না সেই তেরচা-ক'রে মারা কর্নার কিকটির কথা, তেপ্পান্ন বছর আগে এক মফস্বলীয় কিশোরের কাছে যা বিশুদ্ধতম জাদু ব'লে ঠেকেছিল।

নিয়ম না মেনে স্মৃতির ঝাঁক। ঢাকায় যে-দলের হয়ে রাখাল মজুমদার ক্রিকেট খেলতেন, ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং, তার অতি সাধারণ তাঁবু, ক্লাবের সম্ভবত তেমন টাকাপয়সা নেই, তাঁবুর বাইরেটা চাকচিক্যবিহীন, তখনই মনে হতো জরাগ্রস্ত অবস্থা। ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিংয়ের প্রধান কর্মকর্তা সুরেশচন্দ্র দাম মশাই, শহরের উত্তর উপকণ্ঠ কুমিটোলার অধিবাসী, ওখানে অনেক জমির মালিক। ক্লাব-তথা খেলা-সর্বস্ব তাঁর জীবন, দলের সেক্রেটারিই শুধু নন, পদাধিকারবলেই হয়তো দলের বাঁধা ক্যাপ্টেনও। শীতের অলস দুপুরে যে-সম্মানিত সদস্য নিয়মিত খেলা

দেখতে আসতেন, একদা সংগীত জগতের প্রবাদপুরুষ, রায়বাহাদুর কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মুরাপাড়ার জমিদার, যে-মুরাপাড়া অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'তে কিছুটা অমরত্ব লাভ করেছে। কেশববাবুর অট্টালিকা শহরের ডালপট্টিতে। সুরেশ দাম-কেশব বাঁড়ুজ্যে ক্লাবঘরের বারান্দায় বেতের চেয়ারে পাশাপাশি বসতেন, খেলা দেখার ফাঁকে-ফোকরে দুই বন্ধুর পরস্পরকে হাল্কা চিমটি-কাটা, সুরেশবাবুর কেশববাবুকে সম্বোধন: যুবরাজ অফ ডালপট্টি, কেশববাবুর সুরেশবাবুকে প্রতি-সম্ভাষণ: প্রিন্স অফ কুমিটোলা। করদ রাজ্যের নবাব-রাজা-যুবরাজরা সেই সময়ে ক্রিকেট খেলায় তথা ক্রিকেট প্রশাসনে সারা দেশে প্রধান পুরুষ, তাঁদের আধিপত্যকে ব্যঙ্গ ক'রেই নিজেদের প্রতি এই তির্যক সম্ভাষণ, মফস্বলীয় ক্রিকেটের চেয়ে যা কম উপভোগ্য মনে হতো না।

তা হ'লেও, প্রধানত সচ্ছল-বিত্তবান ঘরের মানুষদের প্রাধান্য এ-সব ক্লাবে, একটু দূর থেকে, ঘোর মুগ্ধতার সঙ্গে, আমরা গণ্যমান্যদের বিশ্রম্ভালাপ সন্তর্পণে কান পেতে শুনতাম। অথচ, এই উচ্চবিত্ত হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্তদের দ্বারা পরিচালিত এই ক্লাবঘরে, এক আশ্চর্য অন্য ব্যক্তিত্ব: মৌলবী সাহেব। মৌলবী সাহেবের বয়স প্রৌঢ়ত্ব পেরিয়ে প্রায় বার্ধক্যের কাছাকাছি, পাতলা চেহারার স্বল্পদৈর্ঘ্যের মানুষ, পরনে শাদা লুঙ্গির উপরে ঈষৎ কাজ-করা কুর্তা, ঈষৎ একটু দাড়ি ছিল কিনা চিবুক জুড়ে তা এখন আর স্পষ্ট মনে আনতে পারি না। তাঁর আসল নামটি আমাদের কারোরই জানা ছিল না, একদা কোনো মক্তব বা মাদ্রাসায় সম্ভবত শিক্ষকতা করেছেন, হয়তো তখনো করছিলেন, থাকতেন সুরেশবাবুরই কাছাকাছি একটি জরাজীর্ণ বাড়িতে, স্পষ্টতই আর্থিক অপ্রাচুর্যের মধ্যে দিনযাপন। ক্লাবের পরিবেশের সঙ্গে তাঁর উপস্থিতি আপাতদৃষ্টিতে বেমানান, তবু, তিনি এসে পৌঁছোনোমাত্র, সবাই সম্ভ্রমে আসন ছেড়ে দাঁড়াতেন, ভালো ক'রে খেলা দেখবার পক্ষে উপযুক্ততম চেয়ারটি তাঁর জন্য নির্দিষ্ট, ক্রিকেটের সূক্ষ্মতর-সূক্ষ্মতম ব্যাকরণের সূত্রাদি তাঁর চেয়ে বেশি শহরে কারো নাকি জানা নেই, সুরেশবাবু-কেশববাবুরা তাঁর পাশে বসতে পেরে নিজেদের কৃতার্থ মনে করছেন, অতি সম্ভ্রমে তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন, নিজেদের মধ্যে যে-ঈষৎ আদিরসাত্মক আলাপন তা বন্ধ, ক্রিকেটের কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে সংশয় বা তর্ক হ'লেই মৌলবী সাহেবকে দিয়ে সালিশি করিয়ে নেওয়া। নিজে কস্মিনকালেও খেলতেন না মৌলবী সাহেব, তাঁর কোনো অর্থ-বা-বংশগরিমা ছিল না, অতি সাধারণ স্তর থেকে কী ক'রে ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবের তাঁবুঘরে পৌঁছে গিয়েছিলেন, অথচ যেহেতু তিনি জ্ঞানবান ব্যক্তি, তাঁকে ঘিরে শিষ্টতা, শ্রদ্ধা, বিনয়ের উপচার। মৌলবী সাহেবের ঐ বিশেষ পরিবেশের সঙ্গে ঠিক খাপ খাওয়ার কথা নয়, অথচ খাপ খেয়ে যেতেন। অতিশয় শাদামাটা মানুষ, চা-সিগারেটের কাছাকাছি দিয়েও যেতেন না, শুধু খানিক বাদে-বাদে তাঁর ক্ষীণ, স্বভাবকোমল গলায়, অর্ধ-উচ্চারিত অনুরোধ: 'মাখন, একটা পান'। মাখন

ক্লাবের সর্বক্ষণের বেয়ারা, শশব্যস্ত পায়ে পান তৈরি ক'রে এনে মৌলবী সাহেবের কাছে ধরত, মৌলবী সাহেব স্কোয়ার কাট বা লেগ গ্লান্স দেখতে-দেখতে পান মুখে পুরতেন, মাখন নিজেকে ভাগ্যবান মনে করত। ঘণ্টাখানেক বাদে হয়তো পুনরায় সম্ভাষণ : 'মাখন, আরেকটা পান'। মাখনের আরেকবার দৌড়ে ছুটে আসা।

মৌলবী সাহেবের বিশদ পরিচয় জানার জন্য সেই বালক বয়সে কোনো অনুসন্ধিৎসা ছিল না, এখন মাঝে-মাঝে নিজের হাত কামড়াই অজ্ঞতাজনিত অনুশোচনায় : কী রহস্যে আচ্ছন্ন ছিল মৌলবী সাহেবের জীবন, যা তাঁকে সাধারণের মধ্যেও অসাধারণ ক'রে তুলেছিল, এবং মফস্বল শহরের সঞ্চিত সম্ভ্রম তাঁর কাছে উপচার হয়ে আসত ?

অতীত দিনের স্মৃতি, কেউ ভোলে না কেউ ভোলে। যারা ভোলে তারা বেঁচে যায়।

‘এসেছিস, বোস’

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধেছে কি বাধেনি, জিনিশপত্রের দাম তখনো মোটামুটি ধরাছোঁয়ার মধ্যে, পঞ্চাশের মন্বন্তরের আরো বেশ কয়েক বছর বাকি। মন্থর মফস্বল, আমাদের কাছে কলকাতাও সুদূর, ট্রেনে-স্টীমারে-ফের ট্রেনে চেপে পৌঁছতে উনিশ-কুড়ি ঘণ্টা লেগে যায় প্রায়। প্রভুদের স্থাপিত সাম্রাজ্যে দ্বিতীয় নগরী কলকাতা, উজ্জ্বল মানুষজনের ভিড় যেখানে, মন্থর মফস্বলে নির্বাসিত বোকা-বোকা আমরা।

কলকাতার আধিপত্যের-আভিজাত্যের অন্যতম প্রধান প্রতীক প্রেসিডেন্সি কলেজ। প্রতি বছর তুখোড়-তুখোড় সব ছাত্র বেরুচ্ছে ওখান থেকে। তা হ'লেও, বলতে দ্বিধা নেই, ঐ বছরগুলিতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধেছে কি বাধেনি, প্রেসিডেন্সি কলেজকে আমরা অধিকতর সম্ভ্রম করতাম তার ফুটবল দলের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য। কলকাতায় লীগ-শীল্ড খেলার মরশুম সেপ্টেম্বরের প্রথমার্ধেই শেষ হয়ে যেত, তার-পর হয় অফিস নয় কলেজপাড়ার ফুটবল। বিভিন্ন ক্লাবের বাঘা-বাঘা খেলোয়াড়রা, কী কৌশলে জানি না, কলেজ দলে ঢুকে পড়তেন, কেউ এই কলেজে, কেউ অন্য আর-এক কলেজে। পড়াশুনোর ব্যাপারে প্রেসিডেন্সির বিখ্যাতি নিয়ে আমরা মাথা ঘামাতাম না, ঐ কলেজের ফুটবল দল ঘিরেই আমাদের উত্তেজনা-আলোচনা। সব নাম মনে পড়ে না, এখানে-ওখানে একটু-আধটু ভুলও হ'তে পারে, গোলে মোহনবাগানের রাম ভট্টাচার্য, দুই ফুল ব্যাক, যতদূর মনে পড়ে, কালীঘাটের ইন্দু কুণ্ডু আর ভবানীপুরের সিদ্ধার্থ রায় (হ্যাঁ, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ই), হাফে এরিয়ানের নাসিম-দাশু মিস্তির, সেই সঙ্গে সম্ভবত মোহনবাগানের নীলু মুখার্জি, রাইট আউট কিংবদন্তী-পুরুষ নির্মল চাটুজ্যে, ফরওয়ার্ড লাইনের অন্যান্যদের স্মৃতি ধূসর হয়ে গেছে, কিন্তু দলপতি ও লেফট আউট আব্বাস, লীগ চ্যাম্পিয়ন দল মহামেডান স্পোর্টিংয়ের যিনি দলপতি, তিনিই। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই ধ'রে নিচ্ছি প্রেসিডেন্সি কলেজ মারফত আইনের ক্লাসে নাম লিখিয়ে রেখেছিলেন, সুতরাং লীগ-শীল্ডয়ের ঋতু-অবসানের পর কলেজের হয়ে খেলতে বাধা কোথায়।

নাপোলি কি আইণ্ডহোভেন-গোছের বিদেশিদের খেলা নিয়ে মাথাব্যথা ছিল না আমাদের ; জানতামই না এ-সব নাম, জানবার কারণও ছিল না। প্রেসিডেন্সি কলেজের ফুটবল দলকে কেউ ছাড়িয়ে যেতে পারে গোটা পৃথিবীতে তা ছিল, আমাদের কাছে অন্তত, অভাবনীয়, অকল্পনীয়। অথচ একটা কাণ্ড ঘটল, আমরাই ঘটালাম, হাবা-গোবা মফস্বল শহরের আমরা। এবংবিধ কাণ্ড-সংঘটনের ব্যাপারে আমাদের শহর অবশ্য আদৌ ঐতিহ্যশূন্য নয়। বিলেত থেকে এক মস্ত ডাকাবুকো

দল, ইসলিংটন করিন্থিয়ানস্ না কী যেন নাম, দু-বছর আগে খেলতে এসেছিল ভারতবর্ষে, সারা দেশে জয়জয়কার, কিন্তু আমাদের শহরের এঁদো দলের কাছে কী ক'রে যেন এক গোলে হেরে গেল, গোল করেছিলেন ভূপেন সেন, যাঁরও ডাকনাম ছিল পাখি। পাখি সেন যখন গোলটা সেঁধিয়ে দিলেন, যে-জয়ধ্বনি উঠল তা বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারেও নাকি পাঁচ ক্রোশ পর্যন্ত শোনা গিয়েছিল।

দু-বছর বাদে ফের অঘটন। এবার প্রেসিডেন্সি কলেজকে নিয়ে। ঘটাল আমাদের শহরের সরকারি ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের দল। 'বন্ধুত্বপূর্ণ' কয়েকটি খেলা খেলতে এসেছিল আব্বাস-নির্মল চাটুজ্যে-দাশু মিত্তির-রাম ভট্টাচার্য-সিদ্ধার্থ রায়ে-ঠাসা প্রেসিডেন্সির ফুটবল টীম, অন্য সব-ক'টি খেলা জিতল কিংবা ড্র করল, কিন্তু, কেয়াবাৎ, ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের কাছে হেরে ঢোল।

রাম ভট্টাচার্যকে গোল ঠুকে দিয়ে আমাদের শহরের মর্যাদা যে বাড়িয়ে দিয়েছিল, যাকে কাঁধে ক'রে সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা নেচেছিলাম, তার নাম গোলাম হোসেন। সে আমাদের কয়েক ক্লাস উপরে পড়ত, কথা কম বলত, পড়া-শুনোয় মন ছিল না, কিন্তু ফুটবল পায়ে পড়লেই ভেল্কি দেখানোর পালা শুরু। স্কুলে আমাদের ভূগোল আর অঙ্ক পড়াতেন শামসুদ্দিন আহমদ, গোলাম হোসেন তাঁরই ভাগ্‌নে, তাঁর বাড়িতে থেকেই মানুষ।

শামসুদ্দিন স্যার নিজে অবশ্য একটু অন্য মত পোষণ করতেন: ওটা মানুষ হচ্ছে না, দিনকে দিন আরো বাঁদর হচ্ছে। স্যারের বিলাপ করার হয়তো বৈধ কারণ ছিল। ভাগ্‌নেকে যত্ন ক'রে ভাত-দুধ-কলা খাইয়ে বাড়ি থেকে রওনা করিয়ে দিলেন, ওর পরীক্ষা, সপ্তাহ ভ'রেই পরীক্ষা। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা গোলাম হোসেন ফেরে, স্যার জিজ্ঞেস করেন কেমন পরীক্ষা দিয়েছে, সে বলে 'ভালো'। 'আমার দুঃখটা বুঝে দ্যাখ্, পাঁচদিন বাদে জানতে পারি, হতভাগা পরীক্ষায় বসেইনি, দুধ-কলা খেয়ে রোজ খেলার মাঠে চ'লে যেত'।

গোলাম হোসেনকে আমরা মাথায় ক'রে নাচতাম, শামসুদ্দিন স্যার তাকে ডাস্টার দিয়ে পেটাতেন। আমাদেরও পেটাতেন, হাতের উল্টোদিকে আঙুলগুলির ওপর ডাস্টার ঠুকে। আমরা জ্ঞানান্বিত না হ'তে বদ্ধপরিকর, উনি ততটাই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ আমাদের বিদ্যার পরিধি বাড়াবেনই। সরকারি স্কুলের মাস্টারমশাইরা তখন অতিসামান্য মাইনে পেতেন, বাড়তি উপার্জনের কোনো সুযোগ ছিল না, সংসারের নানা সমস্যার জটিলতা, শামসুদ্দিন স্যারের পক্ষে গোলাম হোসেনকে মানুষ করা বাড়তি সমস্যা। কিন্তু, স্যারের পক্ষে, সব ছাড়িয়ে তাঁর ছাত্রদের বিদ্যা-বর্ধন, হিতসাধন। প্রতিটি ক্লাবের প্রতিটি ছাত্রের নাড়িনক্ষত্র তাঁর জানা, কে অঙ্কে একটু বেশি কাঁচা, ভূগোল বইয়ের অমুক পরিচ্ছেদের অমুক অংশটি কে আদৌ কিছু বোঝেনি, আদ্যোপান্ত তিনি অবগত। টিফিনের আধ ঘণ্টার অন্তরীপে, অথবা ছুটির অব্যবহিত পরে, তটস্থ থাকতে হয় আমাদের, কখন শামসুদ্দিন স্যারের নজরে

প'ড়ে যাই, তা হ'লে রক্ষা নেই, জ্যামিতির কোন্ হেঁয়ালির সমাধান আমাকে আরো কুশলতার সঙ্গে করতে হবে, লাইব্রেরি থেকে কোন্ বইটা ধার ক'রে আর্জেন্টিনার রপ্তানি সম্পর্কে আরো বিশদ বিবরণ আহরণ করতে হবে, হস্তাক্ষরের আরো উন্নতি ঘটাতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

রবিবার কিংবা ছুটির মাসেও আতঙ্ক থেকে অব্যাহতি নেই। পায়ে হেঁটে, কিংবা সাইকেলে বা ঘোড়ার গাড়িতে, শেষের দিকে সাইকেল রিকশায় চেপে, শামসুদ্দিন স্যার ছাত্রদের বাড়ি-বাড়ি যাবেনই, অভিভাবকদের সঙ্গে দেখা ক'রে প্রতিটি ছাত্রের দুর্বলতা-সবলতা নিয়ে আলোচনা করবেন, কার বোর্নভিটা খাওয়া দরকার, কাকে বানান ভুলের বহর কমাতে হবে, ভারতবর্ষের মানচিত্র আঁকতে গিয়ে কচ্ছপ্রদেশেব জায়গাটা কার একটু হেলে যাচ্ছে তা বুঝিয়ে বলবেন। অভিভাবকরা কৃতজ্ঞতায় গদগদ, আমাদের ডাক ছেড়ে কান্নার উপক্রম।

স্কুলের গণ্ডি শেষ, কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে উদ্ধত যৌবন, ব্যস্ততা, কে আর মনে রাখে স্কুলে-অঙ্ক-আর-ভূগোল-পড়ানো শিক্ষক মহোদয়কে। ক্রমশ দেশভাগ, ঢাকা শহর পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী, এই মস্ত পৃথিবীতে কোথায় ছিটকে গেলাম আমি নিজে।

১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাস। বাংলাদেশ সদ্যস্বাধীন হয়েছে. অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একটি দল নিয়ে ঢাকা গেছি, স্কুল পেরোবার পর তিরিশ বছরের ব্যবধান। শামসুদ্দিন স্যার, খোঁজ নিয়ে জানলাম, বয়স আশি পেরিয়ে গেছে, অমুক পাড়ায় ছেলের বাড়িতে আছেন।

ঠিকানা বের ক'রে সন্ধ্যার পর দেখা করতে যাওয়া। শরীর ঝুঁকে পড়েছে, চোখে ভালো দেখতে পান না, নিচু হ'য়ে প্রণাম জানাতে গেছি, হাতে ধ'রে সামনের চেয়ার দেখিয়ে বললেন: 'এসেছিস, বোস'। অভিব্যক্তি বা কণ্ঠস্বরে স্নেহ আছে, কিন্তু কোনো বিস্ময় নেই।

যেন মধ্যবর্তী তিরিশ বছরের ইতিহাস তুচ্ছাতিতুচ্ছ, যেন পৃথিবী ঠিক একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে কি হয়নি, দিনযাপন যেন নিরুদ্বিগ্নতায় আচ্ছন্ন, একমাত্র চিন্তা পরীক্ষায় তাঁর ছাত্রেরা অঙ্কে নব্বুইয়ের ঘরে নম্বর পাবে তো। যেন তিনি ধ'রেই নিয়েছিলেন যেহেতু ঢাকায় গেছি, আমার সর্বাগ্র ও স্বাভাবিকতম কর্তব্য তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে প্রণাম জানানো, গুরুশিষ্যের পরম্পরার ব্যাকরণে তো অন্য-কিছু নেই, থাকতে পারে না।

'এসেছিস, বোস'। হয়তো শামসুদ্দিন স্যারই ঠিক, মধ্যবর্তী তিরিশ বছরের ইতিহাস অপ্রাসঙ্গিক। অথচ এতটাই অভিভূত হয়ে গেলাম যে গোলাম হোসেন সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞেস করা হলো না, সেই গোলাম হোসেন, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে রাম ভট্টাচার্যকে যে গোল ঠুকে দিয়েছিল, প্রেসিডেন্সি কলেজ কুপোকাৎ। রাম ভট্টাচার্য মশাই, খোঁজ নিয়ে জেনেছি, দক্ষিণ কলকাতায় ডোভার টেরেসে থাকেন, কিন্তু গোলাম হোসেনের ঠিকানা আমার জানা নেই, এমনকি সে বেঁচে আছে কিনা, সুধীনবাবুর প্রতিধ্বনি ক'রে বলতে হচ্ছে, তা সুদ্ধ জানি না।

'জীবনমরণ দেখিসনি, তোর জীবনটাই ব্যর্থ'

বছর কয়েক আগে, হঠাৎই, কাগজে খবরটি চোখে পড়ল : বীণা চৌধুরী, রবীন্দ্র-সংগীত গাইতেন, সেই সঙ্গে আধুনিক গানও, প্রয়াত হয়েছেন। গতানুগতিক খবর, একান্ত আত্মীয়স্বজন ছাড়া অন্য-কারো নজরে পড়লে তিনি চোখ বোলাবেন মাত্র, হয়তো তা-ও না।

অথচ, ক'-জন আর মনে রেখেছেন, তিরিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে, সম্ভবত সেনোলা কোম্পানির ছাপ-মারা রেকর্ডের একপিঠে, বীণা চৌধুরীর গাওয়া একটি গান, কলকাতায়-মফস্বলে, রাস্তায়-ঘাটে, বাজারে-মাঠে, ভুল স্বরে, শুদ্ধ স্বরে, নির্ভুল কথাশুদ্ধ, অথবা এখানে-ওখানে একটা-দুটো শব্দ একটু অদলবদল ক'রে, গীত হতো সকাল-সন্ধ্যা-রাত্রি : 'পথিক আমি ফিরি একাকী দুয়ার খোলো আজি এ রাতে / তোমার চোখে নামিল ঘুম আমি যে কাঁদি বেদনাতে ॥ / দুয়ার যদি না খোলো প্রিয় সারাটি রাতি রহিব জাগি / বুকের বীণা ছন্দোহীনা বাজিবে শুধু তোমার লাগি ॥···তোমার দ্বারে মাধবীলতা পবন কহে প্রলাপকথা / তুমি কি মোরে রাখিবে দূরে হবে না দেখা তব সাথে / তোমার চোখে নামিল ঘুম আমি যে কাঁদি বেদনাতে'। প্রথাগত 'আধুনিক' গান, কে লিখেছিলেন আজ পর্যন্ত জানি না, সুরসংযোজন কার ছিল তা ভুলে গেছি। কিন্তু সেই বিশেষ সময়ের মধ্যবিত্তামদির বাঙালি সংস্কৃতির একটি আদল যেন গানটিতে পরিস্ফুট। এ ধরনের আবেগবাষ্প-ভারাতুর গান ঝুড়ি-ঝুড়ি তখন লেখা হচ্ছিল-সুরারোপিত হচ্ছিল-গাওয়া হচ্ছিল অখণ্ড বাংলাদেশে, অথচ বীণা চৌধুরীর উক্ত গানটি কেন বাঙালি মধ্যবিত্তসমাজকে, সেই গোধূলিতে বিলীন ১৯৩৭ কিংবা ১৯৩৮ সালে, দিশেহারা ক'রে তুলেছিল, তার প্রাঞ্জল কোনো ব্যাখ্যা তখনো ছিল না, এখনো নেই। 'তোমার দ্বারে মাধবীলতা পবন কহে প্রলাপকথা' : শুনে হেসে কুটিপাটি হবেন হালের তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতীরা। মাধবীলতা তো চুপচাপ শান্ত স্বভাবের পত্রপুষ্প সম্ভার, হাওয়ার এতই গুণ, তা সে যতই উত্তাল-দামাল হোক, সেই আর্ত নিশীথকালে, অতি ভব্য মাধবীলতাকে প্রলাপবাণী বিদ্ধ ক'রে ধরাশায়ী করবে, এই কল্পনা তাঁদের কাছে মস্ত বাড়াবাড়ি ঠেকবে। অথচ তাঁদের কী ক'রে বোঝাই আমার কাছাকাছি বয়সের যাঁরা, বিশেষ-এক ঋতুতে তাঁদের ভাবনা-আবেগ-অনুকম্পা জুড়ে ঐ একটি গানের অনুষঙ্গ মায়া বিস্তার ক'রে গিয়েছিল : ঈষৎ-একটু ভালো-লাগা, ঈষৎ-একটু মনখারাপ হওয়া, ঈষৎ-একটু এলোমেলো ভুলে-যাওয়ার-স্রোতে ভেসে যাওয়া। মফস্বলের রাস্তায় যে-উঠতি যুবক দু-হাত ছেড়ে সাইকেল চালাতে-চালাতে

অস্পষ্ট সন্ধ্যায় এই গান গুন্‌গুন্‌ করতে-করতে কুয়াশার অন্ধকারে মিলিয়ে যেত, মাত্র কয়েক বছর বাদে সে-ই হয়তো গণনাট্য সংঘের উৎসাহী কর্মী, 'জীবনধর্মী' নাটক-গানের চর্চায়-অধ্যবসায়ে নিজেকে সদানিযুক্ত করেছে, নতুন পরিভাষা শিখেছে, নতুন প্রজ্ঞা, যা দেশের-সমাজের-বাস্তব অবস্থা থেকে আহৃত, তার বিচারবুদ্ধির গহনে সমারূঢ় হয়েছে, অর্থাৎ কিনা, সোজা বাংলায়, সেই সাইকেল-বিশারদ সংগীতবিভোর যুবক 'পরিণত' হয়েছে, কোনো-কোনো জীবের খোলশ ছাড়ার মতো, 'পথিক আমি ফিরি একাকী' এমনকি স্বগত উচ্চারণে গাওয়াও ছেড়ে দিয়েছে, যেমন ছেড়ে দিয়েছে সুর-ভাঁজা রবীন মজুমদার, বোধহয় 'গরমিল' ছবিতে যে-গানটি গেয়েছিলেন, তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে : 'আমার অনেক দিনের আশা, আমি বলবো কানে-কানে / বলবো গানে-গানে / যেথা পথিক ভ্রমর সনে হয় ফুলের ভালোবাসা / বনের পাখির মতো আমি বাঁধবো সুখের বাসা' ইত্যাদি ইত্যাদি। বিবর্তন, উত্তরণ, আরোহণ, সংস্কৃত ভাষাসম্ভার ঘেঁটে আমরা নিজেদের বোঝাবার চেষ্টা করি, ক-ঋতুর আমি, খ-ঋতুর আমি—এমনকি ঙ—অথবা ক-ঋতুর আমিও—আসলে একই আমি, আমার চেতনা পরিপার্শ্ব থেকে কিছু গ্রহণ করছে, কিছু প্রত্যাখ্যান করছে, কিছু উপাদান তাকে বিস্মিত-মুগ্ধ করছে, আবার অন্য-কিছু উপাদান তার কাছে আদৌ সহনীয় ঠেকছে না। ঘাত-প্রত্যাঘাত, দ্বন্দ্ব-দোলা, সাহসে উদ্ধত-উচ্ছল হওয়া-সংগোপন কান্নায় ভেঙে-পড়া, সব-কিছু জড়িয়ে আমাদের বেড়ে ওঠার, বড়ো হয়ে ওঠার, পাকাপোক্ত হবার ইতিবৃত্ত। পাত্রাধার-তৈল-না তৈলাধার-পাত্র-প্রতিম একটি এঁড়ে তর্ক অবশ্য উত্থাপন করা যায়, 'পথিক আমি ফিরি একাকী' গানটি তার অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্য দিয়ে কতটা আমাদের আলোড়িত করেছিল, কতটাই বা নিজেদের আবেগ-কল্পনা-উচ্ছ্বাসের আধারে গানটি ঢেলে নিয়ে তাকে পরিচয়সার্থক করে তুলেছিলাম নিছকই আমরা, সাড়ে-পাঁচ দশক বাদে সেই রহস্যের মীমাংসা অসম্ভব। যা কবুল করা যায়—কবুল না করলে ইতিহাসের সঙ্গে আসলে ঘোর বিশ্বাসঘাতকতাই করা হবে—তা এই স্মৃতি-চারণ যে, সেই ১৯৩৮ সালে, যে-যুবক সদ্য-প্রকাশিত 'কবিতা' পত্রিকা মারফত সমর সেনের 'মহানগরীতে এলো বিবর্ণ দিন', তারপর আলকাতরার মতো রাত্রি'-গোছের পঙ্‌ক্তির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে, সে কিন্তু তারই পাশাপাশি 'তোমার চোখে নামিল ঘুম আমি যে কাঁদি বেদনাতে'র আতুরতায়ও সাড়া দিয়েছে, তারও কয়েক বছর আগে যেমন, রেকর্ড-নিঃসৃত পঙ্কজ মল্লিক মশাইয়ের গম্ভীর-ভরাট স্বরের অনু-গমন-প্রয়াসী, কুণ্ঠাহীন উৎসাহে গেয়েছে : 'ও কেন গেল চ'লে কথাটি নাহি ব'লে মলিন মুখে আঁখি ভরিয়া নীরে'। কে-ই বা এখন আর এই তথ্য মনে করিয়ে দেবে, পঙ্কজবাবুর গাওয়া এই গানটি, যা অলিতে-গলিতে অনুরণিত হতো তিরিশের দশকের প্রথমার্ধে, রচনা করেছিলেন সুজাতা ডেভিস-সুপ্রিয়া আচার্য-সুচিত্রা মিত্র-দের পিতৃদেব সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, যিনি, আরো হাজারোরকম সাহিত্য-

সৃষ্টি কর্মের সঙ্গে, কিশোরদের কাছে উপস্থিত করেছিলেন সেই ঐতিহাসিক চরিত্র, চালিয়াৎ চন্দর, ঝুড়ি-ঝুড়ি মিথ্যে-কথা-বলিয়ে অতি-ধুরন্ধর-হ'তে-চাওয়া ছেলেটির কাহিনী, চালিয়াৎ চন্দর একই সঙ্গে পৌরাণিক অথচ ঐতিহাসিক, বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বলতর অধ্যায়ের স্মৃতিকথা তার সঙ্গে মিশে আছে, এক বিশেষ বাঙালি সামাজিক প্রবণতার প্রতীক হিশেবেও সে ইতিমধ্যে পরিগণিত। ('চালিয়াৎ চন্দর' গল্পটি আমরা কাড়াকাড়ি ক'রে পড়েছি, বাংলা বুকনিতে চিরস্থায়ী জায়গা পেয়েছে চালিয়াৎ চন্দর কথাটি আচরণনির্ধারক বিশেষ্যরূপে, কিন্তু, স্মৃতি বিচিত্রগামিনী, এই মুহূর্তে আমার সবচেয়ে বেশি যা মনে পড়ছে, তা ঐ গল্প থেকে একটি বিশেষ জ্ঞানোপলব্ধির প্রমাণ : 'চালিয়াৎ চন্দর' থেকেই প্রথম জানতে পারি এক ধরনের লেখার উপকরণ আছে বা ছিল যাকে বলা হতো স্টাইলো, সে-রকম কলম আমি অন্তত যদিও চোখে দেখিনি।)

রবীন্দ্রনাথ শেয়ালকে ভাঙা বেড়া দেখিয়ে গেছেন, 'স্মৃতির দখিন দুয়ার খোলা, এসো হে এসো হে এসো হে'। সামাল দেওয়া মুশকিল, ঝাঁকে-ঝাঁকে স্মৃতিরা হাজির। স্কুলে নিচের ক্লাসের সহপাঠী ছেলেটির নাম এখনো মনে আনতে পারি, চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী, সিনেমাখোর, সে প্রতি শনি, রবিবার ছবি দেখত, নিউ থিয়েটার্সের প্রতিটি সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি থেকে শুরু ক'রে শ্রীমতী নাদিরার চরম উত্তেজক ছবিগুলি, 'নদীকিনারে' কিংবা 'হাণ্টারওয়ালি' পর্যন্ত। আমার ঠিক পাশে বসত চিত্ত, চলচ্চিত্রের অফুরান গল্প, নায়ক-নায়িকা, তারকা-উপতারকা-অপ-তারকাদের জড়িত সহস্র কিংবদন্তী, অথচ আমি সাত্ত্বিক বাড়ির ছেলে, কড়া নিয়মের মধ্যে থাকতে হয়, অতটুকু বয়সে সিনেমা নাকি দেখতে নেই। কোন্ সাল সেটা ঠিক ঠাহর হচ্ছে না, কুন্দনলাল সায়গল ও লীলা দেশাই-অভিনীত 'জীবনমরণ' ছবিটি দেখে গোটা বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত আবেগ উথাল-পাথাল, সপ্তাহের পর সপ্তাহ হাউসফুল, সিনেমা ঘরগুলির বাইরে পুলিশ-ডাকা-অপরিহার্য ভিড়, ঐ ছবিতে অজয় ভট্টাচার্য-রচিত সায়গল-কর্তৃক গীত 'পাখি আজ কোন্ কথা কয় শুনিস কি রে' জনতার সম্মিলিত সামগানে রূপান্তরিত ; কী আশ্চর্য, ঐ একই ছবিতে, সায়গল, দুর্দান্ত দাপটের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গানও গেয়েছেন, 'আমি তোমায় যত শুনিয়ে-ছিলেম গান / তার বদলে আমি চাই নি কোনো দান'। পৃথিবী অপেক্ষা করুক, মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজ বেকারসমস্যা-কৃষি-ঋণের বোঝার সমস্যা-জমিদারি-শোষণ-জনিত সমস্যা-স্বাধীনতা আন্দোলনের অনিশ্চয়তাকেন্দ্রিক সমস্যা, সমস্ত-কিছু পাশে সরিয়ে রেখে আপাতত যেন 'জীবনমরণ' ছবিতে ধ্যানস্থ, ক্লাসে প্রতিদিন আমার পাশে বসে চিত্ত, ইতিমধ্যে ছবিটি তার অন্তত আটবার দেখা হয়ে গিয়েছে, আমি একবারও দেখিনি শুনে তার বিস্ফারিত উচ্চ মন্তব্য : "সে কি রে, তুই 'জীবনমরণ' দেখিসনি ! তোর জীবনটাই ব্যর্থ"।

সেই ব্যর্থ জীবনটাকে টেনে-হিঁচড়ে কোনোক্রমে সক্রিয় রাখতে হয়েছে বছরের-পর বছর-ধ'রে, অপ্রাপ্তির গ্লানি, কী যেন আমার হাতের মুঠোয় আসার কথা ছিল-অথচ পেলাম না-গোছের অনুভূতি, অনেকটা ঐ 'ও কেন গেল চলে কথাটি নাহি ব'লে'র সমপর্যায়ের। পাশাপাশি অবশ্য, দ্রুত, অন্য নানা অভিজ্ঞতাও, গ্রন্থাগারের অঢেল বই থেকে পৃথিবীকে। জীবনকে-সমাজকে-সমাজের শ্রেণীবিভাজনকে ক্রমশ আবিষ্কারের বিস্ময়, সেই বিস্ময় থেকে আরো বেশি ক'রে জানবার আগ্রহ-আকৃতি, বইয়ের সঙ্গে, খবরের কাগজের সঙ্গে নিজের পরিবেশ-পরিপার্শ্বকে মিলিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ-উৎকণ্ঠা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, ১৯৪২ সাল, পঞ্চাশের মন্বন্তর, ক্ষিপ্রগতি দৃশ্য পরিবর্তন, এক ধাক্কায় আমাদের অনেকটাই বড়ো হয়ে যাওয়া।

যুদ্ধ শুরু হবার অব্যবহিত পরেই চিত্ত স্কুল থেকে ট্রান্সফার নিয়ে অন্য-কোনো শহরে চ'লে গেল, আর কখনো দেখা হয়নি তার সঙ্গে। এবং অবশেষে পুরো বত্রিশ বছর বাদে 'জীবনমরণ' দেখবার সুসৌভাগ্য হলো আমার, সায়গল, লীলা দেশাইয়ের অভিনয়কলা নিয়ে মন্তব্য এখন অবান্তর, তবে সেই একদা-আচ্ছন্ন-করা গানগুলি আর-একবার ফের শোনা গেল, তা ছাড়া, আজ থেকে পঞ্চান্ন-ষাট বছর আগে বাঙালি যুবক-যুবতীরা কী পোশাক-আশাকে অভ্যস্ত ছিলেন তার পর্যাপ্ত পরিচয় অন্তত বহন করছে 'জীবনমরণ' ছবিটি।

আমাদের প্রাপ্তি, আমাদের অপ্রাপ্তি, অভিজ্ঞতার উপাদান-উপকরণের সংমিশ্রণ আমাদের উপস্থিত মুহূর্তের চেতনা-প্রবণতা-মানসিক ঝোঁক। অপ্রাপ্তির ঝুলিতে এতদিন ছিল 'জীবনমরণ', প্রাপ্তির হিশেবে বীণা চৌধুরীর 'পথিক আমি ফিরি একাকী' গানের দ্যোতনা। বহুদিন ইচ্ছা ছিল, ঠিকানা খুঁজে বের ক'রে মহিলাকে একবার শ্রদ্ধানমস্কার জানিয়ে আসবো। আরো হাজার অপূর্ণ বাসনার মতো, এই ইচ্ছাটিও অপূর্ণ থেকে গেল। এখন শুধু অনুশোচনা।

‘সুন্দরই, তবে সুন্দরী বলা চলে না’

উত্তর ভারতে বলে, রুপেয়াকা গরম, জননী বঙ্গভাষায় আমরা বলি, টাকার দেমাক। সম্ভবত তা-ই, কিন্তু মূল ব্যাপারটি ঘটে পারিভাষিক সাম্রাজ্যবিস্তারের কেরামতির মধ্যবর্তিতায়। হঠাৎ-হঠাৎ মাথা গরম ক'রে যুদ্ধ বাধাতে ভালোবাসেন মার্কিনদেশের কর্তাব্যক্তিরা। যারাই তাঁদের কথা শুনবে না, ধ'রে-ধ'রে কোতল করা হবে। যেহেতু তাঁদের অনেক ধনৈশ্বর্য, ভাষার অর্থ-অনর্থও ঠিক ক'রে দেবেন তাঁরাই, তাঁরা যাকে ন্যায় বলবেন, তা-ই ন্যায়, তা-ই ধর্ম। তাঁরা যা-যা ক'রে থাকেন, কিংবা ভবিষ্যতে করবেন, সব-কিছুই নাকি সত্যের স্বার্থে, গণতন্ত্রের স্বার্থে। তাঁদের নির্দেশ মানতে যারা এতটুকু আপত্তি জানাবে, তারা শুধু তাঁদেরই শত্রু নয়, তারা স্বাধীনতার শত্রু, গণতন্ত্রের শত্রু ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রতীপ হাওয়া, যুক্তি বা চিন্তার দ্বারা অভিধানের ব্যাখ্যা আর নির্ণীত হয় না, বরঞ্চ অভিধানের অনুজ্ঞাই চিন্তাকে এখন প্রভাবিত করে। অভিধানগুলি যথাযথ সংশোধন ক'রে নিতে পারলেই কেল্লা ফতে, এবং যে যত টাকা ছড়াতে পারবে সে তত বেশি পরিভাষার উপর দখল-দারি স্থাপন অঢেল করতে পারবে। মার্কিন কর্তৃপক্ষ যা করছেন। তাঁদের ট্যাঁকে পয়সাকড়ি, তাঁরা তাই অভিধানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়ন্ত্রণ করছেন, স্বাধীনতা, শান্তি ইত্যাদি শব্দাবলি আসলে কী বোঝায় পড়শিদের বোঝাচ্ছেন। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত গোটা সোভিয়েত দেশ শয়তানদের সাম্রাজ্য ব'লে বর্ণিত হচ্ছিল মার্কিন শাসককুলের অভিধানে। সেই শয়তানেরা সহসা সুবোধ বালকে পরিণত, অভি-ধানের নতুন সংস্করণের দরকার পড়েছে তাই। মাত্র তিন-চার বছর আগেও লিবিয়ার রাষ্ট্রপতি মুয়াম্মার গদ্দাফির মতো পাজি-নচ্ছার গোটা ভূমণ্ডলে নাকি ছিল না, মার্কিন সেনা-নৌ-বিমানবাহিনী যৌথ অভিযান চালিয়ে ত্রিপোলির রাষ্ট্রপতি-আবাস আক্রমণ ক'রে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল পৃথিবীকে উক্ত নরাধমমুক্ত করার। গদ্দাফি নিজে কোনোক্রমে বেঁচে যান, তাঁর একটি শিশুকন্যা নিহত হয়। ইতিমধ্যে পরিভাষা পাল্টেছে, নরাধম মানে আর গদ্দাফি নয়, এখন থেকে, আগামী সংস্করণ পর্যন্ত, ঐ শব্দের সমার্থক সাদ্দাম হুসেন। আমরা সবাই শান্তির পক্ষে, শুধু ঐ সাদ্দাম লক্ষ্মীছাড়া শান্তি চায় না যুদ্ধ চায়, ওকে একটু উচিত শিক্ষা দিতে হবে। মার্কিন কর্তৃপক্ষ তাঁবেদার আরো সাতাশটি দেশের সরকারকে সঙ্গে নিয়ে তাই যুদ্ধে নেমে পড়েছেন, যুদ্ধ ছাড়া শান্তি অসম্ভব। গণতান্ত্রিক অভিধানে লিখেছে, যুদ্ধ মানে শান্তি, শান্তি মানে যুদ্ধ। উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের বিষণ্ণ সকালে হিরোশিমায় যে-প্রচণ্ড শক্তির বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল তার চেয়েও অনেক বেশি বিনাশের

ক্ষমতাসম্পন্ন বোমা ক্ষেপণাস্ত্র নাকি ইরাকের উপর নিক্ষেপ করা হয়েছে যুদ্ধের প্রথম দিনেই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নির্দেশ-অনুযায়ী নাকি মার্কিন শাসককুলের এই মহাউদ্যোগ। আইনজ্ঞদের মধ্যে কেউ-কেউ অবশ্য মাথা ঘামাচ্ছেন নিরাপত্তা পরিষদে যে-প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, সত্যি-সত্যি তার এমনধারা ব্যাখ্যা সম্ভব কিনা। এখানে অবশ্য কোন্ অভিধান, কার অভিধান ব্যবহার করা হচ্ছে সেই প্রশ্ন তাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। উল্টো পুরাণ দেখে ঘাবড়ালে চলবে না, কোন্‌টা সোজা দিক-কোন্‌টা উল্টো তা তো আমি-আপনি নির্ধারণ করবো না, করবে টাকওয়ালা মানুষের অভিধান। ধনবল ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করে, ভাবনাতে পছন্দমতো রঙ চড়ায়।

এবং তাতে চমৎকৃত হয়ে এমনকি মস্কো শহরেই বহু যুবক-যুবতীর মার্কিন সরকারের সমর্থনে স্বেচ্ছাসেবক সেজে ন্যায়যুদ্ধে যোগ দিতে উৎসুক ভিড়, স্বাধীনতার পক্ষে, শান্তির পক্ষে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'তে তাদের আর তর সইছে না। অন্যদিকে, খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হাজার-হাজার ছাত্র-ছাত্রী কিশোর-কিশোরী তরুণ-তরুণী, সেই সঙ্গে আরো হাজার-হাজার বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিক, একই যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার, প্রতিদিন প্রতিরোধের পরিখা গড়ছেন তাঁরা। ভিয়েতনামের অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতার স্মৃতি, তাঁরা ভোলেননি। তাঁদের কাছে শান্তি শান্তিই, যুদ্ধ শান্তি নয়, উলটপুরাণে তাঁদের আস্থা নেই, পৃথিবীতে শান্তি-স্থাপনের হেত্বার্থে গরিবদেশের মানুষদের হত্যা করা, সেই মানুষদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে নষ্ট ক'রে দেওয়া শান্তি নয়।

যুদ্ধ চলছে আকাশে-মাটিতে সমুদ্রের জলে, যুদ্ধ সেই সঙ্গে অভিধানে-অভিধানেও। শৈশব বড়োই স্বস্তির সময়, এ-ধরনের জটিলতা তখন অনুপস্থিত ছিল। আমার স্মৃতিতে প্রথম একটি আস্ত যুদ্ধ, স্পেনের গৃহযুদ্ধেরও একবছর-দু-বছর আগে, ইতালি সরকারের আবিসিনিয়া আক্রমণ। ইথিওপিয়া নামটি পরে এসেছে, আমাদের কাছে হাব্‌সিদের দেশ তখনো আবিসিনিয়া। সরল যুক্তির পাটীগণিত ছিল আমাদের : কালো চামড়ার দেশকে জোর ক'রে দখল করতে চাইছে এক শাদা চামড়ার দেশের সরকার, ইংরেজরা যেমন আমাদের একদা দখল ক'রে নিয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কেউ আমাদের আলাদা তালিম দেয়নি, ফ্যাসি-বাদের স্বরূপ নিয়েও কেউ আমাদের কাছে বক্তৃতা দেননি, দিলেও কিছুই বুঝতে পারতাম না। নিছক শিশুবুদ্ধিতেই অথচ আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাই, মুসোলিনির অত্যাচার রুখতে হবে, আবিসিনিয়ার জয় হোক। স্কুল শুরু হবার আগে, ক্লাসের দ্বারপ্রান্তে খানিকক্ষণের জন্য আমাদের যুদ্ধের পালা : যদি বলো, তুমি ইতালির পক্ষে, দূর হটো, তোমাকে ক্লাসে ঢুকতে দেওয়া হবে না, যদি হাত তুলে অভিবাদন ক'রে দু-বার আওয়াজ তোলো, 'আবিসিনিয়া', 'আবিসিনিয়া', তবেই ক্লাসে ঢোকার ছাড়পত্র মিলবে তোমার।

বলা বাহুল্য, এই খেলার মেয়াদ ক্লাস আরম্ভের ঘণ্টা বাজার মুহূর্ত পর্যন্ত, ঘণ্টা

পড়লে মুসোলিনিওলাদের মাস্টার মশাইদের সঙ্গে ঢুকে পড়ত। তবে আমাদের পক্ষে যা ছিল শ্লাঘনীয়, যতই দিন এগোয়, তাদের সংখ্যা ক্ষীয়মাণ-আমাদের বর্ধমান, স্কুলের অঙ্গনবর্তী যুদ্ধে হানাদার মুসোলিনিকে আমরা ক্রমশ হটিয়ে দিচ্ছি, অন্যত্র আসল যুদ্ধে যদিও অন্যরকম ঘটছিল। এক বিষণ্ণ ঋতুতে আসল যুদ্ধের চূড়ান্ত অবসান ঘটল, হাব্‌সিরা পর্যুদস্ত। শিশুবয়সে সুবিধাবাদ তেমন প্রশ্রয় পায় না, আমাদের মনের অভিধানে কিন্তু লিপিবদ্ধ হয়েই রইল, আবিসিনিয়া ন্যায়ের প্রতীক, মুসোলিনি অধর্মের।

সত্যই মিথ্যা, মিথ্যাই সত্য, যুদ্ধই শান্তি, শান্তিই যুদ্ধ, এ-সব কঠিন-কঠিন ন্যায়ালঙ্কারচর্চা পরিণত বয়স্কদের করতলগত অধিকার, জীবনযাত্রার অসারল্যের সঙ্গে যার নিবিড় সম্পর্ক। শৈশব যে আমাদের কাছে বরাবরই মায়াময়, তার প্রগাঢ় কারণ তখন আমরা চতুরালিহীন, যা অনুভূতি দিয়ে প্রতীত হয় তাকেই সত্য ব'লে মেনে নিতে আমরা অকুতোভয়। আস্তে-আস্তে বেঁচে থাকার আবর্তের মধ্যে অনুপ্রবেশ করি আমরা, ধূর্ত-জটিল পৃথিবীকে একটু-একটু ক'রে চিনতে শিখি, ধুরন্ধর হই, পরিপক্ব হই, সত্য-মিথ্যার বাস্তবভেদের যন্ত্রণাবোধ থেকে মুক্ত করি নিজেদের।

বলতে দ্বিধা নেই, আমার পক্ষে বোধোদয়ের শুরু জনৈক সম্মানিতা অধ্যাপক-পত্নীর একটি উক্তি থেকে। মহিলার এক অনূঢ়া কন্যা, তাঁর প্রতিবেশী এক অধ্যাপক দম্পতিরও কাছাকাছি-বয়সের অনূঢ়া কন্যা, তুলনাগত সৌন্দর্য নিয়ে পাড়ায় ঠারে-ঠোরে হয়তো আধা-হিংস্র প্রতিযোগিতা। বেড়াতে এসেছেন অধ্যাপকগৃহিণী, প্রতিবেশিনী কন্যাটি সম্পর্কে তাঁর রূপবর্ণনা পাশের ঘর থেকে শুনতেই হলো: 'সুন্দরই, তবে সুন্দরী বলা চলে না'। অর্থাৎ কিনা, মহিলার পরিভাষায়, সুন্দর কুৎসিতেরই সমার্থক, প্রতিবেশিনী কন্যাটি, অতএব, কুরূপা।

হঠাৎ বাংলা ভাষা সম্পর্কে এক নতুন অভিজ্ঞান, সেই সন্ধ্যা থেকে কর্কশ পৃথিবীকে ঈষৎ চিনতে শিখলাম। ভাষার প্রকোপে ভাবনা দুমড়ে-মুচড়ে যায়, গণতন্ত্ররক্ষার সুমহান্ উদ্দেশ্যে মার্কিন ফৌজ এগারো হাজার মাইল দূরবর্তী ভিয়েতনাম দেশে পৌঁছে নাপাম বোমা ফেলে, হাজার-হাজার শিশুকে বিকলাঙ্গ করে, বর্গক্ষেত্রের পর বর্গক্ষেত্র জুড়ে, মাইলের পর মাইল, শস্য বিষিয়ে দেয়। আর এই মুহূর্তে সাত-হাজার মাইল পেরিয়ে নির্বোধ আরবদের মাথায় গজাল মেরে শান্তি কাকে বলে তা বুঝিয়ে দেওয়ার প্রাণান্তকর অপপ্রয়াস।

উলটপুরাণ। সুন্দরই, তবে সুন্দরী বলা চলে না। সত্যি, কিন্তু আসলে মিথ্যে। পৃথিবীতে পরিভাষার শেষ নেই। অভিধানগুলি পুরোনো অর্থ মুছে ফেলে নতুন অর্থের নেশায় বিভোর। যতদিন না প্রকৃতির ভয়ংকর প্রতিশোধ কাজ শুরু করে।

নিরাশা, মীর আতা, বেচারাম

সতেরোশো না আঠারোশো শতাব্দীতে, কে জানে, কিছু আরমানি ব্যবসাদার হাজার-হাজার মাইল পেরিয়ে ঢাকা শহরে বসতি স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তাদের উত্তরাধিকারীদের আর চিহ্ন নেই, কিন্তু আদি সিদ্ধান্তের সাক্ষ্য বহন ক'রে আমাদের আরমানিটোলা পাড়া। আদৌ কোনো চিহ্ন নেই তা-ই বা বলি কী ক'রে, বড়ো খেলার মাঠের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ঘাড় উঁচু ক'রে তখনো তো আরমানি গির্জাটি দাঁড়িয়ে। ভিতরে উঁকি মেরে দেখার আগ্রহ কেন যেন কোনোদিন হয়নি। তবে প্রায়ই গির্জাটি পেরিয়ে যেতেই হতো, যেহেতু দশ গজ এগোলে আমাদের বাঁধা দর্জি কাসেম খলিফার দোকান। কাসেম খলিফা লম্বা মানুষ, বুক জুড়ে শাদা দাড়ির ঢল, চোখে পুরু কাচের চশমা, হাতে ফিতে, শার্টের কলার আঁটো হ'লে তার আশ্বাসবাণী : 'খোকাবাবু, এটাই ফ্যাচান্', কলার ঢিলে হ'লে ফের সেটাও নাকি ফ্যাচান্।

আমাদের বাড়ি অবশ্য ছিল পাড়ার অন্য প্রান্তে, বেচারাম দেউড়ির গা ঘেঁষে, যে-বেচারাম দেউড়ি পোয়া মাইল তক্ বাদে চকবাজারের শরীরে গিয়ে মিশেছে। মোড়ের বাড়ি আমাদের, একই সঙ্গে দুটো ঠিকানা, চৌষট্টি বেচারাম দেউড়ি, তদুপরি তেরো নম্বর মিরাতার গলি, গলিটা আমাদের বাড়ির গা ছুঁয়ে দেউড়িতে এসে পড়েছে। মিরাতার গলি, একদা কোথাও কোনো মীর আতা ছিলেন, সম্মানীয় মহল্লার সর্দার, হয়তো সৈয়দ বংশোদ্ভূত, ধ'রে নিচ্ছি তাঁরই স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কর্তৃপক্ষ একদা নামকরণ করেছিলেন, কিন্তু, বাঙালি উচ্চারণে ধৈর্য নেই, মীর আতার গলি, কালক্রমে মিরাতার গলিতে পর্যবসিত, কখনো-কখনো ইংরেজি তর্জমায় মিরাতাস লেইনে পর্যন্ত। তবে, চার বছর অন্তর-অন্তর মফস্বলীয় নাটক। চার বছরের ব্যবধানেই বোধহয় ঢাকা পুরসভার কমিশনার মশাইরা নির্বাচিত হতেন, নির্বাচন করতেন প্রবেশিকা পরীক্ষায় যাঁরা উত্তীর্ণ, আর যাঁরা পুরসভার খাতায় মালিক হিশেবে চিহ্নিত, তাঁরা মিলে। যে-বছর আমাদের পাড়ায় বীরেন বসু মশাই জিততেন, গলির দুই প্রান্তের প্রায়-ভেঙে-পড়া দেয়ালে টিনের চাকতির ওপর চুন দিয়ে জলজল ক'রে বিকল্প নাম উল্লেখ করা হতো : রজনী বসু লেইন। রজনী বসু বীরেন বসু মশাইর প্রয়াত পিতৃদেব, তাঁদের বিশাল অট্টালিকা গলিটির অন্যদিকের গোড়ায়। আমাদের বাড়ির যেমন দুটো ঠিকানা, লাগোয়া গলিটিরও তাই দুটো পরিচয়, সে মিরাতার গলি, সেই সঙ্গে রজনী বসু লেইন-ও। বাঙালি জিভের সমাসসন্ধিকরণের স্বভাবপটুতাহেতু মিরাতার গলি বলতে আমরা

অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য পেতাম, রজনী বসু লেইনের উচ্চারণ একটু কসরৎসাপেক্ষ। এই নামদ্বৈততার মধ্যে যে-সাম্প্রদায়িক চেতনার ইঙ্গিত ছিল, আমরা অবোধ শিশুরা তখন তার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে ; চৌষট্টি নম্বর বেচারাম দেউড়ি আর তেরো নম্বর মিরাতার গলি একই বাড়ির দুই ঠিকানা সামলাতেই আমরা হিমশিম, মিরাতার গলির বিকল্প নাম রজনী বসু লেইন অতএব গোদের উপর বিষের ফোঁড়া। অন্তত আমাদের কাছে। স্পষ্টতই, বীরেন বসু মশাইর কাছে নয়। তাই, যে-বছর তিনি নির্বাচনে জিততেন, প্রায়ই জিততেন, নামের ফলক থেকে মিরাতার গলি মিলিয়ে যেত, কয়েকটা বছর আমরা রজনী বসু লেইনে অধিষ্ঠান করতাম। অতি সরু, ছোটো গলি, দৈর্ঘ্যে হয়তো চারশো-পাঁচশো গজের বেশি হবে না, কাঁচা নর্দমা, একটা-দুটো গ্যাসের আলো সন্ধ্যার পর মলিন রহস্য ছড়ায় কিংবা তা-ও না, সব-মিলিয়ে সম্ভবত পঁচিশ-তিরিশটি বাড়ি, বিভিন্ন স্তরের হিন্দু মধ্যবিত্ত পঁচিশ-তিরিশটি পরিবারের ঘেঁষাঘেঁষি অধিষ্ঠান। গলির বড়ো অংশ জুড়ে রজনী বসুর পত্তন-করা সম্পত্তি, বীরেন বসু মশাই যুগপৎ বাড়িওলা ও পৌর কমিশনার। তাঁর অবশ্য রমরমা ওকালতি পেশাও ছিল, সেই সঙ্গে নাট্যচর্চার প্রচণ্ড শখ। সন্ধ্যাবেলা একটু রঙ্ চড়াতে ভালোবাসতেন, শহরের বিষয়আশয় থেকে প্রভূত উপার্জন, বিক্রমপুর পরগনাস্থ গ্রামের জমিজমা থেকেও। মধ্যবিত্ত ভাড়াটেদের এটা-ওটা উপকার করতে তাঁর আন্তরিক আগ্রহ স্বীকার না ক'রে উপায় ছিল না, তাঁর অভিভাবকত্বে রজনী বসু লেইনের বাসিন্দারা, কাঁচা নর্দমা-সায়ংকালের ঘুট-ঘুটে অন্ধকার-মশার দৌরাত্ম্য সত্ত্বেও, দুই মহাযুদ্ধের ঐ মধ্যবর্তী সময়ে, মোটামুটি একটি অবৈকল্যে স্থিত ছিলেন।

চারশো-পাঁচশো গজের অস্তিত্ব, সর্পিল, অন্তত পনেরো-কুড়িটা হঠাৎ-বাঁক, ঘণ্টা-না-বাজিয়ে সাইকেল চালালে প্রতি মুহূর্তে হেঁটে-চলা-কারো ঘাড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ার আশঙ্কা, ঘোড়ার গাড়িও ঢুকত অতি কষ্টেসৃষ্টে, মোটরগাড়ির তো প্রশ্নই ছিল না। সারা শহর জুড়ে একুনে বোধহয় মাত্র গোটা পঞ্চাশ মোটরগাড়ি, আমাদের পাড়ায় ডাক্তার গুরুপ্রসাদ মিত্রের, পসারওলা জমিদার আনন্দচন্দ্র রায়ের, বড়ো জোর আরো একজন-দু'জনের, অন্তত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধা না পর্যন্ত। মিরাতার গলি, কিছু-কিছু বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছে যা রজনী বসু লেইন, আমাদের একটি বিশেষ প্রচ্ছন্ন গর্বের কারণ হয়েছিল ; ঐ পঁচিশ-তিরিশটি বাড়ি থেকেই হয়তো অন্তত পঁচিশ-তিরিশটি যুবক দেশের বিভিন্ন কারাগারে রাজবন্দী হিশেবে কালাতিপাত করছেন, একজন-দু'জন, এখন ঠিক মনে নেই কারা তাঁরা, সেই মুহূর্তে আন্দামানেও। গরিব পরাধীন দেশে ঐটুকুই পাড়াভিত্তিক অহংকার, স্বাধীনতা সংগ্রামে কোন্ পাড়া থেকে কতজন স্বেচ্ছাসেবক নাম সই করেছেন, কতজন আইন অমান্য ক'রে কিংবা পিস্তল নিয়ে ধরা প'ড়ে জেলে গিয়েছেন ইত্যাদি।

তা ছাড়া, রজনী বসু লেইনে নেহাৎ কম খ্যাতিমান ব্যক্তিরা তো থাকতেন

না। পাড়ার মধ্যে পাড়া, পাড়ার ভগ্নাংশ, মিরাতার গলি যেখানে বেচারাম দেউড়িতে মিশেছে, আমাদের বাড়ির ঠিক উল্টোদিকে, বিজয়দাদের বাড়ি, বিজয়দা, বিজয়কুমার বসু, যিনি ডক্টর অটল-ডক্টর কোটনিসদের সঙ্গে চীন গিয়েছিলেন তিরিশের দশকে সেই দেশের লড়াকু-বিপ্লবী মানুষদের সেবা করার মহান উদ্দেশ্যে, পরে যিনি 'রণদিভে'-পর্বে কিছু সময়ের জন্য কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা কমিটির কর্ণধার হয়েছিলেন। গলি ধ'রে কয়েকশো ফুট ভিতরে এগোলে প্রবোধ গান্ধি মশাইয়ের বাসগৃহ, জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক, অসহযোগ আন্দোলনের সময় সেই যে জুতো পরা-ছেড়ে দিলেন তখন থেকে প্রবোধরঞ্জন গুহ মশাই প্রবোধ গান্ধি ব'নে গেলেন, কাট-কাট কথা বলতেন, কিন্তু অন্তরে স্নেহের আর্দ্রতা; আমাদের ফিশফিশ পারস্পরিক আলোচনা, প্রবোধ গান্ধি মশাইয়ের অগ্রজ রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়েছেন, তাঁর গার্হস্থ্য-উত্তর নাম নাকি ভরত মহারাজ। মিরাতার গলিতেই, বীরেন বসুর একটি একটু বড়ো বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন পাবনা-থেকে-আগত বিদ্বান-রাশভারি অতি-সজ্জন উকিল নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মশাই, শঙ্খ চৌধুরীর পিতৃদেব, মণীশ ঘটকের শ্বশুর। আরো দু-কদম এগোলে থাকতেন মিটফোর্ড হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসক-অধ্যাপক পরেশ চক্রবর্তী, কর্কটরোগ-বিশেষজ্ঞ রণেশ চক্রবর্তী ও মার্কিন-বিশ্ববিদ্যালয়াদি-কাঁপানো-জটিলতাকে-আরো-ঘোর-জটিল-ক'রে-তোলা সমাজতাত্ত্বিক গায়ত্রী স্পিভাক-চক্রবর্তীর বাবা। বেচারাম দেউড়ির প্রান্তে চ'লে আসুন, দক্ষিণ দিকে আমাদের বাড়ির লাগোয়া বিলাস রায় বাড়িওলার ব্যারাক-ধাঁচের পর-পর বাড়ির সারি, ভাড়াটেদের মধ্যে 'প্রগতি' পত্রিকার অন্যতম প্রধান হোতা, আমার পরমশ্রদ্ধেয় শিক্ষক, সদ্যপ্রয়াত অমলেন্দু বসু মশাই—এবং, পরে চিত্রপরিচালক হিশেবে বিখ্যাত, বিমল রায়।

অথচ আমার তীব্রতম স্মৃতি এদের কাউকে নিয়েই নয়। তেরো মিরাতার গলি-চৌষট্টি বেচারাম দেউড়ির কোনাকুনি-মুখোমুখি প্রবীণ উকিল জ্ঞানদাকান্ত-বাবুর তেতলা বাড়ি, তাঁর স্ত্রী পরমস্নেহশীলা, মুখে সব অবস্থাতে একগাল হাসি, স্পষ্ট বোঝা যেত, একদা পরমাসুন্দরী ছিলেন, আমাদের প্রায়ই ডেকে নিয়ে মোয়া-মিছরি উপহার দিতেন। ওঁদের একটি নাৎনি, আমাদেরই সমবয়সী, ঠাকুরদা-ঠাকুমার কাছে থেকে পড়াশোনা করত। আমাদের বাইরের উঠোনের ধার ঘেঁষে একদিকে শিউলির ঝাড়, অন্য দিকে মস্ত বড়ো একটি গুলঞ্চগাছ, তার পাশে কামরাঙার ডাল, এবং সেখান থেকে শুরু বেল-গন্ধরাজের অনেক দূর পর্যন্ত যাওয়া পঙ্‌ক্তি। শরৎ ঋতুতে সাত সকালে রাস্তা পেরিয়ে মেয়েটি শিউলিফুল কুড়োতে আসত। শেষ বসন্তে কিংবা প্রথম গ্রীষ্মে কুড়োত গুলঞ্চ কিংবা বেলফুল অথবা গন্ধরাজ, নয়তো শিথিল সকাল জুড়ে আমাদের সঙ্গে ডাঁসা কামরাঙায় কামড় বসাত। মেয়েটির নাম, প্রকাশ না ক'রে উপায় নেই আমার, নিরাশা। বাবা-মা-ই নামকরণ করেছেন হয়তো, কিংবা একমাত্র কর্তার ইচ্ছাতেই, তবে, কে জানে,

মেয়েটির মায়েরও হয়তো সায় ছিল : নিরাশা। বালকবয়সে মেয়েটির নামের তাৎপর্য নিয়ে মাথা ঘামাইনি। নিরাশার সঙ্গে গত পঞ্চাশ বছরে দেখাও হয়নি আর ; হয়তো, ষাট বছর আগে তার ঠাকুমা যেমন ছিলেন, এখন সে সম্ভ্রান্ত গৃহিণী, হয়তো তারও মন করুণায় ঠাসা, সে-ও সম্ভবত পাড়ার বাচ্চাদের একটু টফি, একটু চকোলেট বিতরণ ক'রে থাকে। তার স্বভাবে তখনো বিদ্রোহ ছিল না, পরেও কখনো সে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ত-বিরক্ত হ'য়ে পড়েছিল তা আদৌ মনে হয় না। সে হয়তো সারা জীবন ভ'রে তার নামের গ্লানি নীরবে বহন করেছে, হয়তো অল্প বয়সেই তার বিয়ে হয়ে যায়, হয়তো সে জীবনে সুখী হয়েছে, তার নামের দুঃসহ কলঙ্ক প্রসন্নতার সঙ্গে, মহানুভবতার সঙ্গে ক্ষমা ক'রে দিয়েছে। অথবা হয়তো সে জীবন থেকে কিছুই পায়নি, তার নামের মর্যাদা রক্ষা করতেই যেন, হতাশার উপর হতাশা, তার জীবনে বোঝা হয়ে থেকেছে। তা হ'লেও, চিন্তা ক'রে এখন ক্ষিপ্ত হওয়ার এক বিলম্বিত ইচ্ছা, কী ভয়ংকর অন্যায় সমাজব্যবস্থা, মাত্র ষাট-পঁয়ষট্টি বছর আগেকার কথা বলছি, রবীন্দ্রনাথের গরিমা মধ্যগগনে, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'নারীর মূল্য' পর্যন্ত ইতিমধ্যে প্রকাশিত, শুধু 'শেষ প্রশ্নে' কমলের কিছু-কিছু জিজ্ঞাসা তখনো বাকি, সারা দেশ জুড়ে অসহযোগ আন্দোলনের পর আইন-অমান্য আন্দোলন সদ্যসমাপ্ত, যাতে হাজার-হাজার মহিলা যোগ দিয়েছেন। অথচ, নিটোল বাঙালি মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজ, প্রথম সন্তান কন্যা, ঢাক পিটিয়ে তাকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সে নিরাশা। মিরাতার গলি আমার স্মৃতিতে ক্রমশ ধূসর, কিন্তু হঠাৎ কখনো যদি নিরাশার কথা মনে হয়, চেতনায়-ধমনীতে এক ধরনের ক্রোধ অনুভব করি, সমাজবিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আরো-একটু নিঃসন্দেহ হই।

অন্য যে-প্রশ্ন আজও ভাবায়, মীর আতা, যে-সম্ভ্রান্ত মহল্লা সর্দারের সম্মানে আমাদের গলির আদি নাম, অথবা বেচারাম, যে-পরিচয়হীন অজ্ঞাত ব্যক্তির স্মৃতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে আমাদের বাড়ি ছুঁয়ে-যাওয়া বেচারাম দেউড়ির নামকরণ, তাঁদের প্রসঙ্গে কারোরই উৎসাহ ছিল না। রজনী বসুর পরিচয় আদ্যোপান্ত আমাদের জানা, কিন্তু মীর আতা এবং বেচারাম ঠিক কারা ছিলেন তা, আমাদের কাছে অন্তত, প্রক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ। মধ্যবিত্ত হিন্দু মানসিকতা, জনৈক মুসলমান মোড়ল এবং জনৈক সম্ভবত-বিহারী-ঘোড়ার-ব্যাবসাদার কবে এই পাড়ায় ডেরা বেঁধেছিল, তা জানতে আমাদের বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্যবোধ ছিল না, এটাও সমকালীন সামাজিক পরিবেশের প্রতিফলন, 'আনন্দমঠ'-'কথা ও কাহিনী'-পড়া বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত, ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা যদিও বাংলা প্রদেশে ইতিমধ্যেই সংখ্যাগুরু, বিশেষ ক'রে পূর্ব বঙ্গে, যদিও উত্তর ভারত থেকে কাতারে-কাতারে হিন্দি-উর্দুভাষী জীবিকান্বেষণে-আসা মানুষের ভিড়, তাদের তেমন রেয়াৎ দিতে নেই ; এমনকি যাঁরা দশ-বারো বছর দেশের জন্য জেল খেটে সদ্য-মুক্ত হ'য়ে বাড়ি ফিরেছেন, তাঁদের মতামতেও অন্য-কোনো চিন্তার ছায়া পড়েনি তখন পর্যন্ত।

স্মৃতিমেদুরতায় সমাচ্ছন্ন থাকি, আছি, কিন্তু মীর আতা, এবং বেচারাম, যাঁদের নামে আমাদের বাড়ির জোড়া ঠিকানা, তাঁরা কে ছিলেন, এখনো জানি না, আমৃত্যু জানবোও না। আর জানা হবে না নিরাশা তার নামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল কিনা।

'এক গুলিতে তেইশ সাহেব মারবো'

ঘোড়ায়-জিন্-লাগানো সময়, এক দমকায় যেন ষাটটি বছর পেরিয়ে গেছে, তিরিশের দশকের গোড়ার দিকের সেই দিনগুলিকে তবু মনে হয় হাতে ধরা যায়। সম্ভবত ১৯৩২ সাল, সম্ভবত তার পরের বছর, হালে যাঁরা বি-বা-দী-তে পর্যবসিত, সেই বিনয়-বাদল-দীনেশের পীঠস্থান আমাদের ঢাকা শহর, উত্তেজিত গল্প, যা কিংবদন্তী হয়ে দাঁড়ায়; কী ক'রে মিটফোর্ড হাসপাতালের প্রাঙ্গণে লোম্যান না হাডসন সাহেবকে পর-পর তিনটি গুলি ক'রে বিনয় বসু ধীরে-সুস্থে রিভলভার পকেটে পুরলেন, রুমাল বের ক'রে মুখ মুছলেন, গুলির-শব্দে-সঙ্গে-সঙ্গে-জনমানবহীন ইসলামপুরের রাস্তা পেরোলেন, দেড়শো গজ হেঁটে পিক্‌চার হাউসের দেওয়ালের কাছে পৌঁছুলেন, দেওয়াল টপকে ওপাশে-আগে-থেকে-দাঁড়-করানো সাইকেল চেপে উধাও হয়ে গেলেন, দু-সপ্তাহ বাদে বিজয়ী বীরের ফের আবির্ভাব কলকাতায়, রাইটার্স বিল্ডিংয়ের করিডরের গরীয়ান ভয়ংকর যুদ্ধক্ষেত্রে। পরাধীন দেশের মুহ্যমান মফস্বল শহর, পৃথিবী জুড়ে আর্থিক মন্দা। আইন-অমান্য আন্দোলন কখনো একটু মাথা চাড়া দিচ্ছে, পরক্ষণে ঝিমিয়ে পড়ছে। আমাদের পাড়ার প্রতিটি গলির প্রতিটি বাড়ি থেকে একটি-দু'টি যুবক বিনা বিচারে কারাবন্দী। সূর্য সেন, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহদের নাম মন্ত্রোচ্চারণের মতো মুখে-মুখে বিলি কাটা হয়, সেই সঙ্গে, আমাদের শহরে অন্তত, বিনয় বসুদের নামও। বালকবয়স, একটু একটু ক'রে চেতনার উপর আবেগের প্রলেপ পড়ে। আমাদেরই শহরের জেলখানায় আটক অনিল দাস, সেই অনিল দাস, যাঁর বোন লতিকা সেনকে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির কয়েক-মাসের মধ্যে বিধানবাবুর পুলিশ কলকাতার রাস্তায় গুলি ক'রে হত্যা করে। বালকবয়স, জেলখানার চৌহদ্দির আধ মাইলের মধ্যে আমাদের বাড়ি, আগুনের হল্কার মতো গুজব ছড়ায়, জেলখানায় অনিল দাসের উপর ইংরেজ পুলিশের অকথ্য-অবর্ণনীয়-অত্যাচার, 'সন্ত্রাসবাদী'দের গোপন খবর বের করার চেষ্টায় চাবুকের উপর্যুপরি প্রহার। যতবার চাবুকের প্রহার, ততবার অনিল দাসের কণ্ঠনিঃসৃত 'বন্দেমাতরম্' উচ্চারণ, আবার চাবুক, আবার 'বন্দেমাতরম্', আবার, আবার। লোকপ্রবাদ, সারা রাত ধ'রে অত্যাচারের পর্ব চলে, ভোরের আলোয় অনিল দাসের নিষ্প্রাণ, নিঃস্পন্দ দেহ। ছোটো শহরের ছোটো বিশ্ববিদ্যালয়, সেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অত্যুজ্জ্বল ছাত্র অনিল দাস, তাঁর শহিদের মৃত্যুবরণের কাহিনী রূপ-কথার স্তরে উত্তীর্ণ হয়, শহর প্রতিবাদে থম্‌থম্ করে, আমরা শিশুরাও চঞ্চল।

এক আজব খেলায় মাতি আমরা। উদ্ভট খেলা, উপকরণহীন। শুধু কথার

মামদোবাজি, পরস্পরের সঙ্গে আস্ফালন-প্রতিআস্ফালন। 'এক গুলিতে তিন সাহেব মারবো', 'ছোঃ, মাত্র তিন ? আমি এক গুলিতে সাত সাহেব মারবো'। 'ঠিক আছে, আমি তেরো সাহেব মারবো'। এমনি ক'রে, কল্পনা নিজেকে প্রলম্বিত ক'রে চলে, দুপুর গড়িয়ে বিকেল. আমরা মুখে-মুখে সাহেবের পর সাহেব মেরে চলি। যেন মনশ্চক্ষে দেখতে পাই আমাদের সামনে গুলিবিদ্ধ সাহেবদের স্তূপের-পর-স্তূপ মৃতদেহ।

খেলা, উপকরণহীন, আপৎশূন্য, অথচ সহিংস খেলা। পরাধীন শহরের ঝিমোনো মফস্বল, সেই তিরিশের দশকের গোড়ায়, আমাদের দেশাত্মবোধের সূচক এই মারাত্মক খেলা। পরে, পরিণত বয়সে, একজন-দু'জন ইংরেজ বন্ধুকে যখন এই কাল্পনিক নিধনের কাহিনী শুনিয়েছি, তাঁরা নিশ্চয়ই ঈষৎ ত্রস্ত বোধ করেছেন, সামান্য একটু চিন্তায় দীর্ণ হয়েছেন, অন্য দেশের গোলাম হয়ে থাকলে পরে যে-সব অনুভূতিমালার জন্ম হয়, এমনকি শিশু-মানসেও হয়, তার আভাস তাঁদের অবশ্যই খানিকটা বিচলিত করেছে।

সাহেব-মারার অঙ্গীকারের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়ানো আমাদের দেশপ্রেমের প্রথম পাঠ। কিন্তু শিশুশিক্ষার দ্বিতীয় একটি পাঠও ছিল. যার উল্লেখ না করা অযৌক্তিক হবে। বিক্রমপুর পরগনার গ্রামে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বাড়িতে ছুটি কাটাতে গেছি। গ্রামের কাদা-জড়ানো, ধুলো-ওড়ানো রাস্তায় ইতস্তত ঘুরে বেড়াই. বনে-জঙ্গলে হারিয়ে যাই. কখনো নদীর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে জলের প্রমত্ত উচ্ছ্বাস দেখি। কিংবা, সঙ্গীসাথী জুটিয়ে, মাঝে-মাঝে এখানেও ফের 'এক গুলিতে অত-শো-অত-হাজার-অত-লক্ষ সাহেব মারবো' খেলার তালিম দিই। হঠাৎ সারা গাঁ উতরোল। জমিদারের কনিষ্ঠ পুত্র, সতেরো-আঠারো বছর বয়স হবে হয়তো বা, দুই ফুট-আড়াই ফুট চওড়া আল ধ'রে উত্তর থেকে দক্ষিণগামী, হবি তো হ, ঠিক সেই মুহূর্তে জনৈক মুসলমান কৃষকসন্তান, তারও বয়স ঐ একই রকম, দক্ষিণ থেকে ঐ একই আল বেয়ে উত্তরমুখো। গায়ে গা ঠেকেনি, কিন্তু এবংবিধ পরিস্থিতিতে কৃষক-প্রজাটির নাকি আল থেকে নিচে নেমে গিয়ে দাঁড়িয়ে প'ড়ে কুর্নিশ করা অবশ্যকর্তব্য ছিল। তা তো সে করেইনি, এমনকি চকিত সময়ের জন্য স'রেও দাঁড়ায়নি সে, পাশ কাটিয়ে সে উত্তর দিকে চ'লেই যাচ্ছে, চ'লেই যাচ্ছে—যা নাকি অমার্জনীয় অপরাধ। অতএব গাঁময় আলোড়ন, জমিদারগৃহে জরুরি বৈঠক, সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অবিলম্বে শাস্তিবিধান প্রয়োজন, নইলে অবাধ্য প্রজাকুল মাথায় চ'ড়ে বসবে। সিদ্ধান্ত কার্যকর হ'তে কালক্ষেপণ নেই, পেয়াদারা তো পাশেই দাঁড়ানো। ঐ দুর্বিনীত কৃষক সন্তানটিকে রুক্ষ দড়ি দিয়ে আড়মোড়া বেঁধে গ্রামের এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা দিয়ে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসা হলো। পদাঘাতে-চপেটাঘাতে-মুষ্ট্যাঘাতে ইতিমধ্যেই সে অর্ধমৃত। কিন্তু না, নির্ধারিত শাস্তি মকুবের প্রশ্ন নেই। একটি চেরা কাঠে আটটি কি দশটি লোহার পেরেক এফোঁড়-ওফোঁড় করা। লৌহবিদ্ধ সেই চেরা-কাঠ দিয়ে অতঃপর অবাধ্য

মুসলমান প্রজার পিঠে ও পশ্চাদ্দেশে দমাদ্দম প্রহারের পালা প্রায় অর্ধপ্রহর ধ'রে। এক গুলিতে অতশো-অতহাজার-অত লক্ষ সাহেব মারার খেলা ততক্ষণে স্তব্ধ হয়ে গেছে, আমরা কয়েকটি শিশু হতবাক হয়ে প্রজাশাসনের পরাকাষ্ঠা দৃষ্টান্তিত হ'তে দেখছি।

ঐ অতুটুকুন বয়সে আরেক বার জ্ঞানশলাকার উদ্দীপন। কল্পনার তো পাখা মেলে উড়ে বেড়াতে বাধা নেই, বালক-বালিকা বয়সে আরও নেই, তা হ'লেও দাবি করতে পারবো না যে আমাদের খেলার রকমফের ঘটল, তখন থেকে আমরা এক গুলিতে অতশো-অতহাজার সাহেব মারার পরিবর্তে অতশো-অতহাজার জমিদার-নিধনের নেশায় মেতে উঠলাম। সে-ধরনের কিছু ঘটল না, কিন্তু আমরা হঠাৎ বুঝে গেলাম ইংরেজ-তাড়ানোর বাইরেও দেশপ্রেমের অন্য-একটি সংজ্ঞা অপেক্ষমান। বিশেষ ক'রে যা আমাদের কাছে মস্ত হেঁয়ালি ব'লে মনে হলো, জমিদারেরই বড়ো ছেলে আইন অমান্য আন্দোলনে নেমে প'ড়ে কারাগারে বন্দী, অথচ সেই পাশা-পাশি ইতিহাস প্রজাপীড়নের পরিচ্ছেদে এতটুকু ব্যত্যয় ঘটালো না।

দেশ স্বাধীন হয়েছে, দেশ স্বাধীন করতে গিয়েই, কে জানে, দেশটা ভাগ হয়েছে, অনেক উথালপাথাল উপাখ্যান, গোটা ষাটেক বছর গড়িয়ে গেছে, কিন্তু, এখনো পর্যন্ত, ঘুরে আসুন বিহার কি উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান কি হরিয়ানা, প্রজা-পীড়নের চেহারা-চরিত্র আদৌ পাল্টায়নি। দেশটা ভারতবর্ষ, ঐতিহ্যের গর্বে সমাচ্ছন্ন আমরা, নিষ্পেষণের ঐতিহ্যই বা ফেল্‌না কীসের। যে বলবে ফেল্‌না, সে দেশদ্রোহী।

ন্যায়-অন্যায় জানিনে জানিনে জানিনে

কাহিনীটি শুনেছিলাম ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মশাইয়ের কাছ থেকে। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারততত্ত্ব চর্চার জন্য একটি আলাদা কলেজ খোলা হয়েছিল চল্লিশের দশকের শেষের দিকে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে ডক্টর মজুমদার গিয়েছিলেন প্রথম কয়েক বছর দায়িত্বে থেকে কলেজটিকে সাজিয়ে-গুছিয়ে সংগঠিত ক'রে দিয়ে আসতে। অধ্যাপকমণ্ডলী নিয়োগের উদ্দেশ্যে খবরের কাগজে প্রথাগত বিজ্ঞাপন বেরোনো মাত্র, দরখাস্ত জমা পড়লো বেশ কয়েক কুড়ি। বছর পঁচিশেক বয়সের একটি যুবক, বাড়ি গোরক্ষপুর অথবা গাজিপুর, একদিন ডক্টর মজুমদারের সঙ্গে দেখা করতে এলো: সে সহকারী অধ্যাপক হিশেবে নিযুক্ত হ'তে চায়, সঙ্গে সুপারিশপত্র এনেছে রাজনীতির কোনো কেষ্টবিষ্টুর, খুব সম্ভব বাবু সম্পূর্ণানন্দের কাছ থেকে। কাগজপত্র নেড়ে-চেড়ে ডক্টর মজুমদার আবিষ্কার করলেন, ছেলেটি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তৃতীয় বিভাগে, আই. এ.তেও তাই, তা সত্ত্বেও কীভাবে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে অনার্স ক্লাসে ভর্তি হ'তে পেরেছিল তা রহস্য, তবে বি. এ. পরীক্ষাতেও তৃতীয় বিভাগে, পরে এম. এ. পরীক্ষাতেও তথৈবচ। ডক্টর মজুমদার বিব্রত, খুব মোলায়েম ক'রে যুবকটিকে বোঝানোর চেষ্টা: 'লেখাপড়া-গবেষণা সম্পর্কে তোমার আগ্রহে আমি অভিভূত। কিন্তু বুঝতেই তো পারছো, তোমাকে সহকারী অধ্যাপকের চাকরি দিতে মস্ত অসুবিধা, তুমি তো বরাবর কোনোক্রমে তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হ'য়ে এসেছো'। শুনে অধ্যাপনামন্য যুবকের প্রবল উষ্মা, সেই সঙ্গে বিস্ময়বোধ: 'ইসি লিয়ে তো পত্তি লে আয়ে'।

অকাট্য যুক্তি, সত্যিই তো, ওর যদি আগাগোড়া প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রিই থাকবে তা হ'লে আর কষ্ট ক'রে অত কাঠখড় পুড়িয়ে বাবু সম্পূর্ণানন্দের কাছ থেকে সুপারিশ আনতে যাবে কেন? আর এই উজবুক প্রিন্সিপাল সাহেব সেই সুপারিশের চিঠিকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনতে চাইছেন না, মগের মুল্লুক নাকি? একটি সম্পূর্ণ আলাদা মানসিক পরিমণ্ডল, যেখানে এটা স্বতঃসিদ্ধ হিশেবে ধ'রে নেওয়া হয় নিয়মশৃঙ্খলা, রীতিনীতি, তুলনাগত যোগ্যতা-দক্ষতা, ইত্যাদি অবাস্তব প্রশ্ন, কোনো চাকরি জোটাতে হ'লে যা দরকার তা যথাস্থানে ধরাধরি। সংস্কৃত ক'রে এটাকেই হয়তো বলা হয় সামন্ততান্ত্রিক নৈতিকতা। সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশে লজ্জাসংকোচের বালাই থাকে না, রাজা বা জমিদারের যাকে পছন্দ হবে সে শিরোপা পাবে, যাকে অপছন্দ তাকে শূলে চড়াও। ইংরেজ আমলে সদাগরি দপ্তরগুলিতেও সেই ঐতিহ্যই

বহাল ছিল : বড়োবাবুকে ধ'রে ঝুলে পড়ো, সবই সুপারিশের ব্যাপার, বড়োবাবুর বাড়িতে একটু আম-কাঁঠাল পাঠাও, বড়োবাবু সেজো সাহেবের পেয়ারের লোক, ছেলেটার একটা হিল্লে হয়ে যাবে। একটা সময়ে সদাগরি দপ্তরগুলির উপর মহলে ভারতীয়দের নেওয়ার সিদ্ধান্ত হলো, মূল রীতি কিন্তু পাল্টাল না। ইংরেজ-ঘেঁষা বড়োলোকের বাড়ির সন্তানেরাই এ-ধরনের কাজে ঢুকতে পারল, জজ বা সিভিলিয়ানের ছেলে, নয়তো কোনো জমিদারনন্দন, অথবা কোনো শাঁসালো ব্যবসায়ী-পুত্র। মেধা বা যোগ্যতা নিয়ে আমাদের প্রভুদের দ্বারা পরিচালিত সদাগরি দপ্তরে তেমন মাথা ঘামানো হতো না, সদ্বংশজাত, অর্থাৎ কোনো খয়ের খাঁর পরিবারভুক্ত হলেই হলো, কাজকর্ম পরে শিখিয়ে-পড়িয়ে নেওয়া যাবে। তবে বাঁচোয়া, সরকারি কাজের ক্ষেত্রে, কিংবা শিক্ষাব্যবস্থায়, ইংরেজ প্রভুরা ও-রকম ঢিলেঢালা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেননি, সরকার চালাতে গেলে স্রেফ বশ্যতা দিয়ে চলবে না, ন্যূনতম দক্ষতা-যোগ্যতার প্রয়োজন, প্রতিতার প্রয়োজন, গণ্ডমূর্খদের মাস্টারিতে বসিয়ে শিক্ষাদান সম্ভব নয়, এই মৌলিক শর্তগুলি আমাদের পরাধীনতার যুগে বিদেশি শাসককুল মেনে নিয়েছিলেন। ঐ একটি ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদ সামন্ততন্ত্রকে খাতির করতে রাজি হয়নি। স্বাধীনতার পর চুয়াল্লিশ বছর অতিক্রান্ত, কিন্তু বিহার, উত্তর প্রদেশ জুড়ে, শুধু বিহার-উত্তর প্রদেশ কেন, গোটা আর্যাবর্তে, সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণা সর্বস্তরে চেতনা সমাচ্ছন্ন ক'রে এখনো উপস্থিত, গোরক্ষপুরের ঐ যুবকটিকে করুণা ক'রে, বা তাঁর উপর কুপিত হয়ে, লাভ নেই। যুক্তির কাঠামোর পুরোপুরি আলাদা আদল। যিনি পরোপকার করেন তাঁকেই তো আমরা সদাশয় বলি। আমরা পড়শি, একই পাড়ার কিংবা একই গ্রামের মানুষ, অথবা আমরা একই জাতের, সুতরাং আমার ছেলের একটা ভালো কাজ জোটে এটা দেখা তো ওঁর, এই মেহেমান মানুষের, কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। আমাদের গাঁ থেকে কিংবা আমাদের জাত থেকে যিনি বড়ো হয়েছেন, সমাজের মগডালে উঠে গিয়েছেন, তিনি অবশ্যই আমাদের দেখভাল করবেন, আমাদের গাঁয়ে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবেন, সড়ক-সাঁকো তৈরি ক'রে দেবেন, জলনিকাশী ব্যবস্থা ক'রে দেবেন, পাঠশালা খুলে দেবেন, পানীয় জল সরবরাহের উদ্যোগ নেবেন, এবং সে-সব কিছুর সঙ্গে গাঁয়ের ছেলেদের, নিজের জাতের ছেলেদের, চাকরির ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। এটাই তো নিয়ম, ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে যা ওতপ্রোত জড়ানো, সুতরাং বাবু সম্পূর্ণানন্দ বা কমলাপতি মিশিরজি অবশ্যই সুপারিশপত্র লিখবেন, আর আপনি কোথা থেকে প্রিন্সিপাল সাহেব উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন যে আমার মুখের উপর ব'লে দিচ্ছেন সুপারিশে কাজ হবে না, যেহেতু আমি বরাবর তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছি? লেকিন ইসি লিয়ে তো পত্তি লে আয়ে।

এই মানসিকতা নিশ্ছিদ্র, দরজা-জানালাহীন। এটা বোঝানো অসম্ভব যার যোগ্যতা নেই, স্রেফ সুপারিশের জোরে তাকে কোনো কাজ পাইয়ে দেওয়ার অর্থ

যোগ্যতাসম্পন্ন কাউকে বঞ্চিত করা, যা অন্যায়, অনুচিত। ঔচিত্য-অনৌচিত্যের প্রশ্নটি একটু কায়দা ক'রে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয় : দেখুন না, যেখানে পাশের গ্রামের বা অমুক জাতের কেউ কাজ দেওয়ার মালিক, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আমাদের গাঁয়ের বা আমাদের জাতের ছেলেদের তিনি পাত্তা দিচ্ছেন না, তাঁর নিজের গ্রামের-নিজের জাতের-ছেলেগুলিকে টেনে তুলছেন তাদের কোনো যোগ্যতা থাকা না সত্ত্বেও, সুতরাং আমাদের ক্ষেত্রেই বা অন্যরকম হবে কেন। ক্রমে-ক্রমে একটি সরলীভূত ব্যাকরণ তৈরি হয়ে যায় : বাঙালি বাঙালিদের দেখবে, তামিলরা তামিলদের, মালয়ালীরা মালয়ালীদের, বিহারীরা বিহারীদের ইত্যাদি ইত্যাদি, তাতে আদৌ অন্যায় কিছু নেই। ভারতবর্ষ এক এবং অখণ্ড, কিন্তু আত্মরক্ষা মহাধর্ম, অখণ্ডতা-ঐক্য-সংহতি ইত্যাদি বুকনি মেনে নেওয়ার পরেও নিজেদের কোলে ঝোল না-টানার চেষ্টাটুকু পরম বোকামি। চিন্তামন দেশমুখ তখন দেশের অর্থ মন্ত্রী, আমার এক গুজরাটি বন্ধু অর্থমন্ত্রকে যোগ দেওয়ার মাস-খানেকের মধ্যে, তার গাঁয়ের এক প্রান্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কাছ থেকে অতি-উল্লেখনীয় একটি চিঠি পেল : 'বাবা ইন্দুভাই, তুমি অর্থমন্ত্রকে দায়িত্বশীল পদে যোগ দিয়াছো জানিয়া খুশি হইলাম। তুমি তো জানো আমাদের গ্রাম করমসতে আজ পর্যন্ত রেলপথের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন সম্ভব হয় নাই। দেশমুখ নামক মহারাষ্ট্রীয় ভদ্রলোকটি অর্থ মন্ত্রী, স্বভাবতই তিনি এই ব্যাপারে বাগড়া দিয়া আসিতেছেন, তিনি চাহেন না গুজরাটে রেলপথের বিস্তার ঘটুক, শুনিতে পাইলাম নানা ছুতায় তিনি করমসতের রেল-প্রকল্পের টাকা আটকাইয়া রাখিয়াছেন। এবার তুমি যেহেতু অর্থমন্ত্রকে যোগ দিয়াছ, তুমি আমাদের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান, তোমার প্রচেষ্টায় আমাদের রেলসংযোগ ঘটিবে, এই বিশ্বাস রাখি। ইতি আশীর্বাদক'। আবহমান কাল ধ'রে গ্রামের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তানের কর্তব্য নিজেদের কোলে ঝোল টানা! ব্যাকরণ আদৌ পাল্টায়নি, সন্দেহ হয়, ভারতবর্ষের বিরাটাংশ জুড়ে এটা বোঝানোর কোনো চেষ্টাই হয়নি যে নিজের কোলে ঝোল টানা অসদাচার, যিনি ঢালাও এই আচরণ করবেন, তিনি দুর্নীতিগ্রস্ত। স্বাধীনতা-উত্তর চুয়াল্লিশ বছরে যে-সব ঘটনাবলি ঘটেছে, সুনীতি-দুর্নীতির ভেদাভেদবোধ প্রায় অবলুপ্ত। চার দশক জুড়ে যেমন আমরা গণতান্ত্রিক কাঠামো মজবুত করার মহান্ উদ্দেশ্য উপলক্ষ ক'রে অঢেল বক্তৃতা শুনেছি, পাশাপাশি এক নিকষ পরিবারতন্ত্রকে বিকশিত-বিকচিত-হ'তেও দেখেছি। উক্ত পরিবারটির সন্নিকটে যাঁরা থেকেছেন, পরিবারটির দলভুক্ত-গোষ্ঠীভুক্ত, তাঁরা ফুলে-ফেঁপে উঠেছেন, আর্যাবর্তের মানুষজন এটাই স্বাভাবিক নিয়ম ব'লে মেনে নিয়ে এসেছেন। এবংবিধ ব্যবস্থায় যাঁরা আদৌ কিছু পাননি এবং পাচ্ছেন না, তাঁরা যদি চিরতরে মুখ বুজে থাকেন, তা হ'লে সামাজিক শান্তি ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা নেই। মুশকিল হলো, অজ্ঞান-অবোধ লোকগুলিও কী ক'রে যেন কোনো বিশেষ মুহূর্ত থেকে একটু-আধটু বুঝতে শুরু করে, তারাও বলাবলি

শুরু করে কোথাও একটা মস্ত ফাঁকিজুকির ব্যাপার আছে, বলা হচ্ছে গণতন্ত্র, বলা হচ্ছে সবাইকার একটি ক'রে ভোট, প্রত্যেকের সমান সুযোগের অধিকার, অথচ সমস্ত মধু সেবন ক'রে যাচ্ছেন গুটিকয় পরিবার, এবং তাঁদের শ্রেণী বা গোষ্ঠীভুক্তরা। বিন্দু-বিন্দু ক'রে অসন্তোষ জমা হ'তে থাকে, তবে যা হ'তে পারত বিশুদ্ধ শ্রেণীযুদ্ধ, শোষকশ্রেণীর সঙ্গে শোষিতদের ধর্মযুদ্ধ, আর্যাবর্তের বিকৃত হাওয়ার গুণে অনেক ক্ষেত্রে তা পর্যবসিত হয় জাত-পাতের লড়াইতে। কেউ-কেউ জাত-পাতের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক আড়াআড়ির প্রসঙ্গটি জুড়ে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারেন না, তাঁরা কখনো রাম-সীতা-হনুমানের দোহাই দিয়ে, অথবা কোনো দোহাই ছাড়াই, ধর্মযুদ্ধের হাঁক পাড়েন। এই ডামাডোলের সুযোগ নিয়ে অন্য কেউ-কেউ অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে স্মরণ করেন, মা যদি দয়া ক'রে আরো-একটু এলোমেলো ক'রে দিতে পারেন, তাঁদের লুটে-পুটে খাওয়ার মস্ত সুবিধা হয়।

ধর্মযুদ্ধ : আমার পরিবারের জন্য, আমার শ্রেণীর জন্য, আমার জাতের জন্য, আমার সম্প্রদায়ের জন্য সংগ্রাম করছি আমি। এই যুদ্ধজয়ের জন্য যা-যা করণীয় সব কিছুই ন্যায়। সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার, মন্ত্রী হয়ে ব'সে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে দু-হাতে অর্থসংগ্রহ, এবং যেহেতু ব্যবসায়ীরা বিনা স্বার্থে পয়সা খসাবেন না, তাঁদের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা ক'রে দেওয়া। ধর্মযুদ্ধ, অতএব ঘুষ নিতে হয়, ঘুষ দিতে হয়। যুদ্ধ পরিচালনা করতে গেলে অর্থের প্রয়োজন, যে-কারো কাছ থেকে যে-কোনো উপায়ে টাকা তুলতে হবে, দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করতে বিদেশ থেকে যদি অস্ত্রশস্ত্র কেনার ব্যাপার থাকে, অথবা দেশের বিমান যাতায়াত ব্যবস্থা প্রসারের জন্য যদি বিশ-পঁচিশটা একেবারে-হালের বিমান 'বরাত' দেওয়ার উপলক্ষ থাকে, সেই সুযোগ গ্রহণ না করাই অনুচিত হবে, তা নিয়ে অত লেখালেখির কী আছে।

না, আমি কারো মুখে কোনো কল্পিত মন্তব্য বসিয়ে দিচ্ছি না, মাত্র কয়েক মাসের জন্য হ'লেও, এবং খুব কিম্ভূত উপায়ে হ'লেও, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সিং উপস্থিত দেশের প্রধানমন্ত্রী। তিনি সমাজতন্ত্রের উপযোগিতা নিয়ে অনেক বক্তৃতা দিয়ে বেড়িয়েছেন তিরিশ বছর ধ'রে, ধর্মবণ্টনের ঘোর অসাম্য নিয়ে নিজেকে সদাই ভাবিত রেখেছেন, সম-অনুপাতে সর্বত্র সর্বস্তরের মানুষের মনে সম্ভাবনা উদ্রেকের উদ্দেশ্যে সারা দেশ জুড়ে পদযাত্রা করেছেন। এইসব ক'রে-ট'রে মনে হয় এখন প্রাজ্ঞতায় পৌঁছেছেন। গোস্‌সা হয়েছে তাঁর, আচ্ছা, দেশের লোকগুলি কি কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছে, বিদেশ থেকে কামান কিনতে গিয়ে কংগ্রেসদল ও রাজীব গান্ধিজি যদি ষাট কোটি টাকা গায়েব ক'রেই থাকে, এমন কী মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে তাতে, রাজনীতি করতে গেলে, কে না জানে, টাকার ব্যবস্থা করতে হয়, যে-কোনো সূত্র থেকে, যে-কোনো উপায়ে টাকা তুলতে হয়, কংগ্রেস দল তা-ই করে, তিনি, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সিং-ও করেন, টাকার গায়ে তো কোনো গন্ধ থাকে না।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচা গেল। এতদিন সংকটের মধ্যে থাকতে হচ্ছিল, ভারতীয় ঐতিহ্যের বুজরুকি, ছেলেবেলায় নীতিশিক্ষার বইতে পড়তে হয়েছিল, সদা সত্য কথা বলতে হয়, অপরের দ্রব্য না ব'লে নিতে হয় না, উৎকোচগ্রহণ নিছক ফৌজদারি অপরাধ নয়, পাপ। দেশের প্রধান মন্ত্রী আমাদের সেই বিবেকবোধের তাড়না থেকে দায়মুক্ত করেছেন। আমাদের শিশুদের নীতিশিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, চুরিবিদ্যা বড়ো বিদ্যা যদিও পড়ে ধরা।

'আপ্‌কান্ট্রি ট্রাম কণ্ডাক্টারটা আমাকে আর-একটু হ'লেই হারিয়ে দিচ্ছিল'

বাঘা-বাঘা বামপন্থী নেতারাও পর্যন্ত এখন মেনে নিচ্ছেন, বিধান রায় মশাই পশ্চিম বাংলার রূপকার, তাঁর জন্মদিনে—যা তাঁর মৃত্যুদিনও—সভাসমিতিতে গিয়ে শ্রদ্ধাপ্লুত বক্তৃতা দিচ্ছেন, আমার ঘাড়ে ক'টা মাথা যে অন্যরকম বলি।

অথচ একটু অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেই হয়। ১৯৫৬ সালে লোহা আর ইস্পাতের দাম সারাদেশে যে এক ক'রে দেওয়া হলো, সেই সঙ্গে কয়লা পরিবহনের ক্ষেত্রে বলা হলো যে যত বেশি দূরত্ব রেলমাশুল কিলোমিটারপ্রতি তত কম, তাতে অন্যান্য অঞ্চলের পৌষ মাস, পশ্চিম বাংলাসহ গোটা পূর্বাঞ্চলের সর্বনাশ। কয়লার আগুনে লোহা গালিয়ে-পুড়িয়ে-শোধন ক'রে ইস্পাত তৈরি হয়, সেই ইস্পাত ফের আগুনে গালিয়ে নিয়ে যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হয়, পূর্বাঞ্চলে অঢেল কয়লা, অঢেল লোহা, অতএব যন্ত্রপাতি উৎপাদনে এই অঞ্চলের তুলনামূলক স্বাভাবিক সুবিধা। ভারতবর্ষের সর্বত্র লোহা-ইস্পাতের দাম একীকরণহেতু, এবং কয়লার মাশুলের ব্যাপারে ঐ বিশেষ ছাঁদের নীতি প্রবর্তনের ফলে, এঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে আমাদের চিরাচরিত সুবিধাটুকু আর রইল না। তা ছাড়া, এমনকি বেসরকারি শিল্পে পর্যন্ত বিনিয়োগের জোগান আসে প্রধানত কেন্দ্রীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাছ থেকে। প্রায় একই সময়ে নতুন দিল্লি থেকে ফরমান জারি হলো, পশ্চিম বাংলা তো অপেক্ষাকৃত শিল্পোন্নত রাজ্য, বিনিয়োগের টাকা তাই অন্যত্র খরচ করাই বিধেয়। ষাটের দশকের শেষের দিকে অবশ্য নিত্যনতুন অনেক 'কারণ' শোনা যেতে শুরু হলো, শিল্পপতিরা কেন পশ্চিম বাংলা থেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন—কাজের পরিবেশ নেই, জঙ্গি-উদ্ধত শ্রমিক আন্দোলন, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে উৎসাহের অভাব, বিদ্যুতের অনিশ্চয়তা, ইত্যাদি ইত্যাদি—, কিন্তু আসল সমস্যাগুলির উল্লেখ সযত্নে চেপে যাওয়া হলো। সেই সময় থেকে, শিল্পের ক্ষেত্রে অন্তত, পশ্চিম বাংলা ধুঁকছে।

একচক্ষু সিদ্ধান্ত: পূর্বাঞ্চল যে-যে আকর সামগ্রী বেচবে তাদের দাম সারা দেশে এক; যে-যে জিনিশ আমদানি করবে অন্য জায়গা থেকে, যথা তুলো, যথা রাসায়নিক উপাদান, তাদের দাম কিন্তু একসূত্রে বাঁধা হবে না। পুরোনো নথিপত্র ঘেঁটে দেখুন, নতুন দিল্লির চালটি এই রাজ্যের খবরকাগজগুলি আদৌ বুঝতে পারল না, কিংবা বুঝতে পারলেও তাদের কোনো মাথাব্যথা হলো না, রাইটার্স বিল্ডিং থেকে কোনো প্রতিবাদ-বিবৃতি বেরোলে না, জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বৈঠকে চরম এক-পেশে মাশুল সমীকরণ নীতি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো। কলকাতায় এনৃতার বণিক-

সভা, যাদের হোমরাচোমরা সদস্যরা হোটেলে-ক্লাবে অহোরাত্র খানাপিনা করেন, ফাঁকে-ফাঁকে এই রাজ্যের অধিবাসীদের কাঁড়ি-কাঁড়ি উপদেশ বিলোন, সভ্যভব্য আচরণ শিখতে হবে নইলে পশ্চিম বাংলায় বিনিয়োগ বন্ধ, তাদের মধ্যে মাত্র একটি মাঝারি গোছের প্রতিষ্ঠান ছাড়া, কেউ কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের ক্ষীণতম প্রতিবাদও করেননি সেই পঁয়ত্রিশ বছর আগে।

যেমন করেননি বীরেন মুখুজ্যে, স্যার বীরেন মুখুজ্যে, যেমন করেননি পশ্চিম বাংলার রূপকার বিধান রায় মশাই। 'দিল্লিতে ওরা ওদের মতো ক'রে করে করুক, আমি ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমার মতো ক'রে করবো' : উত্তম পুরুষে সর্বদা কথা বলতেন বিধানবাবু, তাঁর সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হবার সাহসসম্পন্ন এমন-কেউই ছিলেন না আশেপাশে, দলের অন্য নেতারা তাঁর কাছে নিজেদের চিন্তাভাবনা পর্যন্ত গচ্ছিত রেখেছেন, আমলারা তো কোন্ ছার। মাশুল সমীকরণের ঘোষণায় তাই কোনো উত্তেজনা বইল না, পূর্ণিমা নিশীথিনীসম নীরবতা। চারদিকে পরম প্রশান্তি, শুধু বোম্বাইতে কোনোক্রমে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা, 'ইকনমিক উঈকলি', চালান শচীন চৌধুরী, অস্থির। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধ'রে, একা, সম্পাদকীয় লিখে যাচ্ছেন মাশুল সমীকরণ নীতির প্রয়োগে পূর্বাঞ্চলের কী সর্বনাশ ঘটবে। বীরেন মুখুজ্যের মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে মার্টিন বার্ন কোম্পানির সর্বময় কর্তাকে দু-একবার বোঝাবার চেষ্টা করলেন এই নীতির পরিণাম তাঁর, স্যার বীরেন মুখুজ্যের, নিজের সংস্থার পক্ষেও কী মারাত্মক হবে, কিন্তু উঁচা সাপ্তাহিক পত্রিকার ধুতি-পরা সম্পাদকের প্রলাপ কে শোনে।

শচীন চৌধুরীর অনুজরা তখন অধিকতর বিখ্যাত। মেজো দেবু চৌধুরী মার্কিন কোম্পানির মস্ত কাজ ছেড়ে কলকাতায় স্বাধীন ব্যাবসায় নেমেছেন, সেজো হিতেন চৌধুরী বোম্বাইতে কিংবদন্তীপুরুষ চলচ্চিত্র প্রযোজক, শ্রীমতী কামিনী কৌশলের নামের সঙ্গে জড়িয়ে তাঁকে নিয়ে অনেক রোমান্টিক গালগল্প, সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা শঙ্খ চৌধুরী রামকিঙ্কর বেইজের অতিঅন্তরঙ্গ সখাসহচর, ভাস্কর হিশেবে দেশে-বিদেশে ইতিমধ্যেই নাম কুড়িয়েছেন। অন্য দিকে শচীন চৌধুরী প্রায় উঞ্ছজীবী, উড়নচণ্ডী স্বভাব, অনেক ঘাটের জল খেয়ে অবশেষে অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকার উদ্যোগ নিয়েছেন, প্রবীণ অর্থনীতিবিদরা তাঁর সঙ্গে একটু পিঠ-চাপড়ানো আচরণ করেন, বাচ্চা অর্থনীতিবিদরা তাঁর কাগজে লিখে হাত পাকায়, ইকনমিক উঈকলি তখনো, বলা চলে, কুটিরশিল্প, তেমন বিজ্ঞাপন নেই, নুন আনতে পান্তা ফুরোয় অবস্থা।

মাশুল সমীকরণ নীতি ঘোষণায় বিচলিত শচীন চৌধুরী, যদিও কপর্দকহীন, নিজের গাঁট থেকে পয়সা বের ক'রে কলকাতার টিকিট কাটলেন, ১৯৫৭ সালের বসন্ত ঋতু, এখনো যদি বিধানবাবুকে দিয়ে নতুন দিল্লিতে ফের দরবার ক'রে ঐ সর্বনেশে নীতি পাল্টানো যায়, দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলের স্বার্থে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী

টি. টি. কৃষ্ণমাচারি, জবাহরলাল নেহরুকে ভুজুং-ভাজুং বুঝিয়ে নতুন ব্যবস্থাটি চালু করেছেন, কিন্তু বিধানবাবুর রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেক বেশি, তিনি যদি এখনো বেঁকে বসেন, হয়তো পণ্ডিত নেহরুকে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে রাজি করানো যেতে পারে।

কা কস্য পরিবেদনা। মাশুল সমীকরণের মতো আলতু-ফালতু ব্যাপার নিয়ে বিধানবাবু মাথা ঘামাতে আদৌ রাজি নন। তিনিও বিচলিত-উত্তেজিত। শচীন চৌধুরীকে লক্ষ্য ক'রে তাঁর প্রতি-আক্রমণ: 'আপনারা মশাই বম্বে-দিল্লি ঘুরে বেড়ান, ওয়েস্ট বেঙ্গলের জন্য কিচ্ছু করছেন না, এই তো দেখুন কী ভয়ংকর ব্যাপার হ'তে যাচ্ছিল, আর-একটু হ'লে একটা আপ্‌কান্ট্রি ট্রাম কণ্ডাক্টার আমাকে ভোটে হারিয়ে দিচ্ছিল, আপনারা এ-সব নিয়ে একটুও ভাবছেন না। ভাবুন, লিখুন ওয়েস্ট বেঙ্গলের গ্রোথ নিয়ে, ফ্রেইট ইকুইলাইজেশনের মতো এলেবেলে ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে কী হবে'? জমিদারি মেজাজের মানুষ, বিধানবাবু অন্যকে বিশেষ কথা বলার সুযোগ দিতেন না। 'জবাহরলাল আর মাদ্রাজিটার সঙ্গে আমার তো কথা হয়ে গেছে, ওরা তো আমাকে দুর্গাপুর দিচ্ছে, ফ্রেইট ইকুইলাইজেশন ওদের ব্যাপার, ওরা দেখুকগে'। শচীন চৌধুরী বেশ কয়েকবার বোঝাবার চেষ্টা করলেন মাশুল সমীকরণের সর্বনাশসাধনকারী পরিণাম কী হ'তে পারে, পশ্চিম বাংলার উন্নতি কতটা ব্যাহত হবার আশঙ্কা। কিন্তু একবগ্‌গা মানুষ বিধানবাবু, যা প্রথমবার বোঝেননি তা আদৌ বুঝবেন না। কোনোরকম পাত্তা না পেয়ে, ব্যর্থমনোরথ, বোম্বাইতে ফিরে গেলেন শচীন চৌধুরী। হাত ঘোরালে নাড়ু দেবো, নইলে নাড়ু কোথায় পাবো। বিধানবাবু হাত ঘোরাতে রাজি হলেন, একপেশে মাশুল সমীকরণ মেনে নিলেন, 'সেই মাদ্রাজিটা'—অর্থ মন্ত্রী কৃষ্ণমাচারি—দুর্গাপুরের জন্য ছিঁটে-ফোঁটা অর্থ বরাদ্দ ক'রে দিলেন। পশ্চিম বাংলায় আর-একটি ইস্পাত কারখানার পত্তন হলো ঠিকই, কিন্তু ইস্পাতের চাহিদার উৎস যে-এঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, তার ভবিষ্যৎ যে সঙ্গে-সঙ্গে এই অঞ্চলে শেষ ক'রে দেওয়া হলো, পশ্চিম বাংলার রূপকার, আলতু-ফালতু ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর যাঁর সময় নেই, বুঝতে চাইলেন না, অথবা বুঝতে পারলেন না। অবশ্য অন্য ব্যাপার নিয়ে উত্তেজিত থাকবার তাঁর কারণ ছিল: সদ্য-অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনে বিধান রায় মশাই কলকাতার বৌবাজার কেন্দ্র থেকে সত্যি-সত্যি হেরে যাচ্ছিলেন। হেরে যাচ্ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী, তাঁর ভাষায় 'আপ্‌কান্ট্রি ট্রাম কণ্ডাক্টার', কমরেড মহম্মদ ইসমাইলের কাছে। ইসমাইল সাহেব কোনোদিন ট্রাম চালিয়েছিলেন কিনা আমার জানা নেই, তবে ট্রাম শ্রমিকদের মজবুত সংগঠন তৈরি করেছিলেন, সেই গোড়া থেকে, কানপুরের দেহাত থেকে আসা স্বল্পবিত্ত পরিবারের মানুষ, সুতরাং বিধানবাবুর বর্ণনায় অতি-শয়োক্তি থাকলেও হয়তো তা তেমন মারাত্মক ছিল না। আর এটা তো ঠিক তিনি ই মাইল সাহেবের কাছে ভোটে বলতে গেলে প্রায় হেরেই গিয়েছিলেন।

ভোটগণনা হয়েছিল জাদুঘরের দালানে, সারাদিন ধ'রেই বিধানবাবু পিছিয়ে, ইসমাইল সাহেব এগিয়ে, জনগণের বাঁধভাঙা জয়োল্লাস। ভোট গোনা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। নির্বাচনে-কর্তব্যরত সরকারি কর্মচারীদের পোস্টাল ব্যালটের গণনা শুধু বাকি, এমন মুহূর্তে, জনপরিবাদ, কলকাতার-নতুন দিল্লির সংগোপনতম-সুউচ্চতম মহলে টেলিফোনে সাংকেতিক তারবিনিময়ে কী শলাপরামর্শ হলো, হঠাৎ জাদুঘরের দালানে আলো নিভে গেল, নিষ্প্রদীপ, যা তখনকার সময়ে অকল্পনীয়-অভাবনীয়। খানিক বাদে যখন আলো ফিরে এল, পোস্টাল ভোটের কাগজপত্র-গুলি যেন একটু বেশি গোছানো, একটু অন্যরকম; বিধানবাবু পাঁচশো ভোটে জিতে বেরিয়ে গেলেন, পুলিস ব্যারাকের যে-সব পোস্টাল ভোট তাঁকে জিতিয়ে দিল সেগুলি আসল না জাল তা এখন একমাত্র ঐতিহাসিক গবেষণারই আকর হ'তে পারে।

শচীন চৌধুরী বিধানবাবুকে বোঝাতে অসমর্থ হয়েছিলেন, মাশুল সমীকরণ নীতির ফলে পশ্চিম বাংলায় শিল্পসংকট আরো ঘনীভূতই হবে, বামপন্থীদের প্রভাব আরও ছড়াবে, মহম্মদ ইসমাইলের মতো আরো অনেক 'আপ্‌কাণ্টি ট্রাম কণ্ডাক্টার' শ্রমিকদের ব্যূহবদ্ধ করবার সুযোগ পাবেন। জটিলতার ধার ধারতেন না পশ্চিম বাংলার রূপকার, দুর্গাপুরের চুষিকাঠি হাতে পেয়ে দারুণ খুশি। কয়েক বছর বাদে খোদ মার্কিন দেশে গিয়ে প্রেসিডেণ্ট কেনেডিকে পর্যন্ত একই আর্জি জানিয়ে এলেন : 'আপনারা পশ্চিমের দেশগুলি পশ্চিম বাংলার জন্য কিছু করছেন না, বুঝতে পারছেন না কী ভীষণ বিপদ, ঐ যে কী একটা দ্বীপ, হ্যাঁ, কিউবা, সেই কিউবার মতোই আমার ওয়েস্ট বেঙ্গলেও হুড়মুড় ক'রে কমিউনিস্টরা এসে যাবে। এই তো দেখুন না, একটা আপ্‌কাণ্টি ট্রাম কণ্ডাক্টার আর-একটু হ'লে ভোটে আমাকে পর্যন্ত হারিয়ে দিচ্ছিল'। বিমূঢ় জন কেনেডি, পাশে উপবিষ্ট সহকারীকে ফিশফিশ করে তাঁর প্রশ্ন : 'আপ্‌কাণ্টি ট্রাম কণ্ডাক্টার' বস্তুটি কী?

ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন বিধানবাবু, কমিউনিস্টরা হুড়মুড় ক'রে পশ্চিম বাংলার সত্যিই দখলদারি নিয়েছে। মার্কিন দেশ থেকে ফেরার কিছুদিনের মধ্যেই, তাঁর জন্মদিনেই. বিধানবাবু গত হলেন, ইসমাইল সাহেব প্রয়াত হলেন মাত্র কয়েকমাস আগে। পশ্চিম বাংলার রূপকার বিধান রায় মশাই রাজনীতির মানুষ। কিন্তু অর্থ-নীতির সঙ্গে রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে তবু কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না তাঁর, তাঁর তথা পশ্চিম বাংলার, বিপর্যয়ের হেতু 'আপ্‌কাণ্টি ট্রাম কণ্ডাক্টার'টি। প্রাদেশিক সংকীর্ণমন্যতা, সেইসঙ্গে শ্রেণীদম্ভ, সব-কিছু জড়িয়ে এক পরম কূপমণ্ডুক বৃত্তে রোমন্থন।

তবে, আমার ঘাড়ে ক'টা মাথা, এবংবিধ প্রসঙ্গ নিয়ে বিস্তৃত হই, বিধানবাবু, কে না জানে, এই রাজ্যের রূপকার।

এ-পৃথিবী একবার পায় তারে

পৃথিবী আমাদের পদতলে, দিগ্বিজয়ী, হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছি আমরা : এ-রকম অনুভব প্রত্যেকেরই জীবনে একবার-দু'বার হয়তো আসে। মুখ থুবড়ে প'ড়ে আছে যে, বহুবিধ সামাজিক অত্যাচার-অনাচারের ভুক্তভোগী, বোধহয় তার জীবনেও আসে, অন্তত একবার-দু'বার। হয়তো নিছক ভ্রান্তিবিলাস, হয়তো পরিবেশ-পরিপার্শ্বকে একটু বেশি আশাবাদী হয়ে বিশ্লেষণ, কিন্তু অন্তত কয়েকটি কচিৎ মুহূর্তের জন্য হ'লেও, রবীন্দ্রনাথ যে শেষ কথা ব'লে গেছেন, আমরা চলি সমুখপানে কে আমাদের বাঁধবে, তাঁর অভিজ্ঞানে অবগাহন।

চৌত্রিশটি বছর গড়িয়ে গেছে, অথচ প্রতিটি আনুষঙ্গিক ঘটনা-প্রতিঘটনা এখনো স্পষ্ট। ১৯৫৭ সালের মার্চ মাস, দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন, লোকসভা ও সেই সঙ্গে বিধানসভাগুলির জন্যও। উত্তেজনায় কাঁপছি আমরা, কেরল রাজ্য থেকে নির্বাচনের ফল আসতে শুরু করেছে, যে-অখণ্ড ঐক্য কেরলের জন্য ঐ প্রান্তের মানুষ ও পার্টি লড়াই ক'রে এসেছে এত-এত বছর ধ'রে, ঢেউয়ের পর ঢেউ, অগণিত জাঠা-ধর্মঘট-বন্‌ধ্-গণআন্দোলন, সেই স্বপ্নের ঐক্য কেরল বাস্তবে রূপায়িত, তার বিধানসভার প্রথম নির্বাচন। প্রায় প্রতিটি জেলা থেকে পার্টির প্রার্থীদের বিভিন্ন কেন্দ্রে বিপুল জয়লাভের খবর আসতে শুরু হয়েছে। এমনটা সারা বিশ্বে এর আগে নাকি কখনো ঘটেনি, 'গণতান্ত্রিক' নিয়মে ভোট হয়েছে, বহুদলীয় নির্বাচনী ব্যবস্থা, রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষ তাঁদের স্বাধীন চিন্তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে পৌঁছে ভোট দিয়েছেন, অথচ যা নাকি ছিল অভাবনীয়, স্বাধীনতা-প্রেমিক গণতন্ত্র-আসক্ত মানুষগুলির কী মাথা খারাপ হয়ে গেছে যে হতচ্ছাড়া স্বাধীনতাখেকো কমিউনিস্টদের ভোট দেবেন, কিন্তু কেরলে তাই হ'তে যাচ্ছে, পার্টির প্রার্থীরা 'স্বাধীন-গণতান্ত্রিক' নির্বাচনে একটির পর একটি আসনে ক্রমান্বয়ে বিজয়ী ঘোষিত হচ্ছেন, উত্তেজনায় আমরা কাঁপছি, জয়ের গৌরবে, চরিতার্থতার গর্বে হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছি।

সর্বসাকুল্যে কেরল বিধানসভায় একশ ছাব্বিশটি আসন, গরিষ্ঠতা পেতে তাই অন্তত চৌষট্টিটি আসনে জয়ের প্রয়োজন। তেষট্টি আসনে পার্টি ও পার্টি-সমর্থিত নির্দল প্রার্থীরা জয়ী ব'লে ঘোষিত, মাত্র একটি কেন্দ্রে ফলাফল বাকি, সেখানে পার্টি-সমর্থিত নির্দল প্রার্থী। নতুন দিল্লির কনট প্লেসে আমরা কয়েকজন এক বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বিক্রেতার দোকানের বাইরে উৎকণ্ঠ অপেক্ষামাণ, গোধূলির আলো ফিকে হয়ে আসছে, হঠাৎ বেতারে খবর, আমাদের প্রার্থী জয়ী, কমিউনিস্ট

পার্টিকে রাজ্য সরকার গঠন করবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে, ইতিহাসে যা নাকি অভূতপূর্ব। অবশ্য ইতালিতে, আল্‌প্‌স্ পর্বতমালার সানুদেশে, সান্ মেরিনো নামে এক আধা-শহর আধা-গ্রাম, কোনো নিগূঢ় ঐতিহাসিক কারণে উক্ত জনপদ অর্ধ-স্বাধীন, ইতালি সরকার সান্ মেরিনোর কর্তৃপক্ষকে স্বাধীন সরকারের মর্যাদা দিয়ে এসেছেন বরাবর। যখনই জনপ্রতিনিধি বাছাইয়ের জন্য সান্ মেরিনোতে গণতান্ত্রিক ভোট হয়েছে, সেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে, প্রতিবারই পার্টির প্রার্থীরা জিতেছেন, ঐ খুদে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সান্ মেরিনোতে মাত্র কয়েকশো নাগরিক, আর কেরলে যা ঘটল তা লক্ষ-লক্ষ মানুষের অন্তঃস্থিত অভিজ্ঞতার-অনুভূতির অভিব্যক্তি, কাইয়ুর-ভাইলুরের শহিদ কমরেডদের আত্মাহুতিকে অভিবাদন জানাল কেরলের জাগ্রত জনগণ। বেতারে খবরটি প্রচারিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে রিগ্যাল সিনেমা ঘরের সামনে, সায়ংকালীন ট্র্যাফিক আটকে, আমাদের কয়েকজন সরব সনৃত্য আস্ফালন, আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছি যেন সবাই, অচিরে কৌতূহলী অনুরাগী জনতার ভিড় আমাদের ঘিরে।

দু'সপ্তাহ যেতে-না-যেতে, কমরেড ই. এম. এস. মুখ্য মন্ত্রী, অচ্যুত মেনন অর্থ মন্ত্রী, আমাদের সরকারকে দিন কয়েকের মধ্যেই বাৎসরিক বাজেট দাখিল করতে হবে, দেশের প্রথম কমিউনিস্ট সরকারের প্রথম বাজেট, সাহায্য-পরামর্শ চাই, অবিলম্বে ত্রিবান্দ্রম পৌঁছতে হবে। কিন্তু, খবরদার, যেন জানাজানি না হয়, রাজ্যের বাইরে থেকে যে-কেউ গেলেই কংগ্রেস দল ও তার ধামাধরাদের কাছ থেকে চ্যাঁচামেচি শুরু হবে, ষড়যন্ত্র, ষড়যন্ত্র, বাইরে থেকে কমিউনিস্ট চর-অনুচরেরা আসছে, গাদা-গাদা দেশদ্রোহী, কেন্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে ব্যবস্থা নিক! সুতরাং ত্রিবান্দ্রমে পৌঁছতে হবে চুপি-চুপি, অতি সংগোপনে। এমনকি প্লেনের যে-টিকিট আমার হাতে ধরিয়ে দেওয়া হলো, তাতেও টিকিটধারীর নাম এম. বিশ্বনাথন্ কিংবা ঐ ধরনের কোনো-কিছু।

আমার দিক থেকে গোপনতার বাড়তি কারণ ছিল। কাজ করি নতুন দিল্লিতে সদ্য-সংগঠিত এক গবেষণা সংস্থায়, যার বড়ো কর্তা সতত লোহিতাতঙ্কে ভোগেন। ঘোর অনৃতভাষণ করতে হলো, স্ত্রী কলকাতায় গুরুতর অসুস্থ, এক সপ্তাহ তাই অনুপস্থিত থাকব। কলকাতা পুবে, ত্রিবান্দ্রম নিরেট দক্ষিণে। মাদ্রাজে পৌঁছে, সেখান থেকে ফের ত্রিবান্দ্রমের বিমান পাকড়ানো। ভারতীয় বিমান সংস্থার তখন যা ব্যবস্থা ছিল, দিল্লি, বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ থেকে সন্ধ্যার একটু বাদে যাত্রী-ডাক-মাল বোঝাই হয়ে চারটি বিমান নাগপুর রওনা হয়ে যেত, মাঝরাত্তিরে নাগ-পুরে পৌঁছে যাত্রী-ডাক-মাল *অদল-বদল* করা হতো, প্রত্যুষে যে-যার গন্তব্যস্থলে। পালাম পৌঁছেই বিপদের গন্ধ। এক পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে মুখোমুখি, শ্রী তিরুভেঙ্কটাচারি, মাদ্রাজের অ্যাডভোকেট জেনারেল, তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা যে-সংস্থায় আমি কাজ করি তার সঙ্গে যুক্ত। তিরুভেঙ্কটচারি কী কাজে দিল্লি এসে-

ছিলেন, এখন মাদ্রাজ ফিরছেন। আমি কোথায় যাচ্ছি জিজ্ঞেস করাতে, সাবধানের মার নেই, বলতে হলো কলকাতা। নাগপুর পর্যন্ত কোনো সমস্যা নেই, আলাপ করতে-করতে যাওয়া গেল।

নাগপুরে নেমেই আমি গা-ঢাকা। আমাকেও মাদ্রাজগামী বিমানে চড়তে হবে, কিন্তু তিরুভেঙ্কটাচারি যাতে দেখতে না পান। ভাগ্যি ভালো, বিমানের সামনে-পিছনে দুই দরজাতে সিঁড়ি, উনি সামনের দরজা দিয়ে উঠলেন ; শরীর নিচু ক'রে, পাতলা শাল দিয়ে মুখ ঢেকে পেছনের দরজা দিয়ে আমার অনুপ্রবেশ। কিন্তু মুশকিল তো অত চট ক'রে আসান হবার নয়। আমার আসন নির্দেশ করা হলো তিরুভেঙ্কটাচারি যেখানে উপবিষ্ট, ঠিক তার তিনটি আসন পরে। বিমান আকাশে উঠল, যদিও এক সময় বিমানের অভ্যন্তরে কড়া আলোগুলি নিভল, তথাচ আমি তটস্থ, আমি বিনিদ্র, আমার কোজাগর রাত্রি। নজর খাড়া রাখছি, তিরুভেঙ্কটাচারি বেঁটে-মোটা মানুষ, মাথা জুড়ে প্রকাণ্ড টাক, যতবার সেই টাক উঠছে, তিরুভেঙ্কটাচারি হয়তো উঠে দাঁড়াচ্ছেন, কিংবা পিছনের দিকে তাকাচ্ছেন, আমি আসনের সামনে ঝুঁকে প'ড়ে বিলুপ্ত হবার চেষ্টা করছি, উনি বসছেন, আমি ফের সোজা হচ্ছি। এ-রকম তিন-চারবার কসরতের পর পাশে-বসা সহযাত্রীর কৌতূহল, তাঁকে বলতে হলো, পকেট থেকে একটা কলম নিচে গড়িয়ে গেছে, খুঁজছি।

প্রতিটি অমা রাত্রি প্রভাত হয়, অবশেষে বিমান মাদ্রাজের মাটি ছুঁল, তিরুভেঙ্কটাচারি কর্তৃক অনাবিষ্কৃত রইলাম আমি। বিমান থেকে তিনি নিষ্ক্রান্ত হবার বেশ খানিকটা পরে, প্রায় সব শেষে, আমার অবরোহণ, মস্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস। ঘণ্টা তিনেক বাদে ব্যাঙ্গালোর-কোয়েম্বাটোর-ত্রিবান্দ্রমের ছোটো বিমান, থেমে-থেমে, ঝিকোতে-ঝিকোতে যাওয়া, ত্রিবান্দ্রমে পৌঁছুতে প্রায় বিকেল।

পার্টির রাজ্য সম্পাদক কমরেড এম. এন. গোবিন্দন নায়ার, তাঁর সাবধানের মার নেই, আমাকে তোলা হলো শহরের উপকণ্ঠে এক নির্জন সার্কিট হাউসে। ঐ একই কাজে সাহায্য করার জন্য আগেই পৌঁছে গেছেন ইকবাল সিং গুলাটি, যে এখন কেরল রাজ্য পরিকল্পনা বোর্ডের সহ-সভাপতি। এক সপ্তাহ ধ'রে আমাদের অনেক স্বপ্নালু আলোচনা, অনেক উদ্ভট খশড়া তৈরি, অনেক খশড়া আবার নতুন ক'রে লেখা। হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছি আমরা, স্বাধীন গণতান্ত্রিক নির্বাচনে কেরলের জনগণ আমাদের পার্টিকে বরণ ক'রে নিয়েছে, এবার আমূল ভূমি সংস্কার হবে, ভূমিহীন লড়াকু কৃষকেরা এক ছটাক-দুই ছটাক ক'রে হ'লেও প্রতিজন জমির দখল পাবে, তাদের জন্য সেচের আলাদা ব্যবস্থা হবে, সরকার থেকে তাদের পুরনো ঋণ মকুব ক'রে দেওয়া হবে, নতুন ঋণ ও ভরতুকির বন্দোবস্ত হবে। রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে মুনাফাখোরদের খপ্পর থেকে মুক্ত করতে হবে, রাজ্যের বিচার ব্যবস্থা পাল্টাতে হবে, সমস্ত রাজবন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে, কেরলের কমিউনিস্ট পার্টির সরকার গোটা দেশকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে

দেবে সৎ আত্মত্যাগী আদর্শনিষ্ঠ পার্টির মন্ত্রীরা জনকল্যাণের ক্ষেত্রে, সংবিধানের সহস্র বাধাবন্ধন সত্ত্বেও, কী জাদু ঘটাতে পারে। যে-কমরেড ই. এম. এস. দু'দিন আগেও ফিরোজশাহ্ রোডের কমিউনে আমাদের সঙ্গে তত্ত্বালাপ ও বিশ্বরাজনীতি নিয়ে নিবিড় আলোচনা করেছেন, যাঁর সময়ের উপর আমাদের অঢেল অধিকার ছিল ব'লে মনে করতাম, তিনি মুখ্য মন্ত্রীর সরকারি বাসস্থান ক্লিফ্ হাউসে অধিষ্ঠিত। একজন কমিউনিস্ট মুখ্য মন্ত্রীর জীবনযাত্রা কত শাদামাটা হ'তে পারে, ই. এম. এস. তা দৃষ্টান্তিত করেছেন, ক্লিফ্ হাউসের ঐতিহ্য স্তম্ভিত। সাত সকালে দেখা করতে গেছি, একটা-দুটো ব্যাপারে তাঁর অভিমত জানবার জন্য, কাতারে-কাতারে সাধারণ মানুষ ইতিমধ্যেই ভিড় করেছে, অথচ সময় ক'রে নিচ্ছেন প্রত্যেকের জন্য, পাশে তাঁর সর্বকনিষ্ঠ সন্তান, আড়াই বছরের বাচ্চা ছেলে শশী, খেলনা নিয়ে নিজের মনে খেলা করছে।

বাজেটের যে-খশড়া তৈরি করেছিলাম আমরা দু'জনে মিলে, স্মৃতিতে তা হারিয়ে গেছে। কিন্তু, ১৯৫৭ সালের বসন্তের ঐ কয়েকটা দিন আমরা স্বপ্নলোকে ভেসে বেড়িয়েছিলাম, মানুষের জীবনে সম্ভবত মাত্র একবারই ঐ ধরনের পারিজাত প্রব্রজ্যার মতো ঘটনা ঘ'টে থাকে।

এক সপ্তাহ বাদে স্বর্গ থেকে প্রত্যাবর্তন। এম. বিশ্বনাথনের নামে টিকিট, ত্রিবান্দ্রম বিমানবন্দরে মাল জমা দিয়ে বোর্ডিং পাস নিয়ে রেস্তরাঁয় অপেক্ষা করছি, পুলিশ-পুলিশ গন্ধওলা এক মানুষের সহসা আবির্ভাব। বিদায়-জানাতে-আসা কমরেডটির ফিশফিশ সতর্ক উচ্চারণ, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের চর। মালয়ালম্, তেলুগু, কন্নড়, তামিল পর-পর সব ক'টি ভাষায় চরটি আমাকে সম্ভাষণ করছেন, আমার তা বোঝার উপায় নেই, অবশেষে ভদ্রলোকের সন্দেহ প্রগাঢ়, 'মিস্টার বিশ্বনাথন্, আপনার মাতৃভাষা কী'? বিদায়-জানাতে-আসা কমরেডটি কোনোক্রমে সামাল দিলেন, উত্তর ভারতে মানুষ হয়েছি আমি, মাতৃভাষা যদিও মালয়ালম্, বলতে-বুঝতে কষ্ট হয় আমার, তবে ডাক-তার-টেলিফোনব্যবস্থা যেহেতু সেই প্রাগৈতিহাসিক কালে তেমন নিখুঁত ছিল না, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাবাহিনী মাদ্রাজে কি নতুন দিল্লিতে এম. বিশ্বনাথনের হদিশ ক'রে উঠতে পারেনি শেষ পর্যন্ত।

জীবনে একবারই তো আমরা আকাশে ভেসে বেড়াই, বাজেট রচনার মতো নীরস ব্যাপারের সঙ্গে আমার সেই স্বপ্নসুখের অনুভূতি। দুই যুগের ব্যবধান মাঝখানে, কিন্তু এখনো মাঝে-মাঝে ফিরে যাই রিগ্যাল সিনেমার সামনে, সেই সায়ংকালীন ভিড়ে আমাদের পরম বিজয়োল্লাসের মুহূর্তে।

স্বাধীনতার স্বাদ

বঙ্কিমবাবুর লাঠির মতো, সমাজতন্ত্রেরও নাকি দিন গিয়েছে ; খোদ সোবিয়েত দেশ থেকেই এবার ঐ ভূত তাড়াবার ব্যবস্থা, বাঘা-বাঘা সাংবাদিকরা মস্কো চ'লে গিয়ে প্রত্যক্ষ অবলোকন করছেন লেনিন-স্তালিনের মূর্তিটুর্তিগুলি কী ক'রে টেনে নামানো হচ্ছে, কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ, লাল ঝাণ্ডা ওড়াতে গেলেই গারদে পুরে দেওয়া হবে, স্বাধীনতার ভেঁপু বাজতে শুরু করেছে যে।

এরই মধ্যে একটু বেমানান খবর, চার বছর বাদে-বাদে উত্তর-দক্ষিণ দুই মার্কিন মহাদেশ জুড়ে খুদে অলিম্পিক, পঁচিশ-তিরিশটি দেশ থেকে প্রতিযোগী-প্রতিযোগিনীরা এসে জড়ো হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অত বড়ো দেশ, স্বভাবতই অন্যান্য দেশের চেয়ে কুশলতায়-নৈপুণ্যে-কৃতিত্বে বরাবরই অনেক এগিয়ে থাকে। এ বছর অবাক কাণ্ড। পদকের গুন্‌তিতে, বিশেষ ক'রে স্বর্ণপদকের গুন্‌তিতে, কিউবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পিছনে ফেলে দিয়েছে। মস্কোর রাস্তায় মার্কিনদের বিজয়োৎসব, সমাজতন্ত্রের নাকি দিন গিয়েছে, কিন্তু আমেরিকার দুই মহাদেশ জুড়ে এ-সপ্তাহে উত্তেজনার কারণ অন্য : ইয়াঙ্কিরা হেরে গিয়েছে অলিম্পিয়াডে, হারিয়ে দিয়েছে ঐ খুদে দেশ, সমাজতন্ত্রে দীক্ষিত দেশ, কিউবা, ওখানকার ছেলেমেয়েরা খেলাধুলোর ক্ষেত্রে অন্তত প্রমাণ ক'রে ছেড়েছে সমাজতন্ত্রের দিন শেষ ব'লে যাঁরা দাবি করছেন, তাঁরা হয়তো একটু বাড়িয়ে বলছেন, একটা-কিছু জাদু সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, এখনো আছে। এমনকি যে-বিশেষ খেলা মার্কিনদের কাছে ডাল-ভাত, তাদের প্রশ্বাসের মতো, সেই বেইস বলে পর্যন্ত তারা কুপোকাত কিউবার দলের কাছে।

আসলে আমার মতো আকাট যারা, পঞ্চাশ বছর যে-স্বপ্নের মধ্যে নিজেদের আচ্ছন্ন রেখেছি, নিজেদের মনের মাধুরী দিয়েই সেই স্বপ্নকে লালন ক'রে এসেছি, এবং শেষ-ঘণ্টা-বেজে-গেছে ইত্যাকার সংবাদপত্রের সুগম্ভীর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ সত্ত্বেও লালন ক'রে যাবোই। স্বপ্ন বলছি, অথচ স্বপ্ন না, মায়া না, মতিভ্রম না, ছোট্ট দ্বীপের দেশ কিউবায় গিয়ে মনে হয়েছিল হ্যাঁ, পৌঁছে গেছি, মনে-মনে এমনটাই তো চেয়েছিলাম। এমন দেশ যেখানে সাধারণ মানুষ নেতাদের সঙ্গে সদাসর্বদা কথা বলতে পারেন, নেতাদের বকাঝকা করতে পারবেন, আবার নেতাদের কোনো বিশেষ সিদ্ধান্ত পছন্দ হ'লে দু'গালে চুমুও খেতে পারবেন, এমন দেশ যেখানে দুঃখ-অস্বাচ্ছন্দ্যগুলি সকলের মধ্যে ভাগ ক'রে নেওয়া হয়, সুবিধা-গুলিতেও সকলের সমান অধিকার, তা-ই তো সমাজতন্ত্র। এমন দেশ, যেখানে

সব সময় স্পষ্ট কথা বলবো, হৃদয় খুলে নাচবো-গান গাইবো-হাততালি দেবো, কারো আচরণ পছন্দ না হ'লে অকপটে সমালোচনা করবো তার কাঁধে বন্ধুতার হাত রেখে। দৈন্যকে ভাগ ক'রে নিলেই তার দুঃসহভার বহুলাংশে ক'মে আসে, আনন্দকে বিলি ক'রে নিলে তা শতগুণে বেড়ে যায়, আর কোথাও হোক না হোক, কিউবায় তা অন্তত দৃষ্টান্তিত হয়েছে। বর্ণভেদের বালাই নেই, কারো চামড়া ঘন কুচকুচে কালো, কারো শাদা, কারো তামাটে, কিন্তু কিউবার প্রতিটি মানুষ যেন এই বর্ণচেতনার বাইরে। রবীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দ প্রভৃতি কবিকুল আমাদের, মানে বাঙালিদের, মাথা খেয়েছেন, আমরা সর্ব ব্যাপারে বস্তু অতিক্রম ক'রে তার চিত্রকল্প খুঁজি, যে-কোনো বিস্তৃত বিন্যাসকে একটি সীমাবদ্ধ চৌহদ্দির মধ্যে পাকড়ে ধরতে চাই। সমাজতন্ত্র আমার ব্যক্তিগত অভিধানে যেমন কিউবার উদাহরণে নন্দিত, অনুরূপভাবে কিউবার চিত্রকল্প হিশেবে আমার মানসপটে একটি উনিশ-কুড়ি বছরের টগবগে মেয়ে, যাকে হাভানায় কোনো-এক মে দিবসের উৎসবে ডানামেলা পাখির মতো নিজেকে ছড়িয়ে দিতে দেখেছিলাম। মেয়েটির নাম, যতদূর মনে পড়ছে, অ্যালিসিয়া, কৃষ্ণকায়া, মে দিবস, তার উৎসবের পোশাক, কানে ঝুলিয়ে দুল পরেছে, চুলে পাতাবাহারি রুমালের শিথিল বন্ধন, হাভানার বিরাট-বিশাল বিপ্লব চত্বর, থরে-থরে আসন সাজানো, বক্তৃতা-গান-নাচ-বাজনা-আতসবাজি, অ্যালিসিয়া নাচছে, দুলছে, হেলছে, হাসছে, একবার উপরে ছুটে আসছে কেন্দ্রীয় কমিটির কোনো নেতাকে কানে-কানে কী একটা বলবার জন্য, পরক্ষণে নিজের শরীরটাকে বেপরোয়া উৎসাহে ছুঁড়ে দিয়ে একবার নিচে নেমে যাচ্ছে, আখের টুকরো কিনে নিয়ে মুখে পুরছে, দাঁড়িয়ে প'ড়ে জনৈক পরিচিতের সঙ্গে দুর্দান্ত রসিকতা করছে, তার আনন্দকে বিস্তৃত ক'রে দিচ্ছে ঐ সুবিশাল মুক্তাঙ্গন জুড়ে।

এই আনন্দকে ভাগ ক'রে দিতে পারার আনন্দ, ভাগ ক'রে নিতে পারার আনন্দ, সবাইকে সমতায় নিয়ে এসে আবির পরাবার, দু'গালে আদর করবার, আলিঙ্গনে আপ্লুত হওয়ার আনন্দ। আনন্দ থেকেই দৃঢ়বদ্ধতা, সংকল্প, আদর্শাভিমান। হাজার-হাজার অ্যালিসিয়া গত তিরিশ-বত্রিশ বছর ধ'রে প্রতিরোধের পরিখা পাহারা দিয়ে যাচ্ছে ব'লেই কিউবা এখনো, প্রায় একা, মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। এমন নয় যে সেই দেশের নেতারা ভুলভ্রান্তি করেননি, কখনো-কখনো তাঁদের যুক্তিতে বাস্পাধিক্য অনুপ্রবেশ করেনি, এখানে-ওখানে সিদ্ধান্তের অপপ্রয়োগ ঘটেনি, কিন্তু সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ কদাচ শিথিল হয়নি, অ্যালিসিয়ারা যে-কোনো প্রহরে তাদের অভাব-অভিযোগ-অভিমানের কথা যথাস্থানে জানিয়ে আসতে পেরেছে, নেতারাও তাঁদের সমস্যার কথা খোলাখুলি জানিয়েছেন, সংকট সামলেছেন, ভুল করেছেন, কোনো বিশেষ সংকট অত চট্ ক'রে নিরসন কেন সম্ভব নয় তার কারণগুলি শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের জমায়েতে স্পষ্ট ব্যক্ত করেছেন। এমনি ক'রেই, বত্রিশ বছরের মার্কিন অবরোধ সত্ত্বেও, কিউবা টিকে থেকেছে, অ্যালিসিয়ারা

নেচেছে-হেসেছে-পরস্পরকে চুমু খেয়েছে, নেতাদের দু'গালে চুমু খেয়েছে; নেতাদের গাল পেড়ে ভূত ভাগিয়ে দিয়েছে ; সোভিয়েত সাহায্য হ্রস্ব থেকে হ্রস্বতর হয়েছে, মার্কিন অবরোধ অব্যাহত, কিন্তু কিউবা, একা হ'লেও, অবিজিত। আর এ-বছর, কী কাণ্ড, কী কাণ্ড, অমেরিকার দুই মহাদেশের ক্রীড়া অলিম্পিয়াডে কিউবার ছেলেমেয়েদের কাছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হেরে ঢোল।

সুতরাং কোন্ ব্যবস্থা ভালো, কোন্‌টা অসহ্য, কোন্‌টা টিকবে-অন্য কোন্‌টার ঘণ্টা বাজছে এ-সব নিয়ে আগ বাড়িয়ে কিছু না বলতে যাওয়াই নিরাপদ। তা ছাড়া এই মস্ত গৌরচন্দ্রিকা যে-ধারণারই জন্ম দিয়ে থাকুক না কেন, আসলে সমাজতন্ত্রের সমস্যা নিয়ে ঠিক মাথা ঘামাবার ইচ্ছা আমার নেই এই মুহূর্তে, আমার এই স্মৃতিবিবরণে যদিও কিউবাকে ঠিক কেটে বাদ দেওয়া চলবে না, তার উল্লেখ একান্তই উপলক্ষ হিশেবে। আমি তো আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথাই বলতে চেয়েছিলাম।

ষাটের দশকের শুরুর দিক। কয়েক বছর ধ'রে মার্কিন দেশে শিক্ষকতা করছি। পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে পরিকল্পনাবিদ-ধনবিজ্ঞানী রাজপুরুষরা আসেন, আর্থিক বিকাশের বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁদের তালিম দিতে হয়, তাঁরা কতটা শেখেন-বোঝেন বোঝা মুশকিল, তবে আমরা যারা পড়াই তারা অন্তত এ-সব দেশের সমস্যা সম্পর্কে খানিকটা বাড়তি অবহিত হই। অধ্যয়নের কর্মসূচিতে এটা নির্দিষ্ট, সমাগত ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে-মাঝে এখানে-ওখানে পরিভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হবে, উন্নয়নঘটিত নানা সমস্যা সম্পর্কে তাঁরা যাতে আরো একটু বিশদ ক'রে অবহিত হ'তে পারেন। ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাস, পনেরো-কুড়িটি দেশ থেকে আসা পড়ুয়াদের নিয়ে আমরা মার্কিন দেশের টেনেসি প্রদেশের নক্‌স্‌ভিল শহরে এসেছি, টেনেসি ভ্যালি অথরিটির কেন্দ্রবিন্দু নক্‌স্‌ভিল। আর্থিক মন্দার ভয়ংকর বছরগুলিতে কারখানার পর কারখানা বন্ধ, লক্ষ-লক্ষ বেকার, মার্কিন দেশ জুড়ে হাহাকার, রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে ফ্র্যাঙ্কলিন রোজভেল্ট টেনেসি ভ্যালি অথরিটির পত্তন করলেন, বিরাট কল্পনা, টেনেসি নদীতে বাঁধের পর বাঁধ জুড়ে সেচের ব্যবস্থা হবে, বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হবে, অথরিটির প্রস্তুতিপর্বে যে-অঢেল টাকা ঢালা হবে, যে-কর্মযজ্ঞ শুরু হবে তার প্রত্যক্ষ ফল হিশেবে প্রচুর নতুন কাজের সুযোগ তো হবেই, তা ছাড়া সেচ-বিদ্যুতের উৎপাদনব্যবস্থা সম্পূর্ণ হ'লে টেনেসিসহ বেশ কয়েকটি প্রদেশের চেহারা পাল্টে যাবে, কৃষিতে উৎপাদনবৃদ্ধির জোয়ার আসবে, শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদাও বাড়বে, শস্তা বিদ্যুতের ওপর নির্ভর ক'রে শিল্পের পর নতুন শিল্পের পত্তন ঘটবে। ঘটেও ছিল সে-রকম। মার্কিন দেশের অর্থব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন, যা সূচনা করেছিল টি. ভি. এ., তা দেখে আমাদের দেশেও ভাক্‌রা-নাঙ্গাল, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন-গোছের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলো। তবে তা তো অন্য কাহিনী, আমাদের আপাতত ফিরে যেতে হবে নক্‌স্‌ভিল শহরে, ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে। থমথমে অবস্থা, প্রেসিডেন্ট কেনেডি আগের বছর কিউবায় প্রতিবিপ্লব

ঘটাতে গিয়ে নাস্তানাবুদ হয়েছেন, এবার অনেক আঁটঘাঁট বেঁধে নেমেছেন, নিকিতা ক্রুশ্চেভকে শাসিয়েছেন যদি অবিলম্বে কিউবা থেকে পারমাণবিক বোমা সরিয়ে নিয়ে না যাওয়া হয়, তা হ'লে মুখোমুখি সংঘাত, এমনকি পারমাণবিক বোমার ব্যবহারসুদ্ধু, তাতে যদি পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যায়, হোক। থমথমে পরিস্থিতি, হঠাৎ সংকট শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছুল, গোটা মার্কিন দেশ জুড়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণা। সবাই প্রতীক্ষায়, সবাই প্রস্তুত হচ্ছেন মহাপ্রলয়ের জন্য। সমস্ত যানবাহন স্তব্ধ, অসামরিক বিমান চলাচল সরকারি আদেশনামায় বন্ধ। আমরা, পনেরো-বিশ, দেশ থেকে আসা ছাত্রদের নিয়ে, নক্‌স্‌ভিলে আট্‌কা প'ড়ে গেলাম। স্বাধীন, অবাধ, মুক্ত গণতন্ত্রের দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আলতু-ফালতু কিউবার মতো তো নয়, ও-রকম আলতু-ফালতু দেশ থাকারই কোনো মানে হয় না, সেজন্যই তো প্রেসিডেন্ট কেনেডি ব্যবস্থা নিচ্ছেন, যেমন ক'রে হোক কিউবাকে, সেই সঙ্গে ঐ যত-নষ্টের-গোড়া সোভিয়েত দেশটাকেও, কোণঠাসা করার। স্বাধীন, গণতান্ত্রিক দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তার পঞ্চাশটি প্রদেশের অন্যতম টেনেসি, সেই টেনেসি প্রদেশে নক্‌স্‌ভিল শহর! আমরা কুড়ি-পঁচিশ জন, অন্তত পনেরো-কুড়িটি দেশের মানুষ, অনেকেই কৃষ্ণবর্ণ, আফ্রিকার কিংবা ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছেন। শহরের সম্ভ্রান্ততম হোটেল, অ্যান্‌ড্রু জনসন হোটেল, ঐ প্রদেশ থেকে এ-পর্যন্ত একমাত্র যিনি মার্কিন দেশের প্রেসিডেন্ট হ'তে পেরেছেন তাঁর স্মৃতিলাঞ্ছিত, সেই হোটেলে আমাদের থাকবার জায়গা, কিন্তু, উঁহু, মুক্ত স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হোটেলের ভোজনকক্ষে আমাদের প্রবেশের অধিকার নেই, কালোকেলো মানুষগুলি ওঁদের পাশের টেবিলে ব'সে খানা খাবে, তা নক্‌স্‌ভিলের মান্যগণ্য মানুষদের কাছে তখনো ঠিক সহনীয় নয়।

কী আর করা, সমস্ত কর্মসূচি বাতিল, যাতায়াত বন্ধ, আমাদের হোটেলের খাবার ঘরে ঢোকা নিষিদ্ধ। লিফ্‌ট দিয়ে নিচে নামি, ইতস্তত ঘুরে বেড়াই, ফের উপরে উঠি, চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা, মার্কিন নাট্যকার এডওয়ার্ড অ্যালবির নাটক, এ ডেথ ইন দ্য ফ্যামিলি, চিত্রায়িত হচ্ছিল সে-সময়, তাঁদেরও কাজকর্ম বন্ধ, আমাদের হোটেলে তাঁদেরও অধিষ্ঠান, বিখ্যাত ইংরেজ অভিনেত্রী, জিন সিমন্‌স্‌, সেই চলচ্চিত্রে অভিনয় করছেন, তিনিও আমাদের মতো মাঝে-মাঝে লিফ্‌ট্‌ বেয়ে নিচে আসছেন, উপরে উঠছেন, গুজবে কান পাতছেন ; আমাদের সঙ্গে শুধু একটা তফাৎ, যদিও লিফ্‌টে তিনি আমাদের সহযাত্রিণী, এক যাত্রায় পৃথক ফল, তিনি ভোজনকক্ষে ঢুকে যাচ্ছেন, আমরা বাইরে রবীন্দ্রনাথের কবিতার সেই ধনীর দুয়ারে দাঁড়ানো প্রতীক্ষমাণা কাঙালিনী মেয়েটির মতো।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিউবাজড়িত সংকট, আমাদের তাৎক্ষণিক সংকট পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে জড়ো হওয়া শাদা-কালো-হলদে-তামাটে নানা বর্ণের ছাত্রদের জন্য মুক্ত স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশের সম্মানিত শহর নক্‌স্‌ভিলে খাদ্যের ব্যবস্থা

করা। দয়াপরবশ হয়ে একজন বাৎলে দিলেন, তিনটি মোড় পেরোলে 'টি বোন স্টেক' নামে এক রেস্তোরাঁ, সেখানে কৃষ্ণকায়দের প্রবেশের অধিকার আছে। অতএব সদলে, দু'বেলা, আমাদের সেই স্টেক হাউসে ধর্না, উভয় বেলা রসালো পুরুষ্টু মাংসভক্ষণ, স্বাদে অতুলনীয়, দক্ষিণা এক ডলার সাতানব্বুই সেন্ট।

পাঁচদিন অন্তে ক্রুশ্চেভ-কেনেডি বোঝাপড়া, কিউবাঘটিত সংকটের অবসান। স্বস্থানে ফিরে ওজন নিয়ে দেখি, মাংসভক্ষণমাহাত্ম্য, পাঁচদিনে ওজন বেশ কয়েক কিলো বেড়েছে, ঐ চর্বি-আধিক্য এখনো বহন ক'রে বেড়াচ্ছি। এই উপ্‌চে-পড়া কাহিনীরও উৎসে, সংকটের উপলক্ষ হিশেবে, অ্যালিসিয়াদের খুদে দেশ, যে-দেশের ছেলেমেয়েরা, মস্কোতে কী ঘটছে না-ঘটছে তার তোয়াক্কা না ক'রে, বেইস বলে পর্যন্ত মার্কিনদের এ বছর হারিয়ে দিল। উৎসাহের বশে অ্যালিসিয়াদের লাল সেলাম, স্বাগত, জানাতে গিয়েছিলাম প্রায়, কিন্তু, সাবধানের মার নেই, কে কখন মনের কোণে কী ঘটছে টের পেয়ে যাবে, পৃথিবীতে সমাজতন্ত্রের দিন তো শেষ হয়ে গেছে।

গোরুকাহিনী, গুরুকাহিনী

উনিশশো ছেষট্টি সাল শেষ হবো-হবো। দেশে বড়ো গোলমেলে অবস্থা যাচ্ছে। ইন্দিরা গান্ধির প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রথম বছর, গোড়াতেই তিনি গভীর গাড্ডায় প'ড়ে গেলেন। তাঁকে ঘিরে ধরলেন অশোক মেহ্‌তা-সুব্রাহ্মণিয়নের মতো মার্কিন-ঘেঁষা অর্থনীতিবিদরা, পরামর্শের ফুলঝুরি, আমাদের টাকার মূল্য যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করতে যদি রাজি হই আমরা, তা হ'লে একদিকে যেমন রপ্তানি বাড়বে, অন্যদিকে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে বিশ্ব ব্যাংক থেকে নাকি ঢেলে টাকা দেওয়া হবে আমাদের। ইন্দিরা গান্ধিকে বোঝানো হলো, তিনি বুঝলেন, টাকার সরকারি বৈদেশিক মূল্য ঘোষণা ক'রে কমিয়ে দেওয়া হলো, নতুন দিল্লি থেকে অবশ্য বলা হলো ঘাবড়াবার কিছু নেই, দেশে-দেশে এমনটা নাকি হয়েই থাকে। কিন্তু বাইরে থেকে বাড়তি কোনো টাকা তো এলোই না, রপ্তানিও বাড়ল না। বরংচ টাকার বিনিময়মূল্য যেহেতু ক'মে গেল, যার জন্য আমদানি-করা জিনিশ-পত্রের দাম বাড়ল, তার প্রভাব পড়ল আভ্যন্তরীণ মূল্য মানের উপর। বোঝার উপর শাকের আঁটি, সে-বছর হঠাৎ ঘোর অনাবৃষ্টি, ফসলে টান, সঞ্চিত খাদ্যভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষ, বিহারে দুর্ভিক্ষ, বিদেশ থেকে তাই কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা ফেলে কোটি-কোটি টন শস্য আমদানি। অতএব বহির্বাণিজ্যে সংকটের আরো ফুলে-ফেঁপে ওঠা, দেশের বাজারে আগুন, উত্তর ভারতে লক্ষ-লক্ষ ভুখা মানুষের বর্ধমান ভিড়, পুঞ্জীভূত অসন্তোষ যে-কোনো ছুতোয়, যে-কোনো মুহূর্তে, যে-কোনো জায়গায় বিস্ফোরক হয়ে দেখা দিতে পারে এমনতর আশঙ্কা।

সুযোগটি গ্রহণ করলেন গোমাতার দেখভাল নিয়ে সুচিন্তিত সাধু সমাজ। দেশ জুড়ে একটা চাপা রাগ, তা ফেটে বেরোবার রাস্তা খুঁজছে, অথচ বুভুক্ষুদের অক্ষৌহিণী বাহিনী নয়, এক দঙ্গল সাধু একদিন ভরদুপুরে তাঁদের বিক্রম জাহির করলেন, দেড় হাজার-দু'হাজার জঙ্গি অস্ত্রধারী সন্ন্যাসী, হাতে ত্রিশূল, চোখে আগুন, নতুন দিল্লিতে খোদ সংসদভবন তাঁরা আক্রমণ ক'রে বসলেন। শেষ মুহূর্তে অবশ্য শাস্ত্রী দিয়ে কোনোক্রমে তাঁদের ঠেকানো গেল, সংসদভবনের চারদিক কাঁদুনে গ্যাসের ধোঁয়ায় সমাচ্ছন্ন, কৃষিভবনে আমার ঘরে ব'সেও তা টের পেলাম।

দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা, মূল্যমানের বেপরোয়া ঊর্ধ্বগতি, ইন্দিরা গান্ধির প্রথম বছর, নড়বড়ে সরকার। সাধুদের ক্রোধের প্রধান কারণ এই লম্পট সরকার ভারতীয় ঐতিহ্যকে অবমাননা করছে, গোমাতাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছে না, এমনকি জাতীয় সংবিধান পর্যন্ত মানছে না, সংবিধানের ৪৮ সংখ্যক ধারায় পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া আছে যে গোর-দের নিধন বন্ধ করতে হবে, অথচ এই কৃতঘ্ন সরকার

সে-ব্যাপারে কোনো উদ্যোগই নেয়নি, পশ্চিম বাংলায়-কেরলে তথা দাক্ষিণাত্যের আরো একটি-দু'টি রাজ্যে ঢালাও গোরু বিক্রি হচ্ছে, প্রকাশ্যে গোমাংস বিক্রি হচ্ছে, হিন্দুর দেশ এটা, স্বদেশে এ ধরনের ভ্রষ্টাচার আর সহ্য করা যাচ্ছে না, সংসদ আক্রমণ না ক'রে সাধুদের অন্য উপায় ছিল না।

নড়বড়ে সরকার, গুলজারিলাল নন্দ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, সেই সঙ্গে ভারত সাধু সমাজ নামক সংস্থার প্রধান পৃষ্ঠপোষকও তিনি। একজন-দু'জন সাধুর পিঠে পুলিশের লাঠির আঘাত পড়েছে, গুটিকয়েক সাধু কাঁদুনে গ্যাসেও ঘায়েল হয়েছেন, নতুন দিল্লিতে থমথমে অবস্থা, সাধুদের পিছন থেকে উস্কানি দিয়ে যাচ্ছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের চেলা-চামুণ্ডারা, তাদের একটি প্রতিনিধিমূলক সংগঠন, জাতীয় গোরক্ষা সমিতি, রাতারাতি ভূমিষ্ঠ হয়ে মহা শোরগোল শুরু করলো, ফলে ইন্দিরা গান্ধি বিচলিত, সরকার চালানো তাঁর আদৌ রপ্ত হয়নি তখন পর্যন্ত, ইতি-উতি তাঁর বিরুদ্ধে ছুরি শাণানো হচ্ছে, দু'-তিন মাস বাদেই সাধারণ নির্বাচন, যে ক'রেই হোক ত্রিশূলধারীদের সঙ্গে সাময়িক সন্ধিস্থাপন প্রয়োজন। সাধুদের দাবিদাওয়া বিবেচনা করার জন্য এক 'উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন' কমিটির কথা ঘোষণা করলেন প্রধান মন্ত্রী, কমিটি সবদিক পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার ক'রে সরকারকে যথাশীঘ্র জানাবে, সংবিধানের ৪৮ সংখ্যক ধারা ও জাতীয় গোরক্ষা সমিতির আন্দোলনের প্রেক্ষিতে, গোরক্ষা আর গো-সংবর্ধনের জন্য কী-কী ব্যবস্থাগ্রহণ রাষ্ট্রের পক্ষে অবশ্যকরণীয়। কমিটির সভাপতি হিশেবে মনোনীত হলেন প্রবীণ আইনজ্ঞ শ্রীযুক্ত অমলকুমার সরকার, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির পদ থেকে সদ্য-সদ্য অবসর নিয়েছেন। গোরক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে কমিটিতে রইলেন পুরীর জগৎগুরু শঙ্করাচার্য, প্রাক্তন বিচারপতি রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, এবং, সর্বোপরি, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সর্বসংঘ পরিচালক গুরু গোলবালকর। আর রইলেন চারজন—হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ও কেরলের—কৃষি অথবা পশুপালন মন্ত্রী। সব শেষে, বিশেষজ্ঞরূপে কেন্দ্রীয় সরকারের তদানীন্তন পশুপালন কমিশনার পুণ্যব্রত ভট্টাচার্য, দুগ্ধবিশেষজ্ঞ হিশেবে আনন্দের স্বনামখ্যাত ভার্গিস কুরিয়ান, এবং অর্থনীতিবিদ হিশেবে আমি। কমিটির সভ্যদের তালিকাটি অনুধাবন ক'রে দ্বিজেন্দ্রলালের আলেকজান্দার আরেক-বার তাঁর সেনাপতির কাছে কবুল করতে পারতেন, সত্যি, কী বিচিত্র এই দেশ!

এই কিস্তূত কমিটির বিচিত্র নানা অভিজ্ঞতা। কমিটির শীর্ষস্থানে বিচারপতি সরকার, আমাদের সবাইকার অমলদা। বাগবাজার পাড়ার স্বভাবজ বিনয়-মাধুর্য-সৌজন্যের সঙ্গে দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়ের মর্যাদার নিটোল মিশ্রণ তাঁর আচরণে-আলাপচারিতায়, সকলকে নিয়ে মানিয়ে চলতে তাঁর আপ্রাণ প্রয়াস। অনেক সময়ই তিনি পুরোপুরি সফল হতেন না। তার প্রধান কারণ পুরীর জগৎগুরু শঙ্করাচার্য। নেহাৎই গোমাতাকে রক্ষা করার পবিত্রতম, মহত্তম কর্তব্য, অন্যথা এ-সব ম্লেচ্ছদের সঙ্গে মুখোমুখি-পাশাপাশি বসা তাঁর পক্ষে অকল্পনীয় ব্যাপার : হাবে-ভাবে কথাটি

জানিয়ে দিতে একদিনের জন্যও তাঁর দিক থেকে কোনো কার্পণ্য ঘটেনি। অবজ্ঞা, ঘৃণা, অনুকম্পা, ক্রোধ। তাঁর ক্রোধের বিশেষ কারণও ছিল। কমিটির বৈঠক বসত কৃষিভবনে, জগৎগুরু যখন প্রবেশ করতেন, কৃষিভবনের ফাটকে-করিডরে অগণিত ভক্তের ভিড়, দপ্তরের মধ্যেই সবাই দণ্ডবৎ হ'য়ে প্রণাম করছেন, হাত সামান্য তুলে জগৎগুরু আশীর্বাদ ছড়াচ্ছেন, তিনি ঘরে অনুপ্রবিষ্ট হলেন, সমবেত আমলারা ভক্তিভরে উঠে দাঁড়াল, একমাত্র আমাদের মতো ঠ্যাটা কয়েকজন চেয়ারে সেঁটে রইলাম, জগৎগুরু কটমট তাকালেন, জনৈক শিষ্য অপবিত্র চেয়ারে বাঘছাল বিছিয়ে দিল, জগৎগুরু আসন পরিগ্রহণ ক'রে সবাইকে যেন ধন্য করলেন। কমিটির শীর্ষে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের একদা-প্রধান বিচারপতি, জগৎগুরুর কাছে তা ধর্তব্যের মধ্যেই না, তিনি স্বয়ং যেহেতু উপস্থিত, এবং বিষয়বস্তু যেহেতু গোমাতার হিতবর্ধন, কমিটির কর্মকাণ্ড, তিনি ধ'রেই নিয়েছিলেন, তাঁর নির্দেশেই নিরূপিত হবে।

অথচ তা তো হবার নয়। সংবিধানের ৪৮ সংখ্যক ধারাতেও অনেক জটিলতা। ধারাটি যেমন গোহত্যা নিবারণের জন্য সদিচ্ছা ব্যক্ত করছে, সেই সঙ্গে রাষ্ট্র কর্তৃক আধুনিক তথা সুবৈজ্ঞানিক পশুপালন পদ্ধতি প্রয়োগের কথাও স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করছে। প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য-ভার্গিস কুরিয়ানদের মতো পশুপালন বিশেষজ্ঞরা এই অভিমতে স্থিত : ভারতবর্ষে যতটুকু পরিমাণ চারণভূমি, তা বিবেচনান্তে গোজাতির সার্বিক হিতসাধনের প্রয়োজনেই গবাদি পশুর সংখ্যা কমিয়ে আনা প্রয়োজন, গোরু-বাছুরদের না খাইয়ে অযত্নে-অবহেলায় তিলে-তিলে মেরে ফেলার চেয়ে তাদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখে যথাযথ বৈজ্ঞানিক পরিচর্যা অনেক বেশি শ্রেয়। তা ছাড়া অন্য নানা সমস্যাও আছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়াদির আবেগ-অনুভূতির কথা ছেড়ে দিলেও, এমনকি সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ভুক্ত কোটি-কোটি নিম্নবর্গের মানুষ, বিশেষ ক'রে দাক্ষিণাত্যে, গোমাংস ভক্ষণ ক'রে শরীরের পুষ্টির জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় প্রোটিনের চাহিদা মেটান, এই অপেক্ষাকৃত শস্তা দামের মাংসের জোগান বন্ধ হ'য়ে গেলে তাঁদের কী উপায় হবে। সব শেষে, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের সমস্যা : পশুপালন সংবিধানের সপ্তম তফসিল অনুযায়ী রাজ্যগুলির আওতায় পড়ে, কমিটি বসাতে পারে কেন্দ্র, তবে কেন্দ্রের নির্দেশ মানতে রাজ্যগুলি বাধ্য নয়। বিভিন্ন রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যাঁরা সাক্ষ্য দিতে এলেন, তাঁদের মধ্যে একজন-দু'জন তো ব'লেই বসলেন, দিনের বেলা যারা গোমাতা-গোমাতা ক'রে চেঁচায়, সন্ধ্যা গাঢ় হ'লে তাদের মধ্যেই অনেকে পূর্ব পাকিস্তানে গোরুপাচারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে।

বিভিন্ন প্রশাসক-পণ্ডিত-ধার্মিক পুরুষ বিশেষ আমন্ত্রিত হয়ে কমিটির সঙ্গে নানা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে আসতেন। আলোচনায় সর্বদা সবাক পুরীর জগৎ-গুরু ; যাঁর বক্তব্য পছন্দ হচ্ছে না তাঁকে রূঢ় ভাষায় আক্রমণ করছেন, অন্য সভ্যদের কথা বলতে বা প্রশ্ন করতে বাগড়া দিচ্ছেন, দিনের পর দিন কমিটির আবহাওয়া

দুঃসহ ক'রে তুলছেন। অথচ গোরক্ষা সমিতির অন্যতর প্রতিনিধি, আশুতোষ-তনয়, শ্যামাপ্রসাদ-অগ্রজ, রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, তিনিও প্রশ্ন করছেন, তর্কে প্রবৃত্ত হচ্ছেন, তবে কদাচ শালীনতা অতিক্রম ক'রে যাচ্ছেন না, কাউকে এতটুকু রূঢ় সম্ভাষণে-বিদ্ধ করছেন না, আমাদের সঙ্গে যখন মতে মিলছে না—অধিকাংশ সময়েই মিলছে না—শুধু একটু হেসে ঘাড় নেড়ে আপত্তি জানাচ্ছেন। আর আমাদের সবচেয়ে অবাক ক'রে দিলেন সমিতির তৃতীয়, এবং সবচেয়ে বেশি আলোচিত, প্রতিনিধি গুরু গোলবালকর। তাঁর উগ্রতা নিয়ে হাজার গল্প শুনেছি, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রতিষ্ঠাতাপুরুষ, যিনি একই সঙ্গে অন্ধ ভক্তি ও গভীর আতঙ্কের কেন্দ্রবিন্দু। আমাদের সমস্ত প্রাক্‌ধারণা বানচাল, কমিটির নিঃশব্দতম সদস্য গুরু গোলবালকর, নিতান্ত প্রয়োজনের বাইরে কথা বলেন না, যখন কোনো কিছু বলার তাগিদ বোধ করেন, তা ব্যক্ত করেন অতি বিনীত, নম্র উচ্চারণে, যদি কারো মত বা দৃষ্টিভঙ্গি গভীর অপছন্দও করেন, তাঁর ব্যবহারে তার বিন্দুতম ছায়াও পড়ে না। ভারতবর্ষের প্রায় সব ক'টি ভাষা তাঁর জানা, আমার সঙ্গে একটু-আধটু বাংলা চর্চা করতে পছন্দ করতেন, আমার ধ্যানধারণা তাঁর কাছে নিশ্চয়ই বিষবৎ, কিন্তু তাঁর সৌজন্যে সেই হেতু এতটুকু ব্যত্যয় ঘটাতে দেননি। এবং কমিটির আলোচনায় যখনই যতটুকু অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁর বক্তব্যে কোনোদিনই উগ্রতার স্পর্শ লাগেনি, জগৎগুরুর পুরোপুরি প্রতীপপুরুষ। অস্বীকার ক'রে লাভ নেই, গুরু গোলবালকর তাঁর আচরণ দিয়ে আমাকে মোহিত করেছিলেন। তখন কী জানতাম, আমার মুগ্ধ হওয়ার আরো অনেক বাকি।

সেই কাহিনীটুকুই বলি। পুরীর শঙ্করাচার্য আমাদের শত্রুজ্ঞান করতেন, আমরা সেটা পরম সম্মানীয় অবস্থান ব'লে মেনে নিয়েছিলাম, তাঁর বিরক্তিবর্ধনের প্রয়াসে আমাদের বিন্দুমাত্র ত্রুটি ছিল না। জগৎগুরু অবশ্যই ঘোর নিরামিষভোজী, তবে পনির তাঁর খুব পছন্দের, কায়দা ক'রে কুরিয়ান তাঁকে জানিয়ে দিলেন, আনন্দে আমূল কেন্দ্রে যে-পনির উৎপাদিত হয়, তা প্রস্তুত করতে উপাদান হিশেবে নধর বাছুরের তৃতীয়—না কি পঞ্চম—পাকস্থলী থেকে উৎসারিত চর্বির ব্যবহার অপরিহার্য। এই বৃত্তান্ত শুনে জগৎগুরুর পনির আস্বাদন সারা জীবনের জন্য বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল কিনা তা নিয়ে আর খোঁজ নেওয়া হয়নি। তবে কয়েকমাস বাদে কমিটিই ভেঙে গেল। আমাদের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ জানিয়ে জাতীয় গোরক্ষা সমিতির তিন প্রতিনিধিই কমিটি বর্জন করার সিদ্ধান্ত নিলেন, ততদিনে রাজনৈতিক পরিস্থিতিও পরিবর্তিত, সরকারের তরফ থেকেও আর উচ্চবাচ্য করা হলো না, গোরক্ষা অভিযানের একটি অধ্যায়ের যতিপতন।

কিন্তু যে-কথা বলছিলাম। কমিটি ভেঙে যাওয়ার বছরখানেক বাদে নতুন দিল্লি স্টেশনে একদিন সায়ংকালে দক্ষিণ এক্সপ্রেস বা ঐ গোছের কোনো ট্রেনে চেপেছি, সম্ভবত ভূপাল যাবো, দুই আসনবিশিষ্ট এক কূপে। কয়েক মিনিট বাদে আমার

সহযাত্রী এলেন, আর কেউ নন, স্বয়ং গুরু গোলবালকর, ঝাঁসি না কোথায় যেতে হবে তাঁকে। আমাকে দেখে জড়িয়ে ধরলেন, স্বাস্থ্যানুসন্ধান, কমিটির অসমাপ্ত সূচি নিয়ে কিছু ছুটকো কথাবার্তা, দেশের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা, গোলবালকর নম্রতার প্রতীক, আমি বয়সে ছোটো, যে-ঔদার্য প্রাপ্ত বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে আমাদের সমাজব্যবস্থায় আশা করা যায়, তার অনেক বেশি তিনি আমার উপর বর্ষণ করলেন।

ট্রেন ছাড়ল, বাইরে বর্ধমান অন্ধকার, একটা সময়ে আলাপ বন্ধ ক'রে ব্রিফ কেস থেকে বই বা পত্রিকা বের করলাম, পড়বার আলো জেলে আমি পড়া শুরু করলাম, গুরু গোলবালকরও। এবার আমার শুধু মুগ্ধ নয়, পুরোপুরি হতবাক হবার পালা। সনাতন হিন্দু ধর্মের উগ্রতম ধ্বজাধারী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রধান পুরুষ, ধ'রেই নিয়েছিলাম কোনো ধর্মপুস্তক বা খটোমটো কোনো হিন্দু দর্শনের বই বের ক'রে পড়তে শুরু করবেন। তিনি যে-বইটি বের করলেন তা মার্কিন-মুলুকে সদ্য-প্রকাশিত হেনরি মিলারের সর্বশেষ উপন্যাস। বাকিটুকু বুঝিয়া লহ যে জানো সন্ধান। সত্য গোপন ক'রে কী লাভ, ঠিক সেই মুহূর্তে গুরু গোলবালকর সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধাবোধ বহুগুণ বেড়েই গিয়েছিল। অথচ, নিছক এই কাহিনী ব্যক্ত করার অপরাধে, স্বয়ং সেবকসংঘের গোঁড়া সমর্থকরা হয়তো আমাকে বধ্য-ভূমিতে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

রবীন্দ্রনাথের গান, কেলেঙ্কারি, ধর্মের কল

উদ্যোগী পুরুষসিংহরা কী না পারে, একটা হারমোনিয়ম তাই জোগাড় হ'য়ে গেল।

অর্থনীতিবিদদের আন্তর্জাতিক মহাসংঘ, ইণ্টারন্যাশনাল ইকনমিক অ্যাসোসিয়েশন, বহু বছর ধ'রে বিবেকদংশনে ভুগছিলেন। ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান থেকে তুখোড়-তুখোড় সব অর্থনীতিবিদ বেরোচ্ছেন, কিন্তু দু'দেশের পারস্পরিক রাজনৈতিক সম্পর্ক এমনই তিক্ত যে তাঁরা এক সঙ্গে ব'সে কখনো দু'দেশের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন না, অথচ পরস্পরের অভিজ্ঞতা নিয়ে মতবিনিময়ের সুযোগ ঘটলে সম্ভবত উভপাক্ষিক লাভ। বিদেশের মাটিতে দু-দেশের অর্থনীতিবিদদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়েছে, তাঁরা আড্ডা দিচ্ছেন, গল্প করছেন, কখনো-কখনো নিজেদের দেশের সমস্যাবলি নিয়ে খুচরো-খাচরা আলাপও হয়তো করেছেন, কিন্তু সব-কিছুই ঈষৎ ছাড়া-ছাড়া। পৃথিবীর দরিদ্রতম দুই দেশ, প্রতিবেশী দুই দেশ, অনেক ব্যাপারেই একে অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে, কোনো-কোনো সমস্যা নিরসনের ক্ষেত্রে যৌথ কর্মসূচি প্রণয়ন করলে দু'দেশেরই উপকার হ'তে পারে। কিন্তু বেড়ালের গলায় কে ঘণ্টা বাঁধবে, এক দেশের ধনবিজ্ঞানীরা যদি অপর দেশের ধনবিজ্ঞানীদের দাওয়াত পাঠাতে যান, ঝামেলা দেখা দেবে, আমরা-কেন-ওদের-দেশে-যাবো-ওরাই-আগে-আসুক-গোছের তর্ক মাথাচাড়া দেবে, পারস্পরিক তিক্ততা ও অবিশ্বাস এত দূর গড়িয়েছে যে দুই দেশেই হৈ-হৈ প'ড়ে যাবে, ধীরে-সুস্থে আর্থিক সমস্যাবলি বিশ্লেষণ ও আলোচনার পরিবেশই আর থাকবে না তা হ'লে। দুই দেশের যে-সব বন্ধুরা একটা বৈঠকের ব্যবস্থা করার জন্য উদ্‌গ্রীব, অথচ ভেবে পাচ্ছিলেন না ঠিক কীভাবে এগোবেন, তাঁদের পরিত্রাতা হিশেবে এগিয়ে এলেন ইণ্টারন্যাশনাল ইকনমিক অ্যাসোসিয়েশন। তাঁরা সিংহল সরকারের সঙ্গে কথা বললেন—সেটা ১৯৬৯ সাল, তখনো সিংহল শ্রীলঙ্কা হয়নি—, সিংহল কর্তৃপক্ষ বনে-পাহাড়ে-ঘেরা ক্যাণ্ডি শহরের এক অভিজাত হোটেলে দু'সপ্তাহের জন্য ব্যবস্থা ক'রে দিলেন, অর্থনীতিবিদদের আন্তর্জাতিক মহাসংঘের তরফ থেকে দুই দেশের ধনবিজ্ঞানীদের কাছে নিমন্ত্রণ পাঠানো হলো, আলোচিতব্য বিষয়ের ব্যাপারে একটু আবরু রাখা হল: 'দক্ষিণ এশিয়ার আর্থিক সমস্যাদি: বিশ্লেষণ ও কর্মসূচি নির্ধারণ'। যাতে কেউ কোনো খুঁত ধরতে না পারেন, একদিন সিংহলের সমস্যা নিয়েও আলোচনার ব্যবস্থা রাখা হলো। অবশ্য সিংহল সরকার থেকে শুরু ক'রে যাঁরা আহ্বায়ক আর যাঁরা আহূত সবাই-ই জানতেন ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের প্রসঙ্গই আলোচনার প্রায় পুরো জায়গা জুড়ে থাকবে।

ইণ্টারন্যাশনাল ইকনমিক অ্যাসোসিয়েশনের ঘোর অপক্ষপাত, দুই দেশ থেকে চব্বিশজন অর্থনীতিবিদের কাছে চিঠি পাঠানো হলো, বারোজন ভারতবর্ষ থেকে আসবেন, বারোজন পাকিস্তান থেকে। কিন্তু এখানেই হিশেবে ভুল হয়ে গেল। পাকিস্তান থেকে দ্বাদশ নায়ক ক্যাণ্ডিতে এসে পৌঁছুলেন, প্রথম দিনই আবিষ্কার করা গেল তাঁদের মধ্যে আটজন পূর্ব পাকিস্তান থেকে, মাত্র চারজন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে, দুই তরফের মধ্যে কথা-বলাবলি শূন্যের পর্যায়ে। আর হবি তো হ, ভারতবর্ষ থেকে আমরা যে-বারোজন গিয়ে হাজির হলাম, তাদের মধ্যেও পাঁচজন বঙ্গসন্তান। অতএব, গোলেমালে হরিবোল, পাটিগণিতের পরিণাম শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়াল, নিমন্ত্রিত চব্বিশজনের মধ্যে চারজন পশ্চিম পাকিস্তানি, সাতজন নিকষ ভারতবর্ষীয়, বাকি তেরোজন বঙ্গভাষী, তাঁরাই অতএব সংখ্যাগুরু। তেরোটি আড্ডাবাজ বাঙালি, যাঁদের অনেকেরই নিজেদের মধ্যে পূর্বপরিচয় ছিল, এমন চমৎকার পরিবেশে একত্রিত, জননী বঙ্গভাষায় চুটিয়ে আড্ডা দেওয়ার এমন সুযোগ বিসর্জন দেওয়া যে বেহদ্দ বোকামি তা নিয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে মুহূর্তমধ্যে উপনীত হওয়া গেল। বঙ্গভাষীদের গল্পগুজব-হৈ-হল্লার তোড়ে দক্ষিণ এশিয়ার সমস্যাবলি নিয়ে সারগর্ভ আলোচনার জন্য আহূত এত সাধের বৈঠক ভেস্তে যাওয়ার উপক্রম। কর্মকর্তারা বিব্রত, ঐ অন্য সাত ভারতীয় অর্থনীতিবিদ বিরক্ত, পশ্চিম পাকিস্তানিরা রেগে কাঁই। তবে বাঙালিরা, তা দুটো আলাদা দেশ থেকে তাঁদের আগমন হয়েছে হোক, নরক গুলজার করার এমন সুবর্ণ সুযোগ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করবেন তা ভাবা নিছক মূর্খামি। সুতরাং গুরুগম্ভীর অর্থনীতিবিষয়ক আলোচনার যতিপতন ঘটিয়ে অন্যদের ভ্রূকুটি উপেক্ষা ক'রে আড্ডা অহোরাত্র চলল, চললই। বাড়তি মুশকিলের কারণ ঘটাল আনিসুর রহমানের উপস্থিতি। অর্থনীতিবিদ হিশেবে আনিসের চারদিকে প্রচুর তারিফ, অঙ্কে অসম্ভব পরিষ্কার মাথা, যে-কোনো জটিল সমস্যার মূলে অতি সহজে সে পৌঁছে যেতে পারে। কিন্তু আমাদের অনেকের কাছেই সেই পরিচিতি গৌণ, আমাদের কাছে আনিস হাজির থাকা মানেই রবীন্দ্রনাথের গানের প্রপাত। আনিস পেশাদার গাইয়ে রূপে নিজেকে কোনোদিন জাহির করার চেষ্টা করেনি, কিন্তু ওর কণ্ঠলাবণ্যের তুলনা নেই, তুলনা নেই রবীন্দ্রনাথের গানের প্রতি ওর তদ্গত আসক্তির। প্রহরের পর প্রহর অপগত, আমরা ঘড়ির দিকে তাকাতেই ভুলে যাই, ঋতুবিস্মৃত হই, কোন্ দেশে কোন্ শহরে কোন্ পরিবেশে আছি সেই খেয়াল পর্যন্ত অন্তর্হিত, কারণ ঘরের মধ্যে আনিসুর রহমান, একটির পর আরেকটি, রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে চলেছে, রবীন্দ্রনাথের ঢালা গানের ধারা আমরা পান ক'রে চলেছি।

আনিস যেহেতু উপস্থিত, ইণ্টারন্যাশনাল ইকনমিক অ্যাসোসিয়েশনের বৈঠক আমাদের কাছে ছুতোতে পর্যবসিত হলো। আমরা অধৈর্য, কখন দিনের বৈঠক শেষ হবে, হোটেলে কারো ঘরে গিয়ে জড়ো হবো, তারপর রবীন্দ্রনাথের গানের উদ্দাম

প্লাবন। তবে একটা দোয়াত-আছে-কালি-নাই সমস্যা, আনিস গান শোনাতে সদাপ্রস্তুত, কিন্তু তাকে অন্তত একটি হারমোনিয়ম সংগ্রহ ক'রে দিতে হবে। যন্ত্রের অভাবে গান বন্ধ হবে তা অকল্পনীয়। উদ্যোগী পুরুষসিংহরা তাই ক্যাণ্ডি শহরের রাস্তায় নেমে পড়লেন, যন্ত্রের ব্যবস্থা হলো, রবীন্দ্রনাথের গানের জাদু, তেরোটি বঙ্গসন্তান জড়ো হয়ে গান শুনছে, অর্থনৈতিক সম্মেলন বিপর্যস্ত, কেলেঙ্কারির একশেষ। সম্মেলন শেষ হলো, যে-সব প্রবন্ধ দাখিল করা হয়েছিল, সেই সঙ্গে প্রতিদিনের আলোচনার সারাংশ, সব-কিছু জড়ো ক'রে বইও বেরিয়েছিল যথাসময়ে। বইটির অনেকটা জায়গা দখল ক'রে বঙ্গসন্তানদের বুদ্ধি-মেধা-বিশ্লেষণ চাতুর্যের প্রমাণ, তা হ'লেও দেশে-বিদেশে টিটিক্কার প'ড়ে গিয়েছিল, ঐ লক্ষ্মীছাড়া বাঙালিগুলো অর্থনৈতিক বৈঠকের নাম ক'রে এসে গানের জলসা বসিয়েছিল সমস্ত কাণ্ডাকাণ্ড বিসর্জন দিয়ে, নিজেদের-নিজেদের দেশের রাজনৈতিক অবস্থান ইত্যাদি ভুলে-মেরে দিয়ে।

কয়েক মাস বাদে নতুন দিল্লিতে আরেক আধা-কেলেঙ্কারি। পাকিস্তান হাই-কমিশনে কয়েকটি বাচ্চা-বাচ্চা বাঙালি ছেলে, কারোরই বিয়ে-থা হয়নি, ঢাকাস্থ কোনো সুহৃদের কাছ থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে একজন হয়তো প্রথম দিন হাজির হয়েছিল, তারপর একজনের সুবাদে অন্যরা, মাঝে-মাঝে আমার লোডি এস্টেটের বাড়িতে গল্পগুজব করতে আসে। বাড়ির বাইরের মাঠে খোলা আকাশের নিচে সন্ধ্যার পর গল্প শোনো, নিজেরা গল্প করে, রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের গান শোনায়, নয়তো শোনে। কখনো-কখনো রাত্তিরের খাওয়া সেরে বাড়ি ফেরে। চমৎকার ছেলেরা সব, পৃথিবীতে কোথায় কী হচ্ছে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ, নিজেদের দেশের অবস্থা নিয়েও তাদের অনেক চিন্তা। ভারতবর্ষ বিষয়ে তাদের কৌতূহল-মণ্ডিত, অথবা আতঙ্কমিশ্রিত, প্রশ্নাবলি। তেমন বেশি চেনা-জানা নেই দিল্লি শহরে, পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত, সামাজিক মেলামেশায় স্বভাবতই বিবিধ প্রতিবন্ধকতা, লোডি এস্টেটে আমাদের বাসগৃহ ওদের কাছে মরুদ্যানসদৃশ, মাঝে-মধ্যে একটু বাঙালি স্পর্শ পেয়ে যায় ওরা, পেয়ে নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করে, আমরাও এই বাচ্চা ছেলেগুলিকে খানিকটা আনন্দদান করতে পারছি জেনে পরিতৃপ্ত বোধ করি।

রাষ্ট্রশক্তির কথা ভুলেই ছিলাম আমরা। একদিন দুপুরে কৃষিভবনে নিজের দপ্তরে ব'সে আছি, পুলিশের গুপ্তচর বিভাগের এক ভদ্রলোক দেখা করতে এলেন। বাঙালি নাম, ভাবলাম কোনো বাঙালি সমিতি-ঘটিত ব্যাপারে আলাপ করতে এসেছেন। অথচ ভদ্রলোক কেমন যেন আমতা-আমতা করছেন, এ-কথা সে-কথা বলছেন, আসল বক্তব্যে পৌঁছুতে লজ্জাই পাচ্ছেন যেন। বাধ্য হয়ে আমার স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ প্রশ্ন: কোন্ প্রয়োজনে তাঁর আগমন। ভদ্রলোক আরো-একটু কুঁকড়ে গেলেন যেন। ঢোঁক গিলে আমার মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে, সঙ্গে-সঙ্গে দৃষ্টি

অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে, তাঁর বিনীত নিবেদন : 'স্যার, যদি অপরাধ না নেন, পাকিস্তান হাই কমিশনের লোকজন আপনার বাড়িতে অত ঘন-ঘন যাতায়াত করে কেন' ? আমাকে জেরা করতে এসেছিলেন, আমার তরফ থেকেই জেরা করা শুরু হলো। বোঝা গেল, কয়েক সপ্তাহ ধ'রেই পুলিশ কর্তৃপক্ষ আমাদের অতিথিদের নিয়ে ভাবিত, বৈরীভাবাপন্ন দেশের সরকারি লোকজন ভারতবর্ষের কৃষিপণ্য মূল্য পরিষদের বিষয়ে এতটা আগ্রহ দেখাবে কেন, অনুসন্ধান ক'রে দেখা প্রয়োজন। পুলিশের উপরতলার কর্তারা স্বয়ং আসতে একটু লজ্জা পেয়েছেন, তাঁদের আরো উপরমহলের সঙ্গেও প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনা করার সাহস পাচ্ছেন না, আপাতত তাই বাঙালি অফিসারটিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আমাকে মৃদু সতর্ক ক'রে দেওয়ার উদ্দেশ্য।

সেই সতর্কীকরণের ফলে তেমন যে লাভ হয়েছিল তা মনে হয় না। যারা রবীন্দ্রনাথের গান শুনতে চায়, শোনাতে চায়, তাদের বারণ করা চলে না। পুলিশের ভদ্রলোকটিকে সেদিন ঐটুকু ব'লে বিদায় দেওয়া হয়েছিল, তাঁদের দিক থেকে, আমার জ্ঞাতসারে অন্তত, আর-কোনো উৎসাহ দেখানো হয়নি। তা ছাড়া ধর্মের কল নাকি বাতাসে নড়ে। অন্তত সে-রকম একটি প্রমাণ পাওয়া গেল বছর দেড়েকের মধ্যেই।

১৯৭১ সালের মার্চ মাস প্রায় শেষ, পূর্ব পাকিস্তান উত্তাল। শেখ মুজিবর রহমানের গ্রেপ্তারের সঙ্গে-সঙ্গে অবর্ণনীয় ফৌজি অত্যাচার, হত্যালীলা, পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে বিদ্রোহ, গণঅভ্যুত্থান। আমাদের বন্ধুবান্ধব একজন-দু'জন ক'রে বেনাপোল বা আগরতলা হয়ে ভারতবর্ষে পৌঁছে যেতে শুরু করেছেন, তাঁদের কারো-কারো আনুগত্য মুজিবের দিকে, কেউ-কেউ তাঁরা ভাসানীপন্থী, একজন-দু'জন কোনো না-কোনো কমিউনিস্ট সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। অর্থনীতিবিদদের একটি বড়ো দল এমনি ক'রে নতুন দিল্লিতে পৌঁছে গেলেন, তাঁদের অনেকেই আমার বাড়িতে সমাসীন, রহমন সোভান-আনিসুর রহমান-নুরুল ইসলাম-ওয়াহিদুল হক, এঁদের মধ্যে অনেকেই পরে বাংলাদেশে মন্ত্রী-শান্ত্রী বনেছিলেন। কিন্তু তখনো অবস্থা বোঝা যাচ্ছে না, পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর বার্তা নিয়ে, তাঁদের স্বাধীনতা সংগ্রামে নতুন দিল্লির সাহায্যপ্রার্থী তাঁরা। মাত্র এপ্রিল মাস পড়েছে, এখনো তাঁরা প্রকাশ্যে আসতে দ্বিধাগ্রস্ত, আমার বাড়িতে অধিষ্ঠান, আমাদের সরকারকে জানিয়েই, একটু গা-ঢাকা দিয়ে। নতুন দিল্লির রাস্তায়-ঘাটে চলা-ফেরা করতে হবে, সুতরাং আপাতত ছদ্মনামের আড়াল। রহমন সোভানের নাম দেওয়া হলো মোহনলাল, আনিসুর হয়ে গেল অশোক রায়, নুরুল ইসলাম নির্মল সেন, ওয়াহিদুল হক বরুণ হালদার। নামের তালিম দিতেই কয়েক প্রহর কাটাল। নুরুল ইসলাম টেলিফোনে কলকাতায় কার সঙ্গে যেন কথোপকথনরত, হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে তার ত্রস্ত প্রশ্ন : 'আমার নামটা কী যেন, নামটা কী যেন', উক্ত কলকাতা-অবস্থানকারীকে সেই মুহূর্তে তা জানানো প্রয়োজন।

এরই মধ্যে সরকারি সিদ্ধান্ত, উভপাক্ষিক সিদ্ধান্ত, বাংলাদেশের বিপ্লবী সরকারের এবং নতুন দিল্লিস্থ ভারত সরকারের, রহমন সোভান ভালো বলতে-কইতে পারে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য প্রচারের উদ্দেশ্যে ওকে অবিলম্বে ইওরোপ-আমেরিকায় পাঠানো প্রয়োজন, কিন্তু রহমন আপাতত মোহনলাল নামেই ঘোরাফেরা করবে, ভারত সরকার ঐ নামে একটি ভারতীয় পাসপোর্টের ব্যবস্থা ক'রে দেবেন।

ভোররাত্তিরে রহমন সোভানের প্যারিসের প্লেন, রাত একটা নাগাদ পুলিশের গুপ্তচর শাখা থেকে গাড়ি এল ওঁকে পালাম নিয়ে গিয়ে প্লেনে তুলে দেওয়ার জন্য। প্লেনের টিকিট-পাসপোর্ট-বিদেশি মুদ্রা এ-সমস্ত নিয়ে পুলিশের গাড়ি থেকে যিনি নামলেন, তাকিয়ে দেখি বছর-দেড়েক আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে-আসা সেই বাঙালি অফিসারটি। গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে স্যালুট ঠুকলেন আমাকে, সেই সঙ্গে রহমন সোভানকেও।

একটি 'জরুরি' গল্প

আমরা বড়ো চট ক'রে ভুলে যাই। মাত্র পনেরো-ষোলো বছর আগে এই পশ্চিম বাংলাতেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা-গান, বিশেষ-বিশেষ কবিতা-গান, সরকারের বিবেচনায় যেগুলি সন্দেহজনক, নিষিদ্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছিল : খবরকাগজে ছাপানো চলবে না, প্রকাশ্য সভায় ও বেতারে-দূরদর্শনে গাওয়া বা আবৃত্তি করাও বারণ। কারণ জরুরি অবস্থা। জরুরি অবস্থায়, রাইটার্স বিল্ডিং থেকে ফতোয়া, আরো অন্য অনেকের সঙ্গে, রবীন্দ্রনাথও বিপজ্জনক। 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির', অবশ্যই কোপদৃষ্টিতে পড়ল, বুড়ো কী সর্বনেশে কথাবার্তা লিখে-টিখে গেছে বাপু। তবে 'বাঁধ ভেঙে দাও'-ও বন্ধ, এমনকি বন্ধ 'আমার মুক্তি আলোয়-আলোয় এই আকাশে'। দেশের নেতাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলছে, এই পরিস্থিতিতে যারাই মুক্তি, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ইত্যাদি সব-কিছু নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে, তাদের বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি না ক'রে উপায় নেই। রাজ্য জুড়ে পনেরো-কুড়ি হাজার মানুষকে বিভিন্ন কারাগারে পুরে রাখা হচ্ছে, আরো বেশ কয়েক হাজার যুবক-তরুণ-কিশোরকে পিটিয়ে বা গুলি ক'রে মারা হচ্ছে, এমন অবস্থায় গানে কিংবা কবিতায় পর্যন্ত মুক্তির উল্লেখ বাঞ্ছনীয় নয়, বাদ দিয়ে দাও। অতএব রবীন্দ্রনাথ, যিনি আমাদের ভাষা দিয়েছেন, যিনি আমাদের গান দিয়েছেন, তিনিও নিষিদ্ধ হলেন, এই পশ্চিম বাংলাতেই। তাঁকে সেদিন যে-ভদ্রমহোদয়গণ নিষিদ্ধ করে-ছিলেন, সে-সব কথা মনে এলে তাঁরা যে এখন খুব-একটা লজ্জাবোধ করেন, তা-ও না ; জরুরি অবস্থার সময় ও-রকম ছোটোখাটো ভুলচুক নাকি হয়েই থাকে, যেমন হয়তো হয়েইছিল কয়েক হাজার কিশোর-তরুণ-যুবককে সুচারু পরিকল্পনামাফিক পিটিয়ে বা গুলি ক'রে মারার ক্ষেত্রে।

তবে স্মৃতির খামখেয়াল বুঝে ওঠা ভার, রবীন্দ্রনাথকে-ফাটকে-পোরা, হাজার-হাজার যুবক-তরুণ-কিশোরকে পিটিয়ে-বা-গুলি-ক'রে-মারা, জরুরি অবস্থার এবং-বিধ ঘটনাবলির পাশাপাশি, আমার স্মৃতিতে ওতপ্রোত জড়িয়ে আছে অতি শ্রদ্ধেয় বন্ধু, ভূমিসংস্কারবিশেষজ্ঞ, ওল্‌ফ্‌ ল্যাডেজিন্‌স্কির প্রয়াণের প্রসঙ্গ। আশ্চর্য মানুষ ছিলেন ল্যাডেজিন্‌স্কি, রাশিয়া-থেকে-চ'লে-আসা প্রথম প্রজন্মের মার্কিন ইহুদি, ইংরেজি বাচনে পূর্ব ইওরোপের উচ্চারণের আদল, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে-মহাদেশে ভূমিসমস্যার অন্ধিসন্ধি তাঁর চেয়ে ভালো কারো জানা ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার পরে-পরে জেনারেল ম্যাকার্থার পরাজিত-অধিকৃত জাপানের প্রশাসনের পরিপূর্ণ দায়িত্বে, পরামর্শ দেওয়ার জন্য ল্যাডেজিন্‌স্কিকে ডেকে নিয়ে গেলেন। আমূল

ভূমিসংস্কারের যে-ছক ল্যাডেজিন্‌স্কি তৈরি ক'রে দিয়ে এলেন, তারই ভিত্তিতে জমির মালিকানা জাপানে আগাপাশতলা নতুন করে বিন্যাস ক'রা হলো। জাপানের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পরবর্তী অত্যাশ্চর্য-দ্রুত সর্ববিধ আর্থিক অগ্রগতির অন্যতম প্রধান হেতু, এখন সকলেই মেনে নিয়ে থাকেন, ল্যাডেজিন্‌স্কি-নির্দেশিত ঐ ভূমিসংস্কার।

কয়েক বছর বাদে ল্যাডেজিন্‌স্কি ভিয়েতনামেও গিয়েছিলেন, এবং ইরানেও। তবে ততদিনে চাকা ঘুরে গেছে, জন ফস্টার ডালেস মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব, যত্রতত্র ঝোপে-ঝাড়ে কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন তিনি, ভূমিসংস্কারের কথা তো কমিউনিস্টরাই ব'লে থাকে। মার্কিন সরকারের একটি দপ্তর কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়েই ভিয়েতনাম ও ইরানে গিয়েছিলেন ল্যাডেজিন্‌স্কি, কিন্তু দু'দেশেই তাঁর পরামর্শ বরবাদ। দু'দেশেই অচিরে যা হ'তে যাচ্ছে, সে-সম্পর্কে ল্যাডেজিন্‌স্কির মনে অন্তত কোনো সংশয় ছিল না।

ষাটের দশকে, প্রায় আশির কাছাকাছি বয়স, বিপত্নীক অতএব সাংসারিক বাধাবন্ধনহীন, নতুন দিল্লি চ'লে এলেন। একটা উপলক্ষ ছিল, বিশ্ব ব্যাংকের চাকুরে নন, উপদেষ্টা, যদিও তাঁর দেওয়া পরামর্শাদির সঙ্গে ব্যাংকের কর্তাব্যক্তিদের মতের মিল হবার আদৌ সম্ভাবনা ছিল না। দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ ক্ষীণতর, শরীর দুর্বল, পরে শোনা গেল পাকস্থলিতে কর্কট রোগ তখনই বাসা বেঁধেছিল, ল্যাডেজিন্‌স্কি অশোক হোটেলে একটি ঘর নিয়ে থাকতেন। প্রতি মাসে এ-রাজ্যে ও-রাজ্যে ঘুরতে বেরিয়ে যেতেন, তথ্যের, সত্যের অনুসন্ধানে। ভূমিসংস্কার ও ভূমিপুনর্বিন্যাসের নামে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে কী ঘটছে তা তাঁর পুঙ্খানুপুঙ্খ জানা। বিহারে বাটাইদারদের—আমরা এঁদেরই ভাগচাষী বলি—কী ভয়ংকর শোষণ-নিপীড়নের ভুক্তভোগী হ'তে হয়েছে আবহমান কাল ধ'রে, এখনো হ'তে হচ্ছে, তার বিশদতম বিবরণ ল্যাডেজিন্‌স্কির এক অবিশ্বাস্য-অনুকম্পা-ছাওয়া প্রতিবেদনে বিধৃত হয়ে আছে। পঞ্জাবে সবুজ বিপ্লবের সুযোগ কারা লুটে-পুটে নিল, কী উপায়ে নিল, মহারাষ্ট্রের খরার মরশুমে অভাবী-দুর্ভিক্ষাক্রান্ত মানুষজনগুলির পরিচর্যার জন্য যে-অর্থ বরাদ্দকৃত, তা কোথায় কোন্ সুড়ঙ্গ দিয়ে উধাও হয়ে গেল, গোটা পশ্চিম বাংলা জুড়ে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আগত লক্ষ-লক্ষ শরণার্থীদের ত্যাগের-তিতিক্ষার-প্রতীক্ষার উপাখ্যান, সমবায় আন্দোলনের অছিলায় সারা দেশ জুড়ে যে-বিরাট ধাপ্পার অনুষ্ঠান, সে-সমস্ত বিচিত্র-বিবিধ ইতিবৃত্ত ল্যাডেজিন্‌স্কির জ্ঞানের পরিধির মধ্যে।

বিশ্ব ব্যাংকের ফন্দি-অভিসন্ধি সম্পর্কে তাঁর কোনো মোহ ছিল না, যেমন ছিল না নিজের দেশের সরকারের ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে। ষাটের দশকের প্রায় উপান্ত, ভিয়েতনামে মার্কিন ফৌজ বিষাক্ত বোমা ফেলে শস্য পুড়িয়ে দিচ্ছে, ঘরবাড়ি-সাঁকোসড়ক চূর্ণ-বিচূর্ণ করছে, আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে ভিয়েতনামীদের পিষে মারার উদ্দেশ্যে কোটি-কোটি ডলার প্রতি সপ্তাহে বেপরোয়া ঢালা হচ্ছে।

ল্যাডেজিনৃস্কি উত্তেজিত, আবেগউদ্বেল, অথচ বিবেচনায় তন্নিষ্ঠ, বাজি রাখার ঢঙে ব'লে যেতেন, কিছুতেই কিছু হবার নয়, ভিয়েতনামীরা জয়ী হবেই, পরাধীনতা-মুক্ত হবেই, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ শেষ কথা বলে না, শেষ কথা বলে ইতিহাস।

পশ্চিম বাংলা সম্পর্কে ল্যাডেজিনৃস্কির অসীম আগ্রহ। বেশ কয়েকবার ঘুরে গেছেন বর্ধমান-হুগলি থেকে শুরু ক'রে মেদিনীপুর-বাঁকুড়া-পুরুলিয়া, অন্যদিকে সুন্দরবন পরগনা থেকে নদীয়া-মুর্শিদাবাদ ছুঁয়ে ডুয়ার্সের সানুপ্রদেশ। কৃষক সভার আন্দোলনের বিষয়ে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল, সেই আন্দোলনের প্রতি সম্ভবত শতকরা একশোভাগ সহানুভূতি। মুজাফ্‌ফর আহমদ ও হরেকৃষ্ণ কোঙারের প্রায় সমস্ত লেখা তাঁর মুখস্থ। যতবার দিল্লি থেকে কলকাতায় কাজে আসি, ল্যাডে-জিনৃস্কির সনির্বন্ধ অনুরোধ, মুজাফ্‌ফর সাহেব কিংবা হরেকৃষ্ণবাবুর নতুন কোনো লেখা যদি ইতিমধ্যে বেরিয়ে থাকে, আমি যেন সঙ্গে ক'রে আনি, ইংরেজিতে হ'লে তো কথাই নেই, আর যদি বাংলাতেই হয়, তাতেই বা কী, সন্ধ্যাবেলা আমার বাসায় চ'লে আসবেন, নয়তো আমাকে নেমন্তন্ন করবেন তাঁর হোটেলের ঘরে। প্রতিটি পঙ্‌ক্তি ধ'রে অনুবাদ করবো, তিনি সঙ্গে-সঙ্গে খাতা খুলে লিখে রাখবেন। হরেকৃষ্ণবাবুর সেই বিখ্যাত মন্তব্য—'পশ্চিম বাংলায় হঠাৎ বিধবা-প্রেমিকদের সংখ্যা আশ্চর্যজনকরূপে বৃদ্ধি পেয়েছে'—পাঠান্তে ল্যাডেজিনৃস্কি হেসে কুটিপাটি। ভাগচাষীদের পাকাপাকি জমির অধিকার দেবার জন্য কৃষক সভার তুমুল আন্দোলন চলছিল; সেই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হ'লে জোতদারদের মহা মুশকিল; তাদের যাঁরা মোক্তার, তথ্যসাবুদ দিয়ে তাঁরা প্রমাণ করবার চেষ্টা করলেন, বর্গাদারদের ভূমিস্বত্ব অর্পণ করলে গ্রামাঞ্চলে লক্ষ-লক্ষ বিধবা পথে দাঁড়াবেন; নিজেরা চাষ করতে অপারগ ব'লেই তাঁরা বাধ্য হ'য়ে জমি বর্গা দিয়েছেন, সেই জমি থেকে যৎসামান্য তাঁদের উপার্জন, হা ঈশ্বর, লক্ষ্মীছাড়া কমিউনিস্টরা এই নিঃসহায় বিধবাদের জমি পর্যন্ত কেড়ে নেওয়ার মতলব ফাঁদছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। হরেকৃষ্ণবাবুর ব্যঙ্গাত্মক গদ্যের ধার ইংরেজি অনুবাদে খানিকটা নিষ্প্রভ, তাহ'লেও ল্যাডেজিনৃস্কির ইঙ্গিতটি বুঝতে অসুবিধা নেই, তাঁর ঘর-কাঁপানো অট্টহাসি। তাঁর নিজস্ব সংযোজন: পৃথিবীর সব দেশে সব শতাব্দীতে খলনায়করা হুবহু একই ধরনের কথাবার্তা ব'লে থাকে, বিনাশ্রমে অর্জিত ভূসম্পত্তি আগলে রাখার প্রয়োজনে বিধবাদের আবিষ্কার করে, বিধবাদের দুঃখে কেঁদে গড়িয়ে পড়ে।

দুরারোগ্য ব্যাধিতে শরীর অসমর্থ, যন্ত্রণায় রাত্তিরে ঘুম হয় না, কিছুই প্রায় খেতে পারেন না, সত্তর দশকের গোড়ায় ল্যাডেজিনৃস্কি মার্কিন দেশে ফিরে গেলেন। মাঝে-মাঝে খবর পেতাম, ব্যাধির প্রকোপ ছড়াচ্ছে, অবশেষে, ১৯৭৫ সালের জুন মাসের যে-সপ্তাহে আমাদের দেশে জরুরি অবস্থার ঘোষণা, তার

ক'দিন বাদেই তাঁর মৃত্যুসংবাদ পৌঁছুল। জরুরি অবস্থা, ফিচলেমি-বাচালতা নিষিদ্ধ, বোম্বাইয়ের যে-ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকার জন্য প্রতি শনিবার 'স্তম্ভ' লিখতাম, ইন্দিরা গান্ধির গোমস্তাদের নির্দেশে তা বাতিল। উক্ত পত্রিকার সম্পাদকের অনুরোধক্রমে ল্যাডেজিন্স্কির স্মৃতি তর্পণ ক'রে একটি ছোটো লেখা তৈরি করতে হলো, মাত্র ছয় কি সাত অনুচ্ছেদ, সব মিলিয়ে হয়তো আটশো কি নয়শো শব্দ। কিন্তু এখানেও গোল বাঁধল, ভুলেই গিয়েছিলাম আমরা জরুরি অবস্থায় অনুপ্রবিষ্ট, কী লিখি তা প্রতিটি শব্দ বিবেচনা ক'রে লিখতে হয়। ঘটনাটি যা ঘটল, ল্যাডেজিন্স্কি সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে আমার সরলমনা মন্তব্য : তিনি কোনো বিশেষ মতাদর্শ-অবলম্বী ছিলেন না, তবে, সেই সঙ্গে এটাও বলতে হয়, মতাদর্শের জুজুবুড়ি থেকে ভয়ও পেতেন না তিনি। প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছিল ব'লেই তারপর এটাও জুড়ে দিয়েছিলাম : প্রতিবার যখন কলকাতা যেতাম, তাঁর উপরোধে মুজাফ্‌ফর আহমদ-হরেকৃষ্ণ কোঙারের সদ্য-প্রকাশিত রচনাদি কিনে নিয়ে আসতে হতো আমাকে।

জরুরি অবস্থা, খোদ মার্কিন সাহেব যেচে দিশি কমিউনিস্টদের লেখা পড়তেন, তোবা-তোবা, এ-ধরনের পাপলিখন জরুরি অবস্থায় চলবে না। সুতরাং আমার অতি ছোটো প্রবন্ধ থেকে সেই অনুচ্ছেদটি সেন্‌সর দপ্তর প্রায় পুরো ছাঁটাই ক'রে দিলেন। শুধু প্রারম্ভিক বাক্যটি, নিরালম্ব-বায়ুভূত-নিঃসঙ্গ, রবীন্দ্রনাথের কবিতার তালগাছের মতো, একপায়ে দাঁড়িয়ে রইল : 'ল্যাডেজিন্স্কি কোনো বিশেষ মতাদর্শ-অবলম্বী ছিলেন না, তবে মতাদর্শ সম্পর্কে তাঁর কোনো শুচিবাইও ছিল না'। এখানেই যতি, অনুচ্ছেদ খতম, পরের অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্যের সঙ্গে পরম্পরাবিহীন।

এই তুচ্ছাতিতুচ্ছ নাট্যরঙ্গের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। ক'দিন আগে দামি কাগজে ঝকঝকে সুন্দর ছাপা বইটি হাতে এল, ল্যাডেজিন্স্কির বিভিন্ন প্রবন্ধের সংগ্রহ, সম্পাদকের দীর্ঘ বিশ্লেষণ-আকীর্ণ ভূমিকা, ভূমিকার মাঝামাঝি জায়গায় বোম্বাইয়ের সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত আমার সেই স্মরণিকা-গোছের প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত। এখন পড়তে গিয়ে অন্য-কোনো অসংবদ্ধতা চোখে পড়ে না, তবে জরুরি অবস্থায় কাঁচির-ঝাপট-খাওয়া সেই মাত্র এক বাক্যের অনুচ্ছেদে সহসা হোঁচট খেতে হয়, খাপছাড়া, পরের অনুচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গতিশূন্য।

তবে রবীন্দ্রনাথ-মহাত্মা গান্ধিও পার পাননি, জরুরি অবস্থার মহিমা, তাঁদের লেখাও জবাই হয়েছে। আমার এমন কী গুমোর যে একটা অনুচ্ছেদ উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ব'লে এই ষোলো বছর বাদে নতুন ক'রে নাকি কান্না কাঁদতে বসবো?

সমর সেনের সেই কবিতা

প্রবেশিকা পরীক্ষায় আমার ফল আদৌ আশানুরূপ হয়নি। অর্থাৎ মাস্টারমশাইদের ও অভিভাবকদের আশানুরূপ। মার্কশীট হাতে পাওয়ার পর বোঝা গেল, প্রধানত বাংলা পরীক্ষায় ভীষণ খারাপ করার জন্যই অতটা তলিয়ে যাই। পরবর্তী গবেষণায় আরো ধরা পড়ল, বাংলা প্রশ্নপত্রে তিরিশ না পঁয়তিরিশ নম্বর আলাদা ধরা ছিল প্রবন্ধ রচনার জন্য। পরীক্ষক ভদ্রলোক মৎলিখিত প্রবন্ধপাঠে কুপিত হ'য়ে পঁয়তিরিশে গোল্লা বসিয়ে দিয়েছিলেন। পনেরো বছরের বালকের পক্ষে চরম অবিমৃষ্যকারিতা করেছিলাম, যথাযোগ্য শাস্তিই হয়তো পেয়েছিলাম।

ব্যাপারটা খুলেই বলা শ্রেয়। প্রবন্ধের বিষয় বোধহয় ছিল 'যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষে গ্রামীণ পুনরুজ্জীবন', কিংবা ওর কাছাকাছি কিছু। আমি তখন সমর সেনের কবিতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছি, আর, কে না জানে, সমরবাবু ঠিক সেই সময়ে জোড়া ঘোড়া রোগে ভুগছেন, কাঁড়ি-কাঁড়ি জনযুদ্ধপ্রেমী 'সাম্যবাদী' কবিতা তো লিখছেনই, সেই সঙ্গে তাঁর কবিতায়, গদ্যের অলস মন্থরতার পাশাপাশি, পঙ্‌ক্তিতে-পঙ্‌ক্তিতে অন্ত্যানুপ্রাস জুড়ছেন। আমাদের-হাত-থেকে-পাবে-না-রেহাই লবেজান সামুরাই কিংবা যে-সরায়-ময়লা-দুধ-দেয়-যে-গয়লা-তাদের দোস্তি আমাদের পরমা গতি-গোছের কাঁড়ি-কাঁড়ি প্রয়াস। ওঁর এমনধারা কোনো-একটি কবিতারই খুব ঝকঝকে গোটা দুই পঙ্‌ক্তি, যাদের বক্তব্যের সারাৎসার, তাকিয়ে ছাখো সোভিয়েত দেশে জোসেফ স্তালিন, বিপ্লবের কী জাদুকরী সফলতা, এনে দিয়েছেন ট্র্যাক্টরের দিন। এটা তো রেওয়াজ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, পরীক্ষার খাতায় একটু-আধটু জ্ঞান দিতে হয়, একটা-দু'টো উদ্ধৃতি, দরকার হ'লে বানানো উদ্ধৃতি, অনুপ্রবেশ করিয়ে দিতে হয়: এ-সব আমারও জানা ছিল, যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষে গ্রামের চেহারা ফেরাতে আমাদেরও জোসেফ স্তালিনের মতো ট্র্যাক্টরের দিন আনতে হবে, তা-ই বোধহয় আমার প্রতিপাদ্য, 'কবিতা' পত্রিকায় সদ্য-বেরনো সমরবাবুর কবিতা উদ্ধৃত ক'রে প্রত্যয় ঘোষণা করেছিলাম সেই প্রবন্ধে। কিন্তু রামের জন্মের আগেই রামায়ণ, আমাদের দেশে তখন থেকেই ইয়েলৎসিনপন্থীরা স্পষ্টতই ইতিউতি অবস্থান করছিলেন, পরীক্ষকমশাই আমার এঁচোড়পাকামোয় রেগে কাঁই। অতএব পঁয়তিরিশে শূন্য।

পরবর্তী পর্যায়ে কোনো-কোনো আবেগঘন মুহূর্তে সমরবাবু যখন অভিযোগ জানাতেন, একটি বিশেষ বামপন্থী দলের প্রতি আমার পক্ষপাতের কথা গোপন রেখে তাঁর সম্পাদিত পর-পর দু-দুটো সাপ্তাহিক পত্রিকায় নিয়মিত লিখে তাদের

বৈপ্লবিক চরিত্র আমি অপবিত্র করেছি, সঙ্গে-সঙ্গে আমার সরব প্রতি-অভিযোগ, কাঁচা বয়সে তাঁর কবিতার পাল্লায় প'ড়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রায় যে ফেল হয়ে গিয়েছিলাম, তার বেলা? অল্প-ফরাশি-জানা একজন এক সন্ধ্যায় ব'লে উঠেছিলেন: তুশে।

কী আর করা, সেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসার পর পঞ্চাশ দশক অপগত, স্তালিন-বিভোরতা অথচ এখনো 'যেহেতু অব্যাহত, মস্কো-লেলিনগ্রাদে আপাতত যাঁরা হৈ-রৈ করছেন, তাঁদের প্রতি মনে-মনে নিবেদন না-ক'রে পারি না, ঐ লোকটাকে তো আটতিরিশ বছরেরও আগে গোর দেওয়া হয়েছে, ওঁকে নিয়ে আর টানা-হেঁচড়া কেন। আন্দোলনের নেতৃত্বের সঙ্গে জনসাধারণের সংযোগ যদি শিথিল হয়ে গিয়েও থাকে, এবং সেই বিচ্যুতির ফলে কতিপয় প্রাচীন প্রণালীর অন্ধ অনুসরণ যদি হয়েও থাকে, এই আটতিরিশ বছর ধ'রে যা-যা পরিশোধন, পরিবর্তন প্রয়োজন ব'লে আপনাদের মনে হয়েছিল, সে-সব যদি ক'রে না উঠতে পারেন, তা হ'লে আত্মধিক্কার দিন, মৃত পিতামহকে গালমন্দ দিয়ে সমাজের কী আর গুণগত পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছেন বা পারবেন? ঐ বহুদিন-নিরাপদে-মৃত বটঠাকুর্দার পন্থা মোটামুটি অনুসরণ ক'রেই সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র একদা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম শক্তি হিশেবে পরিগণিত হয়েছিল, হিটলারের দানববাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে পেরেছিল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে শিখেছিল, শিক্ষাকে সমাজের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত করেছিল, দেশ থেকে কর্মসংস্থানহীনতার পুরোপুরি অবসান ঘটানো হয়েছিল, সামাজিক নিরাপত্তায় বিন্দুতম ফাঁক ছিল না, ন্যূনতম বিচ্যুতি ছিল না শিশু বা বৃদ্ধার পরিচর্যায়ও, প্রতিটি নাগরিকের কাছে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যের সুযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল, সংগীত-সংস্কৃতি-সাহিত্যে জনগণের অখণ্ড অধিকার সোচ্চারে স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়েছিল। নামমাত্র দামে বেইটোফেন-মোৎসার্ট বাখ্-ব্রাহ্মস-চাইকোভস্কির রেকর্ড বা ক্যাসেট গ্রামে-শহরে বিলিয়ে দেওয়া, ধ্রুপদী ব্যালের ঐতিহ্যকে মমতা-শ্রদ্ধা-অনুশীলন-অধ্যবসায় দিয়ে লালন করা, পাশাপাশি লোকনৃত্যের নন্দিত চর্চা। প্রায় বিনিপয়সায়, হরিলুটের মতো, শেক্সপীয়র-পুশকিন-গোগোল-বালজাক গোর্কি প্রভৃতির রচনাবলি কোটি-কোটি কপি ছেপে প্রতিটি পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়া, বিশ্ব অলিম্পিকে অন্তত অর্ধেক স্বর্ণ-রৌপ্য-তাম্র পদক জিতে দেশে ফেরা। সেই সঙ্গে সাধ্যের প্রত্যন্তে গিয়ে পূর্ব ইওরোপকে সাহায্য, অন্যান্য মহাদেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহকে সাহায্য, তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলিকে সাহায্য। তাজাকস্তান, কাজাকস্তান, উজবেকিস্তান, এমনকি তিরিশের দশকেও, মধ্যযুগের অন্ধকারে প'ড়ে ছিল, তাদের হাতে ধ'রে আলোয় টেনে নিয়ে আসা। আর, সবচেয়ে যা আশ্চর্যের, চোখ না রগড়ে উপায় নেই, নিত্যব্যবহার্য জিনিশপত্রের দাম একনাগাড়ে তিরিশ বছর না-বাড়ানো।

অর্থনীতির মূল সূত্র, সীমিত সম্পদ থেকে যাবতীয় চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। সোভিয়েত রাষ্ট্রকেও অনেক-কিছু ছাড়তে হয়েছিল। তা ছাড়া, এটা কী ক'রে ভুলে থাকা যায়, পশ্চিম ইওরোপের দেশগুলি কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে-বিকাশে পৌঁছুতে দুশো বছর অন্তত সময় নিয়েছিল, এবং সাম্রাজ্যবাদী শোষণ থেকে আহৃত ধনৈশ্বর্য যে-বিকাশকে দ্রুততর করতে প্রভূত সাহায্য করেছিল, সোভিয়েত দেশে উন্নতির হার তার কাছাকাছি পর্যায়ে পৌঁছে যেতে পেরেছিল মাত্র কয়েক দশকের চেষ্টায়। বেকারি নেই, মূল্যবৃদ্ধি নেই, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সংস্কৃতির সর্বত্রগামী বিস্তার, মজবুত জঙ্গি ক্ষমতা, প্রযুক্তি প্রতিভায় বিশ্বের প্রায় শীর্ষে। পাশাপাশি অবশ্যই অপূর্ণতা ছিল। খাদ্যপণ্যের উপ-ভোগের সামগ্রীতে বৈচিত্র্যের অভাব, বাস্তুনির্মাণে ঘাটতি, তা ছাড়া, পশ্চিমে যা আখ্যাত হয় স্বাধীনতার পরিবেশ ব'লে, তার বেশ খানিকটা অভাব। নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস, ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস: উপগ্রহনির্ভর প্রযুক্তিকুশলতাহেতু মার্কিন জীবনযাত্রার বহির্সৌষ্ঠব মস্কো-লেনিনগ্রাদের সাধারণ মানুষও জানতে পারছেন-বুঝতে পারছেন, নতুন প্রজন্ম লালায়িত-বিচলিত-চঞ্চল। আন্দোলনের নেতৃত্বে মরচে ধরেছে, তাঁদের চরিত্রে-মানসিকতায় ঘুণ ধরেছিল ব'লেই সম্ভবত নতুন প্রজন্মকে তাঁরা সমাজতন্ত্রের গর্ব-গৌরব-আদর্শের সম্মোহনে গেঁথে রাখতে ব্যর্থ, আস্তে-আস্তে আদর্শজনিত বিচ্যুতি এমন চূড়ান্তে যে কমিউনিস্ট পার্টির সর্বোচ্চ পদে যাঁকে বসানো হয়েছিল, তিনিই গোটা দেশে পার্টিকে নিষিদ্ধ করার জন্য পরম উৎসাহভরে এগিয়ে আসেন, আপাত-অনাসক্তির সঙ্গে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দ্যাখেন দেশটা টুকরো-টুকরো হচ্ছে, তথাকথিত স্তালিনপন্থা বর্জনের পরিণামে সব-কিছু জিনিশপত্রের প্রকট অভাব, বছরে মূল্যমান, কে জানে, হয়তো দশগুণ বাড়বে, খাদ্যের জন্য হাহাকার, কারখানার পর কারখানা কাঁচামালের অভাবে-সরবরাহের অব্যবস্থায় বন্ধ, শহুরে মেয়েদের চোখে মার্কিনি নেশার অঞ্জন, চাই কি বেশ্যাবৃত্তি পরিগ্রহণ ক'রেও স্বপ্নে পৌঁছুনো, পশ্চিম থেকে ধেয়ে-আসা স্বাধীনতার গুঁতোয় মহান্ সোভিয়েত দেশ চূর্ণ-বিচূর্ণ। স্বাধীনতার হু-হু অবাধ হাওয়া, কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ। অর্বাচীন বৃদ্ধদের অন্তহীন পিছুটান, ঠিক পঞ্চাশ বছর পূর্ববর্তী একটি ঘটনা, যা তখন আমাদের আবেগকে উথালপাথাল করেছিল। উক্রেইনের শ্রমজীবী মানুষ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, বুকের রক্ত জল ক'রে, তিরিশের দশকে নীপার নদী জুড়ে এক মস্ত বাঁধ তৈরি করেছিলেন, সেই বাঁধ থেকে উক্রেইন জুড়ে কৃষির জন্য অঢেল সেচের জলের ব্যবস্থা হয়েছিল, যা ঐ অঞ্চলকে সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা ক'রে তোলে, কানায়-কানায় শস্যের উপচে-ওঠা, যে-শস্য গোটা দেশের মানুষকে খাদ্য যোগায়। নীপার বাঁধের উৎস থেকে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনও, যার ফলে উক্রেইন শিল্পে-শিল্পে সমাচ্ছন্ন। ১৯৪১ সাল, অগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহ। হিটলারের দস্যুবাহিনী এগোচ্ছে, প্রথম ধাক্কায় তাদের কিছুতেই রোখা যায়নি, তারা উক্রেইনে ঢুকে,

পড়েছে অতএব নির্দয় সিদ্ধান্ত নিতেই হয়। উক্রেইনে উৎপাদিত শস্যের কানাকড়িও নাৎসিদের ভোগে লাগতে দেওয়া হবে না, কারখানাগুলিতেও উৎপাদন স্তব্ধ ক'রে দিতে হবে। উক্রেইনের শ্রমজীবী মানুষ যে-নিবিড় ভালোবাসায় নীপার বাঁধ নির্মাণ করেছিলেন, সেই দেশপ্রেমেরই সংস্থানে দাঁড়িয়ে, আজ থেকে ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে, বাঁধটি নষ্ট ক'রে দিলেন, ভালোবাসার ধন, কিন্তু কেটে ভাসিয়ে দাও তাকে, বিদেশি শত্রুপক্ষ তা ব্যবহার করার, ভোগে লাগাবার সুযোগ পাবে না।

ঠিক পঞ্চাশ বছর বাদে, সোভিয়েত দেশের কিছু-কিছু নেতা, এবং তাঁদের কিছু-অনুসরণকারী, পুরো দেশটাকেই কেটে ভাসিয়ে দিলেন। কোনো বহিরাক্রমণ নেই, নিজের থেকেই তাঁরা দেশটাকে খান্‌খান্‌ করলেন। প্রত্যক্ষ বহিরাক্রমণ নেই কিন্তু বহিঃপ্রভাব ছিল, আছে। শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থায় সুখ নেই, সমাজতান্ত্রিক জীবনধারাকে দুয়ো দিয়ে স্বাধীনতার দিকে মুখ ফেরানো থাক। বিগত ছ-বছর ধ'রে সোভিয়েত নাগরিকদের স্বাধীনতার আস্বাদ দেওয়া শুরু হয়েছিল, একটু-একটু ক'রে নৈরাজ্য ছড়িয়েছে, জিনিশপত্রের অনটন বেড়েছে, মূল্যবৃদ্ধির হার লাগামছুট, কারখানার পর কারখানা হুটহাট বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে, এক প্রজাতির সঙ্গে অন্য প্রজাতির মতান্তর-মনান্তর সশস্ত্র সংঘাতের রূপ নিয়েছে। এখন শেষের ঘণ্টা বাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্বাধীন সিদ্ধান্ত, এতদূর থেকে আমরা নাক সিটকোবার কে?

অথচ, আদর্শজনিত আবেগের কথা যদি ছেড়েও দিই, সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের সমস্যাটি কিন্তু থেকেই যায়। কার্যকারণ সম্পর্ক যা-ই হোক, অন্য-একটি ঘটনার কথা মনে আসে। ১৯৭১ সালের গোড়ার দিক। কলকাতার যুবকদের একটি বড়ো অংশ সদ্য-শুরু-হওয়া সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর। পাড়ায়-পাড়ায় প্রতিদিন পুলিশের সঙ্গে তাদের খণ্ডযুদ্ধ, এখানে-ওখানে রাতে-বিরেতে তাদের অতর্কিত অভিযান, তাদের বিচারে শ্রেণীশত্রু, এমন-এমন ব্যক্তিদের চোরাগোপ্তা আক্রমণে ঘায়েল করা, সময় অস্থির, সামনের দিকে তাকিয়ে কী আছে কেউই যেন স্পষ্ট বুঝতে পারছি না, শুধু সমরবাবুর সম্পাদিত পত্রিকায় প্রতি সপ্তাহে এই অস্থিতিকে উপচারে সাজিয়ে আরাধনা। আমি তখন দিল্লিতে, তবে প্রতি মাসে গড়ে একবার ক'রে কলকাতায় আসা হয়। হয়তো সেটা ফেব্রুয়ারি মাস, এসেছি খবর পেয়ে এক ভদ্রলোক দেখা করতে এলেন। বহু বছর ধ'রে কমিউনিস্ট পার্টি করেছেন, ছাত্র ফেডারেশনের অন্যতম আদিপ্রতিষ্ঠাতা, নিপাট-নিখাদ ভালো-মানুষ, অনেক ঝড়-জল-ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে গেছেন, আদর্শে অবিচলিত থেকেছেন। তিনি ঈষৎ উদ্‌ভ্রান্ত, তাঁর ছেলে বিপ্লবের আগুনে দীক্ষা নিয়ে অনেকদিন বাড়ি ছাড়া, ঠিক আগের সপ্তাহে শহরের কোথায় দেওয়াল টপকে পুলিশকে এড়াতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে, ধরা প'ড়ে গুলি খেয়ে এখন পুলিশি হাজতে। ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রীর আশঙ্কা, পুলিশি হাজতে থাকলে কয়েকদিনের মধ্যে ওকে পিটিয়ে মেরে ফেলা

হবে, 'বিচারবিভাগীয়' হাজতে সে-ধরনের আশঙ্কা একটু কম। ওঁরা কোথায় শুনেছেন, রাষ্ট্রপতির শাসন এখানে, আমলারাই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিবের সঙ্গে আমার নাকি ভালো পরিচয় আছে, আমি যদি স্বরাষ্ট্র সচিবকে অনুরোধ করি, কাজ হ'তে পারে। স্বরাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলাম, অনুরোধ জানালাম। কাজ হলো, ছেলেটিকে পুলিশি হাজত থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা হলো, ভদ্রলোক আমাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন।

একমাস বাদে ফের কলকাতা এসেছি, নির্বাচনে ভোট দিতে। নির্বাচনের পরের দিন এক বন্ধুর বাড়িতে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। একগাল হেসে তাঁর ঘোষণা, 'এত রক্তপাত আর অশান্তি সহ্য হয় না, এবার ভোটটা, বুঝলেন, ঐ ওদেরই দিয়েছি'। আমি হতভম্ব ; যদিও তাঁদের কেন্দ্রে কমিউনিস্ট প্রার্থী ছিলেন, তা সত্ত্বেও ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রী, সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নিয়ে, ভোট দিয়েছেন যাদের নির্দেশে পুলিশ তাঁদের ছেলের পায়ে গুলি চালিয়েছে, হাজতে অত্যাচার করেছে, সেই দলের প্রার্থীকেই।

বড়ো গোলমেলে এ-সব ব্যাপারস্যাপার, কোন্‌টা শুভ-কোন্‌টা অশুভ, যুক্তি ও বিযুক্তির ফারাক বুঝে ওঠা দায়। হয়তো সেই কারণেই, আমার মতো বুড়ো হাভাতেরা, পুরোনো বিশ্বাসগুলির খুঁটি আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরি, লজ্জার মাথা খেয়ে সমরবাবুর সেই ট্র্যাক্টরের দিনওলা কবিতাটি খুঁজে-পেতে আরেকবার পড়ি, পাড়ার ইয়েলৎসিনদের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে।

দশপ্রহরণধারিণী

ক্রমশ ঝাপসা-হ'য়ে-আসা স্মৃতি। সব মিলিয়ে বড়ো জোর মাসতিনেক ইন্দিরা গান্ধিকে খুব কাছ থেকে দেখবার সুযোগ ঘটেছিল আমার। ১৯৭০ সাল, দেশের প্রধান মন্ত্রী, তার উপর সদ্য-সদ্য মোরারজি দেশাইকে হটিয়ে অর্থ মন্ত্রীর দায়িত্বও কাঁধে তুলে নিয়েছেন, ঊর্ধ্বশ্বাসে ব্যাংক জাতীয়করণ করেছেন, হৈ-রৈ কাণ্ড, নতুন দিল্লির মহলে-মহলে গুজবের ত্রস্ততা, কংগ্রেস দলে অন্তহীন কোঁদল, যন্তরমন্তর রোডে দলের দপ্তর আগলে আছেন যে-বুড়োর পাল, তাঁদের জব্দ করবার জন্য ইন্দিরা গান্ধি না-জানি আরো কী-কী মতলব আঁটছেন। তিনি প্রধান মন্ত্রী, সেই সঙ্গে আপাতত অর্থ মন্ত্রীও, আমি ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কর্তৃক মনোনীত আমলা, সরকারের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা। বাজেট পাশ হবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে অর্থ-মন্ত্রকের দায়িত্ব ইন্দিরা গান্ধি ছেড়ে দিলেন, যশোবন্ত চবন নতুন মন্ত্রী, অর্থমন্ত্রক তার প্রাক্তন স্থৈর্য ফিরে পেল।

ঐ মাত্র তিনটি মাস, প্রায় প্রত্যহ, সকাল-বিকেল দেখা হতো, তিনি মন্ত্রকের দায়িত্বে, আমি আমলা। হয়েছে কি, সেবারকার কেন্দ্রীয় বাজেটে সিন্দুক-আলমারি-তালা ইত্যাদির উপর মস্ত চড়া হারে অন্তঃশুল্ক চাপিয়ে দিয়েছিলাম আমরা। শিল্পপতিব্যবসায়ীরা মহা চিন্তিত, করের হার এত বেশি হওয়ায় বিক্রি নাকি মার খাবে, তাঁদের মুনাফা কমবে, তাঁরা বিবৃতি দিলেন তাঁদের আশঙ্কা জানিয়ে, খবরের কাগজগুলিকে দিয়ে কাঁড়ি-কাঁড়ি সম্পাদকীয় লেখালেন, সেই সঙ্গে প্রধান মন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রীর কাছে আবেদন-নিবেদনের পালা। একবার তাঁর মন যদি ভেজাতে পারেন, তা হ'লে তিনি আমলাদের ব'লে দেবেন, তালাচাবি-আলমারি-সিন্দুকের ওপর করের পরিমাপ একটু লাঘব হবে।

সেই একবারই ইন্দিরা গান্ধি চমৎকৃত করেছিলেন আমাকে। ঘরোয়া আড্ডায় তাঁর জুড়ি ছিল না, মাত্র কয়েকজনকে নিয়ে নিরিবিলি আড্ডা, মজা ক'রে এঁর-ওঁর-তাঁর সম্পর্কে কুটনি কাটছেন, 'ঐ চন্দ্রশেখরটার মধ্যে তোমরা কী দেখছো, ও তো ঘোর বুজরুক, এমন ভাব দেখায় ওর চেয়ে বড়ো সমাজতান্ত্রিক আদর্শবাদী কেউ নেই। কিন্তু ওকে তো পুষছে রামনাথ গোয়েঙ্কা। ঐ যে ওড়িশার বঙ্কা-বিহারী দাসকে দেখছো, লক্ষ কোরো, বিজু পটনায়েকের প্রসঙ্গ তুললেই ওঁর মুখাবয়ব কেমন বাঁকা হ'য়ে যায়। আইফ্যাক্স হলে শেরিডানের সেই প্রহসনটির দারুণ অভিনয় হলো গত বিষ্যুৎবার, আমি গিয়েছিলাম, তোমরা পারলে দেখে নিও; এম পি-দের মধ্যে আমার সবচেয়ে পছন্দ সি. পি. আই.-এর কী-যেন-নাম, সৌম্যদর্শন

ঐ মেননকে, আচ্ছা, ওঁকে অমুক কমিটির সভ্য করলে কেমন হয় ; বিদ্যুতের তো দেশ জুড়ে এত অভাব যাচ্ছে, আমরা যখন ঘর থেকে বেরিয়ে অন্যত্র যাই, আলো-পাখা-এয়ারকণ্ডিশনারগুলি তখন তো বন্ধ ক'রে দিয়ে গেলেই পারি, তাতে তো খানিকটা সাশ্রয় হবে ; গ্র্যাহাম গ্রীনের শেষ বইটা বাজারে এসে গেছে কি, গার্ডিয়ান পত্রিকায় মস্ত রিভিউ বেরিয়েছে ; খেয়াল করেছো কি, মোরারজি ভাইয়ের প্রতিটি বাক্যগঠনে, তা সে যত ছোটোই হোক, অন্তত বার চারেক নিজের উল্লেখ থাকবে ; হরিবিষ্ণু কামাথ বোধহয় আজকাল পানের পরিমাণ একটু বাড়িয়ে দিয়েছেন, সাত-সকালেই চোখ দুটো কেমন লাল হ'য়ে আছে'। ইত্যাদি টুকি-টাকি মন্তব্য, তারই ফাঁকে-ফাঁকে ফাইল সই করছেন, টেলিফোন ধরছেন, চাপরাশি ট্যাবলেট ও জলের গ্লাস নিয়ে হাজির, ওষুধ গলাধঃকরণ করছেন, বাজেট বিতর্কে প্রতিপক্ষীয়দের যুক্তিগুলিকে কী ক'রে খণ্ডন করা যেতে পারে তা দিয়ে একটা-দুটো প্রশ্ন তুলছেন। কিন্তু ঘরে যেহেতু আমরা মাত্র কয়েকজন, আড্ডার মেজাজ, মুখে অল্প হাসি, কখনো-কখনো দুই চোখ জুড়ে কৌতুকের ঝলক, ইন্দিরা গান্ধি কুটনি কাটছেন, আমলাদের কাছেই রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে পরচর্চা করছেন, এঁকে-তাঁকে হুলবিদ্ধ করছেন, মস্ত মজা পাচ্ছেন, পরমুহূর্তে জিজ্ঞেস করছেন, রিভলি সিনেমায় কী ছবি দেখানো হচ্ছে।

তালা-সিন্দুক-আলমারির উপর ট্যাক্সোর বোঝা চাপিয়েছি আমরা, সরকারের রাজস্ব না-বাড়িয়ে উপায় নেই, অপেক্ষাকৃত সংগতিপন্নদের উপর করের মাত্রা বাড়াতেই হবে, অথচ সোলি গোদরেজের মতো একজন-দু'জন শিল্পপতি ইন্দিরা গান্ধিকে ধ'রে প'ড়েছেন, তিনি বিব্রত। বসন্তের বিকেল, বেয়ারারা এইমাত্র চায়ের পেয়ালা-কাজুবাদামের প্লেট সরিয়ে নিয়ে গেছে, ইন্দিরা গান্ধি এক অপ-রাহ্নিক আড্ডা শুরু করলেন, এঁকে-ওঁকে-তাঁকে নিয়ে তির্যক মন্তব্যের ফুলঝুরি। এক ব্যক্তির উল্লেখ থেকে আরেক ব্যক্তির উল্লেখে, প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে, এরই মধ্যে কখন একটি বিশেষ গার্হস্থ্য কাহিনী বলতে শুরু করলেন : 'জানো, সেবার আমাদের এক আত্মীয়কন্যার বিয়ে, বাড়িভর্তি লোকজন, মেয়ের শাড়িগয়না সব-কিছু, বরের জন্য নানা সামগ্রী যা-যা কেনা হয়েছে, তা-ও আমার শোবার ঘরের স্টিলের আলমারিতে বন্ধ। এখন হয়েছে কি, আমার ছোটো ছেলে, সে তখন তো হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ায়, আমার চাবির গোছা নিয়ে খেলতে গিয়ে কোথায় ফেলে দিয়েছে, খোঁজ-খোঁজ-খোঁজ, কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না। আমাদের শিরে সংক্রান্তি ; বিয়ের যাবতীয় জিনিশপত্র ঐ আলমারিতে, অথচ আমার কাছে ডুপ্লি-কেট চাবি নেই ; চাবিওলার পর-চাবিওলা ডাকা হলো, কিন্তু হাজার চেষ্টা ক'রেও আলমারি খোলা গেল না, অবশেষে গোদরেজরা বম্বে থেকে লোক পাঠালেন, তারা এসে আলমারি খুলে দিল ; সত্যি, আমাদের দেশে এখন ওঁরা কত ভালো-ভালো আলমারি-সিন্দুক তৈরি করেছেন। সহসা ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রীর মোহিনী

হাসি, 'এত চমৎকার সব তালা-সিন্দুক-আলমারি তৈরি করেছে, ওদের উপর ট্যাক্সো কি আদৌ একটু কমানো যায় না?'

সোজাসুজি নির্দেশ দিয়ে নয়, স্রেফ ঘরোয়া গল্প ব'লে ইন্দিরা গান্ধি আমাদের হৃদয়হরণ করলেন, সোলি গোদরেজের শিরঃপীড়া ঘুচল, প্রধান মন্ত্রী চাইছেন, করের হার না-কমিয়ে আমাদের উপায় কী। অথচ অমন চমৎকার কৌশলে, কথোপকথনের ছলে আমাদের প্রতি উপরোধ, তেমন মনখারাপ হলো না কারোরই। মহিলার সংহারিণীমূর্তি আমরা পরে দেখেছি। স্বেচ্ছাচারিণী-অত্যাচারিণী ইন্দিরা গান্ধির দেশকে-অতল-সর্বনাশের-দিকে-ঠেলে-দেওয়া বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মকে রূঢ় ভাষায় সমালোচনা ক'রে দিস্তা-দিস্তা প্রবন্ধ লিখেছি, তবু তাঁর সর্বসংহারিণী ভূমিকার পাশাপাশি সেই অন্য-এক ইন্দিরা গান্ধিকেও আমি এখনো চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাই।

যা হ'তে পারত তা অনেক ক্ষেত্রেই হয় না, ইতিহাসের ছলাকলার নিয়ম বড়ো নিষ্ঠুর। অভিজাত ঘরের মেয়ে, অতি মার্জিত রুচি, মেজাজ ভালো থাকলে সুমধুর-ভাষিণী, সাহিত্যে-কবিতায়-চিত্রকলায় গভীর আগ্রহ, বেশভূষায় নৈপুণ্য, সেই সঙ্গে পরিমিতিবোধ, কিয়ৎপরিমাণ সমাজচেতনা, দেশে এত অসংখ্য গরিব এমন ভয়ংকর দুরবস্থায় দিনাতিপাত করছে তা তো ঠিক নয়। বহু গুণাবলির সমষ্টি; ইন্দিরা গান্ধি, এটাও তখন লক্ষ করেছি, প্রচণ্ডরকম অতিথিপরায়ণা, বিকেলে বাড়িতে চা খেতে বলেছেন, ঐ যে একেবারে-ধারে-বসা একটু লাজুক চেহারার ছেলেটি, সে চিকেন স্যাণ্ডউইচ পেয়েছে কিনা সেদিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি। এই মহিলা যদি রাজনীতির বৃত্তির বাইরে থাকতেন, গোটা দেশে নন্দনচর্চার মস্ত বড়ো পৃষ্ঠপোষক হ'তে পারতেন, প্রথাগত সমাজসেবায় অন্যদের জন্য উদাহরণ স্থাপন করতে পারতেন, পাশাপাশি একটি সুখী সচ্ছল পরিবারের মক্ষিরাণী হিশেবে নিশ্চিন্ত-নিরুপদ্রব দিনযাপন করতে পারতেন। আমার মতো কেউ খেদোচ্চারণ করবেন, হায়, সে-রকমটা হ'লে কী ভালোই না হতো।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানের চরণ, আমার কিছু কথা আছে, ভোরের বেলার তারার কাছে। কী কথা ইন্দিরা গান্ধি ভোরের বেলার তারাকে বলতে চেয়েছিলেন, কী বাণী গ্রহণ করেছিলেন সেই তারার কাছ থেকে? অস্বীকার ক'রে তো লাভ নেই, ঘরোয়া ইন্দিরা গান্ধির, আলাপচারিণী ইন্দিরা গান্ধির, ভব্যতানম্রতা-ভূষিতা ইন্দিরা গান্ধির পাশাপাশি সর্বদা বিরাজ করতেন সেই অন্য ইন্দিরা গান্ধি, অন্তঃস্থিত এক অস্থিরতায় কাতর, যাঁর চোখের নীলিমা হঠাৎ মিলিয়ে গিয়ে ক্রূরতায় বর্ণহীন হ'য়ে আসত, তিনি কুটিল থেকে কুটিলতরা হতেন, যাঁকে তিনি শত্রু ব'লে বিবেচনা করেছেন তার চরম সর্বনাশ কী ক'রে ঘটানো যায় সেই উদ্দেশ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করতেন, কোনো নীতি বা সৌজন্যের বালাই রাখতেন না। এক অপ্রচ্ছন্ন অহমিকা, জবাহরলাল নেহরুর একমাত্র সন্তান ও উত্তরাধিকারিণী, কাশ্মীরি

পণ্ডিত সমাজের গর্বিত ঐতিহ্য, ভারতবর্ষীয়রা তাঁদের প্রজাকুল, তাঁদের পরিবারের প্রভুত্ব ছাড়া ভারতবর্ষ টিকতে পারবে না, গোটা দেশ তাঁদের খাশ ভূখণ্ড, তাঁরা নেহরু পরিবারভুক্তরা যদি এই দেশের কোটি-কোটি অর্ধভুক্ত-অভুক্ত-অপুষ্টিহেতু-মুমূর্ষু-নিরক্ষর মানুষগুলিকে দয়া ক'রে বাঁচান, তা হ'লেই তারা বাঁচবে, অন্য-কারো সেই ক্ষমতা নেই। অন্য-কেউ যদি নেহরু পরিবারের একাধিপত্যে বাগড়া দিতে আসে, তাকে দ'লে পিষে মারতে হবে। পিতৃদেব ভারতবর্ষকে গণতান্ত্রিক ধাঁচ দিতে চেয়েছিলেন, কখনো-কখনো পিতৃদেব ভাসা-ভাসা সমাজতন্ত্রের কথাও বলেছেন, ধর্মনিরপেক্ষতার কথা : সে-সব ঠিক আছে, কিন্তু সবচেয়ে আগে পারিবারিক পরাক্রম, এই সব প্রায়-বুনো আর্যাবর্ত-দাক্ষিণাত্যের ভেড়ার পাল যদি নেহরুদের একচ্ছত্র অধিকার মেনে নেয়, তা হ'লে তাদের জন্য বিবিধ হিতসাধন করা যেতে পারে, তবে তারা যদি ত্যাড়া-বাঁকা আচরণ করে, ইন্দিরা গান্ধি কাউকে ক্ষমা বিতরণ করবেন না, তা হ'লেই তাঁর প্রলয়ঙ্করী মূর্তি পরিগ্রহণ।

মানবমানবী-চরিত্রের জটিল রসায়ন বাইরে থেকে বিশ্লেষণ করা দুরূহ, যিনি অন্তরঙ্গ পরিবেশে সৌজন্যের-শিষ্টতার-সুরুচির প্রতিমা, তিনি কী ক'রে অসাধু-অসংস্কৃত চাটুকার-ধান্দাবাজদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতেন, নিজের দেবীরূপ অবলীলাক্রমে বিশ্বাস করতেন, ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে দু-হাতে উৎকোচগ্রহণ করতেন, নয়তো চোখ রাঙিয়ে তাঁদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করতেন, যাঁরাই তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হ'তে চেয়েছেন হয় তাঁদের নির্বিচারে গুলি ক'রে মারতেন নয়তো বিনা বিচারে বছরের পর বছর আটক ক'রে রাখতেন, এ-সমস্ত স্ববিরোধিতার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা সহজে মেলে না। ফিরোজ গান্ধি একটা কথা তাঁর সন্নিকট বন্ধুবান্ধবদের বলতেন : যদি তিনমূর্তি ভবনে এক সপ্তাহ কাটাও তা হ'লে ইন্দিরা-রহস্য বুঝতে পারবে ; অশীতিপর বৃদ্ধ, স্বাধীনতা আন্দোলেন যোগ দিয়ে হয়তো এককুড়ি বছর কারান্তরালে কাটিয়েছেন, অথচ সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণিপাত করছেন জবাহরলালনন্দিনীকে, যিনি তাঁর চেয়ে বয়সে হয়তো পঞ্চাশ বছরের ছোটো, কিন্তু তাতে কী, তাতে কী, তিনি তো দেবীবন্দনা করছেন। এর পর কোন্ মহিলার না মাথা ঘুরে যাবে ? গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ, কিন্তু তা সামন্ততান্ত্রিক নেহরু পরিবারের পূর্বশর্ত মেনে নিয়ে।

শপথ, যে ক'রেই হোক, পারিবারিক শাসন অপ্রতিহত রাখতেই হবে, সেই অঙ্গীকার থেকেই তাঁর বহু বিভঙ্গে ব্যূহগঠন-আক্রমণ পরিকল্পনা কৌশল প্রয়োগ, যার পরিণাম দেশ জুড়ে হিংসা-প্রতিহিংসার বিস্ফোরণ, দুই দশক জুড়ে নিরন্তর, একটির পর আরেকটি সর্বনাশের ঘটনাক্রম, তাঁর নিজের আত্মাহুতি, তাঁর উভয় সন্তানেরও। কিন্তু অহমিকার ঐতিহ্যের হয়তো কোনো উপসংহার নেই, দেশ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাক, পারিবারিক একাধিপত্য যেন অটুট থাকে। সুতরাং সর্বশেষ আপ্রাণ প্রয়াস, শত্রুরা যতই ষড়যন্ত্র করুক, যত চরম আঘাতই হানুক, এই-কিছু-

দিন-আগেও-বিদেশি-নাগরিক-ছিলেন সেই মহিলাকে দেশনেত্রী ক'রে আপাতত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে, পারিবারিক আধিপত্য অটুট থাকলেই দেশ বাঁচবে, অন্যথা নয়। এটাই ইন্দিরা গান্ধির মর্মবাণী।

সুমধুরভাষিণী চটুল-রসালো গল্প-শোনানো গৃহকর্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সঙ্গে এই ভয়ংকর প্রতিজ্ঞার অন্তর্ভেদী রহস্যকে আমি কিছুতেই মেলাতে পারি না।

ধর্ ধর্ ঐ চোর, ঐ চোর, গমচোর

কাবেরী নদীজলে কে গো বালিকা নয়, আপাতত ঐ জলে কর্ণাটক-তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের তাতাথৈথৈ তাতাথৈথৈ। জল নিয়ে যুদ্ধ, কর্ণাটক যথেষ্ট পরিমাণে জল না ছাড়লে তামিলনাড়ুর কৃষকদের সেচের অসুবিধা, আবার তামিলনাড়ুর কৃষকেরা বেশি জল টেনে নিয়ে গেলে কর্ণাটকের সমস্যা। সালিশির জন্য যে-বিচারককে বলা হয়েছিল, তাঁর অন্তর্বর্তী রায় তামিলনাড়ুর সরকার মানতে রাজি, কিন্তু কর্নাটক সরকার অসম্মত। তাই কাবেরীর জল নিয়ে জল ক্রমশ ঘোলা হচ্ছে। এমনিতেই-নড়বোড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্যাম-রাখি-না-কুল-রাখি অবস্থা, দুই রাজ্যের অধিবাসীদের কাউকেই চটাতে অনীহা, অতএব সংবিধানের ১৪৩ সংখ্যক ধারার শরণ নিয়ে রাষ্ট্রপতির মারফৎ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে ফয়সালার জন্য অনুরোধ জানানো।

মন্ত্রী হিশেবে শপথ নেওয়ার মুহূর্তে সংবিধান অক্ষরে-অক্ষরে পালন করবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'তে হয়। আমাদের সংবিধানের বয়ানে-অসংখ্য অসংগতি, এক কাঁড়ি অবিচার, স্ববিরোধিতা, কিন্তু যতদিন তা পাল্টানো না যাচ্ছে, পুঁথিটির প্রতি পোশাকি আনুগত্য না দেখিয়ে উপায় নেই, সংবিধানের চৌহদ্দির মধ্যে থেকেই প্রশাসন পরিচালনা, পাশাপাশি, কেন্দ্র এবং অন্যান্য রাজ্য সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক-নিয়ন্ত্রণ। ছাত্রাবস্থায় আইন পড়তে হয়নি কখনো, কিন্তু সরকারে ঢুকলে প্রাণের দায়েই সাংবিধানিক আইন রপ্ত করা দরকার হয়ে পড়ে। সংবিধানের ১৪৩ নম্বর ধারাটি, কাবেরীর জল নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটিতে যার ভূমিকা প্রধান হয়ে পড়েছে, আমার কাছে তাই পরিচিত সখার মতো; এই এত বছর বাদেও, গড়গড় ক'রে মুখস্থ বলতে পারি: যদি রাষ্ট্রপতির মনে হয় কোনো বিধান বা তথ্যের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে কোনা রাজ্য সরকারের কিংবা কোনো রাজ্য সরকারের সঙ্গে অন্য-কোনো রাজ্য সরকারের, কিংবা একদিকে কেন্দ্র এবং কতিপয় রাজ্য সরকারের সঙ্গে অন্যদিকে আরো-কিছু রাজ্য সরকারের মধ্যে মতদ্বৈধতা দেখা দেয়, তাহ'লে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিষয়টি বিবেচনার জন্য সুপ্রিম কোর্টের কাছে পাঠাতে পারেন, এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন পাওয়ার পর নিজের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে পারেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। খটোমটো ভাষাবিন্যাস, অথচ উপায় কী, আইন-বিধান ইত্যাদি তো ছেলেখেলার ব্যাপার নয়, একটু সাবধানে, কথার হিশেব ক'রে, আঁটঘাঁট বেঁধে মকশো করতে হয়, কোনো ফাঁকফোকর যাতে না থাকে।

তা হ'লে আসল ঘটনায় চ'লে আসি। ১৯৮০ সালের ১৬ জুন, হঠাৎ লোকসভায়

কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীর সমীপে এক 'চটজলদি'—'শর্ট নোটিস'—প্রশ্ন। সাধারণত সদস্যদের দ্বারা প্রশ্ন দাখিল করার অন্তত দু'তিন সপ্তাহ বাদে মন্ত্রী মহাশয়রা সংসদে জবাব দিয়ে থাকেন। 'চটজলদি' প্রশ্নের বেলায় নিয়ম পাল্টে যায়, তেমন গুরুতর কোনো বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা হ'লে অধ্যক্ষ নির্দেশ দিতে পারেন মন্ত্রীকে ঝটপট উত্তর দিতে হবে। এগারো বছর আগে আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে ঐতিহাসিক প্রশ্নটি যিনি করেছিলেন তাঁর নামটি উহ্য রাখলে বোধহয় তেমন ক্ষতি নেই, প্রশ্নটি করার ঠিক এক সপ্তাহ বাদে উক্ত সদস্য এক বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিলেন। সে যাই হোক, প্রশ্নটির বয়ান মোটামুটি নিম্নরূপ : কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দয়া ক'রে জানাবেন কি : (ক) কাজের-বিনিময়ে-খাদ্য প্রকল্প অনুযায়ী পশ্চিম বঙ্গ সরকারকে বিগত আর্থিক বছরে—অর্থাৎ ১৯৭৯-৮০ সালে—যে-পরিমাণ খাদ্যশস্য দেওয়া হয়েছে, তার ব্যবহার সম্পর্কে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যথাযথ হিশেব দাখিল করা হয়েছে কিনা ; (খ) রাজ্য সরকার যদি তা না ক'রে থাকেন, কত পরিমাণ খাদ্যশস্যের হিশেব এখনো দাখিল করা বাকি ; (গ) যদি রাজ্য সরকার যথাশীঘ্র হিশেব না পাঠান, কেন্দ্র তা হ'লে কী-কী ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ভাবছেন? 'চটজলদি' প্রশ্ন, কিন্তু মন্ত্রী মহোদয়ের বিস্তৃত উত্তর যেন তৈরিই ছিল, উত্তর দেওয়ার দায়িত্বে যিনি তাঁর সঙ্গে সুপরামর্শ ক'রেই যেন প্রশ্ন পেশ করা হয়েছিল : (ক) না, পশ্চিম বঙ্গ সরকার খাদ্যশস্য ব্যবহারের ব্যাপারে সন্তোষজনক প্রতিবেদন পাঠাচ্ছেন না ; (খ) ১৯৭৯-৮০ সালে রাজ্য সরকারকে যে-পরিমাণ চাল-গম দেওয়া হয়েছে, তার শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও হিশেব এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি ; এবং (গ) এমন অবস্থা চলতে থাকলে কেন্দ্রীয় সরকার কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প খাতে রাজ্য সরকারকে আরো খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা থেকে বিরত হ'তে বাধ্য হবেন।' কেন্দ্র-রাজ্যের রাজনৈতিক কোন্দল তখন প্রতিদিনের খবর, তা হ'লেও আমরা একটু হকচকিয়ে গেলাম। প্রথমত, অন্যান্য রাজ্যে কাজের-বিনিময়ে-খাদ্যের চাল-গম বিলোনো হয় ঠিকেদারদের মারফৎ, তাদের পাঠানো যেন-তেন চেহারার কাঁচা রসিদ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার অবলীলায় পাকা হিশেব রূপে গ্রহণ ক'রে থাকেন। অন্য পক্ষে পশ্চিম বাংলায় আমরা কাজের-বিনিময়ে-খাদ্য প্রকল্পের চাল-গম পঞ্চায়েতের মধ্যবর্তিতায় বণ্টনের ব্যবস্থা করেছি, হিশেব দাখিলের জন্য বিশদ ফর্ম তৈরি ক'রে দেওয়া হয়েছে, প্রতিটি পঞ্চায়েতকে তালিম দেওয়া হয়েছে, কী ক'রে সেই ফর্ম পূরণ করা হবে, এত পুঙ্খানুপুঙ্খ খাদ্যশস্য ব্যবহারের বিবরণ দেশের অন্য-কোনো রাজ্য থেকেই পাঠানোর রেওয়াজ নেই। তা ছাড়া, আরো মজার কথা, মন্ত্রীমশাই ১৬ই জুন লোকসভায় দাঁড়িয়ে বলছেন ঐ তারিখ পর্যন্ত আমরা আগের-বছর-পাঠানো খাদ্যশস্যের অর্ধেকেরও হিশেব দিইনি ; অথচ ওঁরই মন্ত্রকের গ্রামোন্নয়ন বিভাগের সচিব পয়লা জুন তারিখে আমাদের সরকারের মুখ্য সচিবকে চিঠি

দিয়েছেন, তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন ৩০শে জুনের মধ্যেই আমরা ১৯৭৯-৮০ সালে প্রাপ্ত চাল-গমের পুরো হিশেব পাঠিয়ে দিয়েছি।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিবৃতিতে তাই আমরা ঈষৎ বিচলিত, খানিকটা বিরক্ত। তাঁকে বিনীত চিঠি দেওয়া হলো, তিনি লোকসভায় ভুল তথ্য পরিবেষণ করেছেন, তাঁর নিজের সচিবই তো সরকারিভাবে অন্য কথা বলছেন, এমতাবস্থায় তিনি তাঁর ভুল স্বীকার ক'রে লোকসভায় একটি বিবৃতি দিলে বাধিত হই আমরা। চিঠির কোনো জবাব নেই। তাঁকে আরেকবার চিঠি দেওয়া হলো, এবারও কোনো জবাব নেই। অতএব সোমনাথ চাটুজ্যে মশাইয়ের দ্বারস্থ হওয়া; তিনি যদি লোকসভার অধ্যক্ষকে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন, মন্ত্রীমশাই ভুল উত্তর দিয়ে লোকসভার সদস্যদের বিভ্রান্ত করেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে সভাকে অবমাননা করার প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমতি দেওয়া হোক। মন্ত্রী যে-দলের, অধ্যক্ষও সেই গোয়ালের, সুতরাং সোমনাথবাবুও বিফলমনোরথ; লোকসভার বিবরণীতে লিপিবদ্ধ রইল, পশ্চিম বঙ্গ সরকার গম চোর, কেন্দ্র থেকে পাঠানো গমের পুরো হিশেব দাখিল করেনি।

আমরা উত্তেজিত, ওঁরা দিল্লির তখ্‌ত-ই-তাউসে ব'সে আছেন ব'লেই যা-খুশি তা-ই করবেন আর আমরা মুখ বুঁজে সহ্য করবো, বহুদিন এমন ধারা চলেছে, কিন্তু আর হ'তে দেওয়া যায় না, আপাতত সাংবিধানিক ব্যবস্থার মধ্যেই প্রতি-বিধানের উপায় খুঁজতে হবে। হঠাৎ ১৪৩ নম্বর ধারাটির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হল, আমাদের রাখে-কেষ্ট-মারে-কে গোছের উল্লাস। সংবিধান তো স্পষ্ট বলছে, যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিধান বা তথ্য সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার ও কোনো রাজ্য সরকারের মধ্যে মতদ্বৈধতা দেখা দেয়, তা হ'লে রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলে ব্যাপারটি সালিশির জন্য দেশের সর্বোচ্চ বিচারপতির কাছে পাঠাতে পারেন। অনেক যত্নে অনুচ্ছেদের পর অনুচ্ছেদ সাজিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে চিঠির খসড়া তৈরি করা হলো: মাননীয় রাষ্ট্রপতি অবশ্যই বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারছেন, কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রীর বিবৃতিতে রাজ্য সরকারের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার স্পষ্টতই ভুল তথ্য পরিবেষণ করেছেন, অথচ তাঁরা ত্রুটি সংশোধন করতে সম্মত নন; এই অবস্থায় রাষ্ট্রপতির কাছে আমাদের প্রার্থনা, তিনি সুপ্রিম কোর্টকে নিষ্পত্তি করতে বলুন, আমরা ঠিক বলছি না ভুল বলছি, আমরা যথাযথ চাল-গমের হিশেব দাখিল করেছি কি করিনি।

হৈরৈ ক'রে রাষ্ট্রপতির কাছে আমাদের চিঠি, প্রাপ্তিস্বীকারও এলো প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে। কয়েকদিন বাদে কী কাজে দিল্লি যেতে হয়েছিল, রাষ্ট্রপতি সঞ্জীব রেড্ডির সঙ্গে দেখা: 'হ্যাঁ, তোমাদের চিঠি পেয়েছি, বিবেচনার জন্য সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি'।

এখানেই আসল কৌতুক, জগৎপারাবারে সংবিধানের খেলা। ১৪৩ সংখ্যক ধারা বলছে, রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলে বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের বিবেচনার জন্য

পাঠাতে পারেন। মুশকিল হলো জরুরি অবস্থার সময় সংবিধানের কয়েকটি বিশেষ ধারা খোল-নল্‌চে পাল্টে দেওয়া হয়, সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অদলবদল ঘটে ৭৪ সংখ্যক ধারায়। ফকরুদ্দিন আলি আহমেদের মতো কান ধ'রে ওঠানো যায়-কান ধ'রে বসানো যায়-ডাইনে হেলানো যায়-বাঁয়ে হেলানো যায়-প্রকৃতিসম্পন্ন কোনো শালগ্রামশিলা ভবিষ্যতে রাষ্ট্রপতি না-ও থাকতে পারেন, ঠ্যাটা কেউ এসে যেতে পারেন, তার জন্য ইন্দিরা গান্ধি ভাবলেন, আগে থেকে তৈরি থাকা ভালো। সংশোধিত ৭৪ সংখ্যক ধারায় স্পষ্ট নির্দেশ লিপিবদ্ধ করা হলো, রাষ্ট্রপতির কোনো আলাদা ইচ্ছা-অনিচ্ছা অভিরুচি-বীতরাগ মত-অমত নেই, থাকতে পারে না, রাষ্ট্রপতিকে প্রতি পলে প্রতি মুহূর্তে প্রতি পদক্ষেপে প্রতিটি সিদ্ধান্তে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলীর নির্দেশ-অনুযায়ী চলতে হবে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডল যদি বলেন, দিন বড়ো বিশ্রী রাষ্ট্রপতিকে কবুল করতে হবে দিন বড়ো বিশ্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডল যদি বলেন সূর্যের বরাবরই পশ্চিমদিকে উদয় হয়, রাষ্ট্রপতিকে উচ্চারণ করতে হবে, সূর্য পশ্চিমদিকে প্রত্যহ উদিত হয়। অবশ্য তিনি যদি ছেড়ে-ছুঁড়ে দিয়ে সন্ন্যাস নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তা হ'লে অন্য কথা ; কিন্তু তেমন তো আজ পর্যন্ত ঘটেনি।

সুতরাং রাষ্ট্রপতি সঞ্জীব রেড্ডি অসহায়, আমাদের আর্জিটি তাঁর দপ্তর থেকে ক্যাবিনেট সচিবের দপ্তরে পাঠানো হলো কেন্দ্রীয় সরকারের মতামতের জন্য, কেন্দ্রীয় সরকার সম্মত থাকলেই সুপ্রিম কোর্টকে সালিশ করবার জন্য বলা যেতে পারে। এই অবস্থায়, সপ্তাহ যায়, মাস যায়, আমাদের তরফ থেকে মাঝে-মাঝে রাষ্ট্রপতির দপ্তরে তাড়া লাগানো হয়, লাভ হয় না তাতে, কেন্দ্রীয় সরকারের দশ লক্ষ মাথা-ব্যথা, অত তড়িঘড়ি তাঁরা সিদ্ধান্ত জানাবেন কেমন ক'রে ?

প্রায় ন'মাস বাদে আমরা অবশেষে চিঠি পেলাম। চিঠি পাঠিয়েছেন কেন্দ্রের কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী, অর্থাৎ যাঁর সম্পর্কে আমাদের অভিযোগ, তিনি স্বয়ং। চিঠির বয়ান অতি সংক্ষিপ্ত। রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরিত আমাদের প্রার্থনা কেন্দ্রীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক বিবেচনা ক'রে দেখেছেন, বিবেচনান্তে তাঁরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন আমাদের আর্জির কোনো যৌক্তিকতা নেই, আমাদের দ্বারা উল্লিখিত বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে পাঠানোর কোনো প্রয়োজন আছে ব'লে কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক মনে করেন না, অতএব আমাদের আবেদন অগ্রাহ্য করা হলো।

যাঁর সম্পর্কে অভিযোগ, তিনিই বিচারক, তিনিই ফতোয়া দিয়ে দিলেন তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করা আমাদের অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই, আমরা বাড়ি যেতে পারি। অন্যায়, উদ্ভট, হ'তেই পারে না ? আজ্ঞে না, এটাই ভারতবর্ষের সংবিধান, যদি সংবিধানের চৌহদ্দির মধ্যে থাকতে চান, মানতেই হবে আপনাদের।

মুশকিল হলো, একটা সময় আসবে, হয়তো পাঁচ-দশ বছরের মধ্যেই আসবে,

যখন দেশের মানুষজন সংবিধানের অদ্ভুতকিম্ভূত নির্দেশাবলির দিকে আর ফিরেও তাকাবেন না, নিজেদের মতো ক'রে তাঁরা বিধান তৈরি ক'রে নেবেন, যে-বিধানে অন্তত কিছু মানবিকতা, কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি, কিছু অবৈকল্য থাকবে। নতুন অর্থ মন্ত্রী তো ঘোষণাই ক'রে দিয়েছেন, মুক্তিযুদ্ধের দিন ফের সমাগত।

বনে নয়, আমেরিকায়

উনিশশো আটাত্তর সালের মাঝামাঝি। দারুণ উৎসাহ আমাদের, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হ'তে যাচ্ছে এই রাজ্যে। তারও সতেরো বছর আগে একটি পঞ্চায়েত আইন বিধিবদ্ধ হয়েছিল, ঠিক সাধারণ নির্বাচনের মতো ব্যবস্থা করা হবে, একুশ বছর হ'লেই ধনী-গরিব জমিদার-জোতদার-ভাগচাষী-মুনিশ নির্বিশেষে স্ত্রী-পুরুষ ভোট দিয়ে পঞ্চায়েতে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন, এই প্রতি-নিধিরাই গ্রামীণ প্রশাসনের দায়িত্বে থাকবেন। বিধিবদ্ধ হওয়া পর্যন্তই, সতেরো বছর ধ'রে ঐ আইন চালু করার ব্যাপারে কারো মাথাব্যথা দেখা যায়নি, চালু করার অনেক বিপদ, গাঁয়ের মোড়লগিরি জোতদার-মহাজনের হাত থেকে গরিবগুর্বোদের হাতে চ'লে যাবে, এদেরই তো সংখ্যাধিক্য, অথচ কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা মন্দ এই মুখ্যুশুখ্যু মানুষগুলি কী জানে।

ঠেলায় প'ড়ে সেই সতেরো বছর আগে আইনটা পাশ করা হয়েছিল যদিও, ঐ পর্যন্তই, রাজ্যের পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় পুরোনো আমলই জারি ছিল এতদিন: জমিদার-মহাজনরা বি. ডি. ও.-দের সঙ্গে মিতালি ক'রে, কিংবা বি. ডি. ও. মশাইরা জমিদার-মহাজনদের সঙ্গে মিতালি ক'রে, পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে যা করবার করছিলেন, গোটা পশ্চিম বাংলার পঞ্চায়েতের জন্য সরকারি বরাদ্দ বছরে মাত্র তিন কোটি টাকা, বিশেষ-কিছু করার সুযোগও তাই ছিল না তেমন। কিন্তু এবার নতুন যুগের ভোর।

জমানা পাল্টেছে। আইনেও আপাতত বড়োগোছের সংশোধন করার দরকার নেই, করতে গেলে দেরি হবে, পুরোনো আইনেই নির্বাচন হোক, ত্রিস্তর ব্যবস্থা, গ্রাম পঞ্চায়েত কয়েকটি গ্রাম জুড়ে, তারপর প্রতি ব্লকের জন্য পঞ্চায়েত সমিতি, সবার উপরে জেলা পরিষদ। তিনটি স্তরেই উন্নয়ন দ্রুততর করার উদ্দেশ্যে সরকারের তরফ থেকে টাকা দেওয়া হবে, অনেক, অনেক টাকা, গাঁয়ের মানুষজনের উন্নতিবিধানের জন্য সাধ্যের প্রত্যন্তে গিয়ে অর্থসংস্থান, রাজ্যের চার-পঞ্চমাংশ মানুষ গাঁয়ে বাস করেন, সুতরাং কেনই বা না। গোটা রাজ্যে পঞ্চায়েতের জন্য এতদিন বরাদ্দ ছিল বছরে মাত্র তিন কোটি টাকা, আমরা সেটা এক লাফে বাড়িয়ে তিনশো কোটি টাকা করবো, তারপর পাঁচশো কোটি টাকা, তারও পরে হাজার কোটি টাকা, এমনি ক'রে বাড়িয়ে-বাড়িয়ে যেতে হবে। তা ছাড়া স্থানীয় ভিত্তিতে পঞ্চায়েত প্রশাসনও কিছু-কিছু আয়ের সংস্থান করবেন, হাল্কা-গোছের একটা-দুটো কর বসিয়ে। আসল কথা হলো সিদ্ধান্ত তথা অর্থবিন্যাসের বিকেন্দ্রীকরণ।

যে-পরিমাণ টাকাই গাঁয়ের জন্য খরচ করা হোক না কেন, কোথায় কীভাবে খরচ করা হবে, তা এখন থেকে স্থির ক'রে দেবেন গাঁয়ের মানুষেরাই, যেহেতু তাঁদেরই সংখ্যাধিক্য, পঞ্চায়েতে তাঁদের দ্বারা সাক্ষাৎ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যবর্তিতায়। কোন্‌টা করণীয়—কোনটা নয় তা রাইটার্স বিল্ডিংয়ের ফরমান অনুযায়ী আর নির্ণয় করা হবে না, গাঁয়ের মানুষ যে-অগ্রাধিকার বাৎলে দেবেন, তা-ই শিরোধার্য, তারই ভিত্তিতে টাকা-পয়সা বরাদ্দ হবে, অমুক গাঁয়ে এই মুহূর্তে একটা রাস্তা চাই না সাঁকো চাই না কি জলনিকাশী ব্যবস্থা না নতুন একটা স্কুলবাড়ি, তা নিয়ে এখন থেকে কলকাতায় ব'সে আর মাথা ঘামাতে হবে না কারো, পঞ্চায়েত থেকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এত-এত কাজ এত-এত বছর ধ'রে করা হয়নি, গ্রামগুলির দিকে ফিরেও তাকাননি যাঁরা রাজ্যের প্রশাসনের মাথা জুড়ে ছিলেন, এবার দিন-বদলের পালা, পালা-বদলের পালা, গ্রামীণ উন্নতির জন্য পঞ্চায়েত পরিকল্পনা করবে নিজেদের পছন্দমতো, সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মসূচীও রূপায়িত করবে তারাই, কত টাকা কোন্ খাতে খরচ হলো তার হিশেবও রাখবে তারাই, সেই হিশেব প্রতি মাসে পঞ্চায়েত দপ্তরের বাইরে টাঙিয়ে দিতে হবে, গাঁয়ের মানুষজন যাতে ওয়াকিবহাল থাকেন তাঁদের জন্য বরাদ্দ টাকা ঠিক-ঠিক খরচ হচ্ছে কিনা, তাঁদের অভীষ্ট-অনুযায়ী খরচ হচ্ছে কিনা। ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতি থেকে বড়ো জোর কোনো ওভারসিয়ারবাবুকে পাঠানো হবে প্রকল্পগুলির প্রযুক্তিগত দিক বিবেচনা ক'রে দেখার জন্য, হয়তো পঞ্চায়েত সমিতি কিংবা জেলা পরিষদ থেকে একজন হিশেব পরীক্ষক এসে হিশেব কী ক'রে রাখতে হবে তা একটু-আধটু শিখিয়ে-পড়িয়ে দিয়ে যাবেন, তবে ঠিকাদারদের আর গাঁয়ের ত্রিসীমানায় ঢুকতে দেওয়া হবে না. কোন্-কোন্ কাজ করতে হবে, তা নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়ার পর সেই-সেই কাজে নিয়োগ করা হবে গাঁয়ের জোয়ানবয়সী ছেলেমেয়ে-দের, কর্মসংস্থানের অভাবে যারা এতদিন ধুঁকছিল। গাঁয়ের টাকা গাঁয়ে থাকবে, সেই টাকা গাঁয়ের ছেলেমেয়েদেরই করতলগত হবে, আর সেই টাকা দিয়েই গাঁয়ে জোড়বাঁধ হবে, শস্যগোলা হবে, আল ছাওয়া হবে, মোরাম-ছাওয়া রাস্তা হবে ইত্যাদি-ইত্যাদি। এতদিন পর্যন্ত এক-একটি গ্রামীণ পঞ্চায়েত সারাবছরের জন্য সরকার থেকে পেত বড়ো জোর দুই কি তিন হাজার টাকা, এখন থেকে পাবে পঁচিশ কি পঞ্চাশ হাজার টাকা, দুই কি তিন লক্ষ টাকা ক্রমশ আরো বেশি!

আমাদের তর সইছে না, পুরোনো আইনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়ে যাক, কালক্ষেপণ মহা অপরাধ হবে, আইনে যা-যা অসম্পূর্ণতা আছে আস্তে-ধীরে সংশোধন ক'রে নিলেই হবে। উনিশশো আটাত্তর সালের জুন মাস, পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হয়েছে, প্রচার চলছে, জেলায়-জেলায় মহকুমায়-মহকুমায় গ্রামে-গ্রামান্তরে চ'ষে বেড়াচ্ছি আমরা। দুর্গাপুর থেকে মাইলকয়েক দূরে এক গ্রামে, প্রায় বাঁকুড়া সীমান্ত ঘেঁষা, সন্ধ্যার অন্ধকার প্রগাঢ় হয়ে এসেছে, সন্ত

বক্তৃতা সাঙ্গ করেছি। ঝেঁটিয়ে গরিবগুর্বোরা এসেছেন কাছাকাছি এবং দূরবর্তী গাঁ থেকে, তাঁদের উৎসাহ বর্ষার পাড়ভাঙা নদীর মতো উপ্‌চে পড়ছে, উচ্ছ্বাসের বন্যায় যারা বক্তৃতা দিচ্ছি তারাও ভেসে যাচ্ছি। এক ঘণ্টার বক্তৃতায় অনেক সমস্যার বুড়ি ছুঁয়ে যাওয়া হলো, দেশের সর্বাঙ্গীণ রাজনৈতিক-আর্থিক পরিস্থিতি, ভূমি-সংস্কারের আকীর্ণ প্রয়োজনীয়তা, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক, বিকেন্দ্রীকরণ, গণতন্ত্র ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে গ্রামবাসীদের কোন্‌-কোন্‌ স্বপ্নকে এবার সফল করা সম্ভব হবে, গ্রামবাসীদের দায়িত্বও সেই সঙ্গে কী পরিমাণ বাড়ল, এ-ধরনের নানা কথা। বক্তৃতাশেষে যথাবিহিত হাততালি, একটু দ্রুততার সঙ্গে মঞ্চ থেকে নেমে এসেছি, দশ মাইল দূরে বড় জোড়ার কাছাকাছি আরেক গ্রামে সভা চলছে, সেখানে পৌঁছুনোর তাড়া। আঠারো-উনিশ বছরের একটি ছেলে, সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা যেমন দেখতে হয়, বেশ রোগাই, চোখে চশমা, একটু কুণ্ঠিতভাবে পথ আটকাল। যদি কিছু মনে না করেন, একটা প্রশ্ন করতে পারি ? সন্দেহ হলো আমার বক্তৃতার কোনো একটা জায়গায় তার খটকা লেগেছে, হয়তো জেলা পরিষদ-পঞ্চায়েত সমিতি-গ্রাম পঞ্চয়েতের সম্ভাব্য পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে স্পষ্ট বুঝিয়ে উঠতে পারিনি, কিংবা হয়তো জিজ্ঞেস করবে আমরা রাইটার্স বিল্ডিং থেকে প্রতি বছর যত টাকা পঞ্চায়েতগুলিতে পৌঁছে দেবো ব'লে বলছি, সেই প্রতিশ্রুতি সত্যি-সত্যি রক্ষা করতে পারবো কিনা। দাঁড়িয়ে পড়লাম ওর প্রশ্নের অপেক্ষায়। ও হরি, এর চেয়ে বড়ো ছন্দপতন আর-কিছু হ'তে পারে না : 'আচ্ছা, তমুকচন্দ্র অমুক কি সত্যিই এ-বছর নোবল প্রাইজ পাচ্ছেন ?' নিজেকে হঠাৎ খুব অকিঞ্চিৎকর ঠেকল। তমুকচন্দ্র অমুক, অর্থনীতিবিদ, কোনো মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনরত, ছেলেটি খবরকাগজের পৃষ্ঠায় বোধহয় উল্লেখ দেখেছে এক ভারতীয় অর্থনীতিবিদকে সে-বছর বিবেচনা করা হচ্ছে উক্ত মায়াবী পুরস্কারের জন্য, ছেলেটির কৌতূহল হৃদয়ের একূল-অকূল দুকূল ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য এ-মুহূর্তে আমাকেই উপযুক্ততম ব'লে বেছে নিয়েছে। দেশের-গ্রামের সমস্যা নিয়ে তার ঔৎসুক্য নেই, পঞ্চায়েত দেশে কী জাদু ঘটাবে তার ব্যাখ্যা শুনতে তাঁর অনাগ্রাহ, এই সভায় সে এসেছে সমাজের গরিবগুর্বোদের সঙ্গে একাত্মবোধের অনুপ্রেরণা থেকে নয়, একটি বিশেষ ভিন্‌দেশি পুরস্কার আমাদের এক দেশবাসী সত্যি-সত্যি পাচ্ছেন কিনা সে-বিষয়ে ওয়াকিবহাল হওয়ার উদ্দেশ্যে। চুপ্‌সে গেলাম, নিজেকে খুব বোকা-বোকা মনে হলো। এতক্ষণ ধ'রে মুখে ফেনা তুলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা নিয়ে এত কথা বলা হলো, ছেলেটির এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে তা বেরিয়ে গেছে, তমুকচন্দ্র অমুকের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাব্যতায় বাইরে উপস্থিত মুহূর্তে তার অন্য-কোনো চিন্তা নেই।

গত বারো-তেরো বছর ধ'রে, জীবনানন্দ দাশের সেই বিখ্যাত বিড়ালের মতো,

দুর্গাপুরের-উপকণ্ঠে-সদ্য-তারুণ্যে-উপনীত ঐ ছেলেটির উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন আমাকে তাড়া ক'রে ফিরেছে। ছেলেটিকে দোষারোপ করা গর্হিত অপরাধ হবে, যে-পরিবেশে সে বেড়ে উঠেছে, তার মনে ভিড়-ক'রে-আসা প্রশ্নাবলি তার অভিব্যক্তি মাত্র। মধ্যবিত্ত মানসিকতা, মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ। দশকের পর দশক জুড়ে, পরাধীনতার মলিন থেকে মলিনতর ঋতুতে, মাথা খুঁড়ে মরতাম আমরা, আমরা নিছক ইংরেজদের দাসানুদাস নই, আমাদের অন্য পরিচিতি আছে, পৌরুষ আছে, ঐতিহ্য আছে, আমাদের সাহিত্য-নৃত্যকলা-ভাস্কর্য তাদের আলাদা দ্যুতিতে ভাস্বর, হাজার-হাজার প্রতিভাবান্-প্রতিভাবতী এখনও আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করছেন, হায়, পৃথিবী কেন তাঁদের কথা জানতে পারছে না। পরাধীন দেশ, জগৎসভায় তা সত্ত্বেও যদি নিজেদের কীর্তির ভিত্তিতে একটু যশ বা স্বীকৃতি কুড়োনো যায় তার জন্য আমাদের অস্থির আকুলি-বিকুলি।

দেশ যদিও স্বাধীন, এখনো পুরোনো মানসিকতায় জড়িয়ে আছি আমরা। ঐ বাচ্চা ছেলেটিকে নিন্দাবাদ ক'রে লাভ নেই, প্রায় সর্বস্তরে ভিন্‌দেশি তারিফের জন্য আমাদের অহোরাত্রিদিন উদ্বেগ। ঘোর বামঘেঁষা সমাবেশে গিয়েও শুনতে হয়, এবার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ক-বাবু বা খ-বাবু আপনাদের কাছে তাঁর মূল্যবান ভাষণ রাখবেন, আপনারা গর্ববোধ করুন। সত্যজিৎ রায় কাপুরুষ না মহাপুরুষ, তা স্থির করতে গেলেও সাহেবদের লেখা বই থেকে আমাদের উদ্ধৃতি দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

গত কুড়ি বছরে অবশ্য আলাদা এক ঢল নেমেছে। ভুল কারণে হোক, ঠিক কারণে হোক, আদর্শবোধ, দেশপ্রেম ইত্যাদির প্রতি অপেক্ষাকৃত সচ্ছল শ্রেণী-ভুক্তদের এখন গভীর অনীহা, যে-নাস্তিকতা এখন অন্য শ্রেণীর মানুষজনদের মধ্যেও ছড়াচ্ছে। রাজনৈতিক নেতাদের সম্পর্কে, সামগ্রিক রাজনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থাদি সম্পর্কে, এক ঘৃণা-মেশানো তাচ্ছিল্যবোধ, বিবেকহীন লজ্জাহীন নেতারা লুটে-পুটে খাচ্ছেন, এই দেশে কিছু হবার নয়। অতএব কোনো বাধা-বন্ধন নেই, আমাদের প্রতিভার যোগ্য সমাদর মিলবে যে-দেশে, যেখানে সুযোগের-সুবিধার অভাব নেই, চলো, সেই দেশে যাই। মস্কো-ওয়ারস-বুদাপেস্ট থেকে সবাই ধেই-ধেই ক'রে নাচতে-নাচতে আমেরিকা যাচ্ছে, আমরাই বা যাবো না কেন।

ছেলে গেছে বনে? না, বনে নয়, আমাদের ছেলেরা আমেরিকা যাচ্ছে। কয়েকমাস আগে দেশের এক প্রধান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়ে-ছিলাম। কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত বিদ্যালয়, ঢালাও পয়সাকড়ি, মুখ্য উদ্দেশ্য আধুনিকতম প্রযুক্তির সারাৎসার নিয়ে চর্চা-গবেষণা-অনুশীলন। দেশের সবচেয়ে উজ্জ্বল ছেলেমেয়েদের বেছে-ছেঁকে এখানে ভর্তি করা হয়, চার বছর বাদে যখন উত্তীর্ণ হ'য়ে বেরোয়, ওদের কাজ দেওয়ার জন্য দেশ জুড়ে কাড়াকাড়ি প'ড়ে যায়। প্রযুক্তি মহাবিদ্যালয়ের মস্ত প্রেক্ষাগৃহ, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত, শব্দব্যবস্থা ত্রুটিহীন,

বক্তৃতাশেষে ছেলেমেয়েরা অনেকে বুদ্ধিদীপ্ত, চোখা-চোখা প্রশ্ন রাখছে, পাশে-বসা অধ্যক্ষ মহোদয়কে আমার ফিশফিশ প্রশ্ন : প্রতি বছর যত ছাত্রছাত্রী পাশ ক'রে বেরোয়, তার কত অনুপাত প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে আমেরিকা বা ইওরোপ চ'লে যায়? শতকরা পাঁচ ভাগ, দশ ভাগ? আমার অজ্ঞতায় অধ্যক্ষ মহোদয়ের তির্যক, কৃপামিশ্রিত হাসি, তার সগর্ব উত্তর : 'সব মিলিয়ে শতকরা অন্তত সত্তর থেকে পঁচাত্তর ভাগ'। আরো জ্ঞানালোকিত হলাম, আগে কে বা প্রাণ করিবেক দান, মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে দরখাস্ত পাঠানোর জন্য ছেলেমেয়েদের হুড়োহুড়ি, সদাশয় কর্তৃপক্ষ তাই বেসরকারি বার্তাবাহী সংস্থার জন্য বিশেষ সরকারি ভরতুকির ব্যবস্থা করেছেন, ছেলেমেয়েদের আবেদনপত্রগুলি অতি দ্রুততায় সেই সংস্থা মার্কিন দেশে পাঠিয়ে দেয়। তা ছাড়া, সরকারি টাকায় কেনা কম্পিউটারগুলি তো প'ড়েই আছে, ছেলেমেয়েরা কম্পিউটার মারফৎও তাদের দরখাস্ত আমেরিকায় পাঠাচ্ছে। সরকারি ব্যবস্থাপনায়, গরিবগুর্বোরা যে ট্যাক্সোর টাকা সরকারকে দিয়ে থাকে, তার যথার্থতম সদ্ব্যবহার আর কী হ'তে পারে। আন্তর্জাতিক খ্যাতি, আন্তর্জাতিক সাচ্ছল্য, দেশের টাকায় লেখাপড়া শিখেছে ব'লে তো আর নিজেদের ভবিষ্যৎ তারা কেঁচে গণ্ডুষ করতে পারে না।

পিত্‌লে কৈবর্তের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

জমিদারের খাশ প্রজা প্রতুল কৈবর্ত, ছেলেবেলায় সামান্য চিনতাম, ছ-ছটাক জমিতে চাষ করত। কিন্তু বিচারবিবেচনার অভাব। জমিদারগৃহিণীর ওলাওঠা না ঐ জাতীয় কোনো কঠিন রোগ হল, সেরে উঠবার সম্ভাবনা ছিল না একটা সময়ে, ধন্বন্তরী চিকিৎসকরা কোনোক্রমে বাঁচিয়ে তুললেন। খোদ কর্তামার এখন-তখন অবস্থা, এ-গ্রাম ও-গ্রাম থেকে ঝেঁটিয়ে আসা প্রজাকুলের ভিড়, জমিদারপ্রাসাদের অঙ্গনে সর্বব্যাপী উৎকণ্ঠা, সবাই সমান উৎকণ্ঠিত না হ'লেও অন্তত ভাণ করতে হয়, সামন্ততন্ত্রের বাইরের ঠাটটি বজায় রাখতে গেলে এই ধরনের সমারোহ প্রয়োজন। কিন্তু জমিদারবাড়িতে ঐ সংকটের দিনগুলিতে প্রতুল একদিনও ঘুরে যায়নি, কে জানে কোন্‌ ধান্দায় সে ছিল। পরে অবশ্য শোনা গিয়েছিল তার তিন বছরের মেয়েটা চারদিনের জ্বরে বিনা চিকিৎসায় ওরই মধ্যে মারা যায়; শোকে, সেই সঙ্গে অপুষ্টিহেতুও, তার বৌটিও গত হয় দিন পনেরো বাদে। বছর ঘুরতে প্রতুলচন্দ্রকে অবশ্য আসতেই হলো জমিদারি সেরেস্তায়, খাজনা আর ভাগের চাল জমা না-দিয়ে উপায় আছে। নায়েব মশাই ছাড়বার পাত্র নন, 'বলি, হ্যাঁরে পিত্‌লে, তুই তো লজ্জাশরমের মাথা খেয়েছিসই, কিন্তু তোর কি বিবেক ব'লেও কিছু নেই? কর্তামার এমন কঠিন রোগ গেল, সবাই আসতে পারল, শুধু তুই হতভাগা সময় ক'রে উঠতে পারলি না?' প্রতুলচন্দ্রকে মানতেই হল তাঁর ঘোর অপরাধ হয়েছে, না মানলে ঐ ছ-ছটাক জমিও কেড়ে নেওয়া হবে, নিচু হয়ে ঘাড় চুলকে তার সসম্ভ্রম নিবেদন, 'আজ্ঞে কর্তা, পরের বার আসবো'।

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি, কত বড়ো আস্পর্ধা এই চাষাটার, যে কর্তামার আরেকবার ওলাওঠা রোগ কামনা করছে। ভয়-খাওয়া মুখ্যু-শুখ্যু বিচারবিবেচনাহীন প্রজাটিকে ক্ষমা করার প্রশ্ন নেই, ছোটোলোকগুলিকে লাই দিলে তারা মাথায় চ'ড়ে বসে। অতএব প্রতুলচন্দ্রকে সম্যক পরিমাণে প্রহারের ঔষধবটিকা খাওয়ানো, শাস্তিস্বরূপ তার ছ-ছটাক জমিও শেষ পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হলো।

মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে এবংবিধ ঘটনা আমাদের জননী বঙ্গভূমিতে অহরহ ঘটত, বিহার-উত্তর প্রদেশ-মধ্য প্রদেশ-রাজস্থানে এখনও ঘটছে। পঞ্চাশ বছর আগে গ্রামে-গঞ্জে যে-সমস্ত দুঃশাসনীয় ব্যাপার ঘটছিল, ঘটছিল আসলে যুগের পর যুগ ধ'রে, তাদের বিরুদ্ধে কলম নিয়ে সোচ্চার হ'তে শুরু করলেন মানিকবাবু ও তাঁর সহযোগী লেখকেরা, বাঙালী মধ্যবিত্ত চেতনার কষ্টিপাথরে ন্যায় থেকে অন্যায়ের ক্রমশ পৃথগীকরণ, কোন্‌টা উচিত কোন্‌টা অনুচিত, কোন্‌টা ধর্ম কোন্‌টা অধর্মতা

প্রথাগত অভ্যাস দিয়ে নির্দিষ্ট না হয়ে নতুন অন্বীক্ষার ঘেরাটোপে আটকা পড়ল। 'পুতুল নাচের ইতিকথা' মানিকবাবুর প্রথম পর্বের রচনা, যখন তিনি নাকি পুরোপুরি কমিউনিস্ট ব'নে যাননি, কাহিনীর মধ্যবর্তিতায় সমাজবিন্যাসের বিশ্লেষণে অথচ তা হলেও কোনো খামতি নেই। জমিদার পুকুর কাটিয়ে দিয়েছেন, চমৎকার টানা দীঘল পুকুর, গ্রামসুদ্ধ মানুষ সেই পুকুরে চান করে, জমিদারবাড়ির ছেলেরা দল বেঁধে এসে বহু সময় ধ'রে দাপদাপি করে জলে, তাদের প্রস্থানের পরও তাই বাঁধানো ঘাটের কাছে জল অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘোলাটে হয়ে থাকে। এখানেও বিবেচনার অভাব, একটু-বেলা-ক'রে-আসা জনৈক স্নানার্থীর ঘাটে-পাহারারত জমিদারের পেয়াদার কাছে মৃদু অনুযোগ : 'দারোয়ান সাহেব, বাড়ির ছেলেদের দয়া ক'রে যদি একটু বলতে পারো জলে ঝাঁপাঝাঁপি-লাফালাফি যাতে একটু কম করে?' এমনতরো অযৌক্তিক আর্জি জমিদারের পেয়াদা কস্মিন্‌কালেও শোনেনি, তার সংক্ষিপ্ত, সুতীক্ষ্ণ উত্তর : 'পুকৌর কিস্‌কা, তেরা বাপকা?'

হুবহু উদ্ধৃতি হলো না, কিন্তু বর্ণনাটির মূলের সঙ্গে বিশ্বস্ততার অভাব নেই, ঐ সময়কার সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক পরিস্থিতির একটি নিখুঁত প্রতিবিম্ব। একেবারে খাঁটি কথা, জমিদারি ব্যবস্থায় জমিদারসন্তানেরা যথেচ্ছ আচরণ করবেন, তাঁদের নিজস্ব বিষয়সম্পত্তি-পয়সাকড়ি নিয়ে যা খুশি তাই, তোমরা প্রজা-গোছের ওঁচা লোকেরা খুঁত ধরবার কে হে, তেমন-বেশি যদি ফষ্টিনষ্টি করতে আসো তা হ'লে শূলে চড়িয়ে দেবো, মাঝরাত্তিরে ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে আসবো, ঝি-বৌদের তুলে নিয়ে আসবো, দারোগা-বরকন্দাজ সমভিব্যহারে চড়াও হয়ে গিয়ে খুন ক'রে লাশ চরে পুঁতে দিয়ে আসবো।

কল্পনার ডালপালা এবার মেলে ধরুন, ভারতবর্ষ একটি মস্ত-বৃহৎ জমিদারি চৌহদ্দি, আর জমিদারের সেরেস্তা নতুন দিল্লিতে, সেরেস্তাখানা থেকে যদি বলা হয় জল উঁচু, দেশের অন্যত্র আমাদের সবাইকেও বলতে হয় জল উঁচু, ওঁরা যদি বলেন জল নিচু আমাদেরও উক্তি তথৈবচ, প্রতুল কৈবর্তের মতো বোধবুদ্ধিহীন আর ক-জন? জমিদারের ছেলেদের মাঝে-মধ্যে প্রাণে শখ জাগে, তারা ধারকর্জ ক'রে একটু ফুর্তিফার্তা করতে চায়। শহর-শহরতলির যে-মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে বেপরোয়া টাকা ধার, তাদের কাছে অবশ্য বলা হয় ধারের টাকায় ফলন বাড়ানো হবে, শহর থেকে উন্নত বীজশস্য কেনা হবে, সার-কীটনাশক ওষুধ কেনা হবে, সেচের প্রসার ঘটানো হবে, ফলন বাড়লে খাজনার সংগ্রহও বাড়বে, ধারের টাকা শোধ দিতে তাই আদৌ কোনো সমস্যা দেখা দেবে না।

তবে এটাও জমিদারি ব্যবস্থার অমোঘ নিয়তি, কিছু গুণ হয়তো একদা ছিল, এখন ঘুণের পালা। ধার-করা টাকায়, ঐ যা কবিসম্রাট বলেছেন, 'প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন', সম্ভোগের জিনিশপত্র প্রচুর কেনা-কাটা হয়, বাহিরবাড়িতে ঝাড়লণ্ঠনের আলোঝলমল ঐশ্বর্যবিচ্ছুরণ, লোক-দেখানো লোক-খাওয়ানো, নাটক-

যাত্রা-জলসা। ফলন বাড়ে না, কারণ বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনানুগ কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। এখন ধার শোধের সময় এসে গেছে, অথচ হাতে এক কড়ি পয়সা নেই। জমিদারি সেরেস্তায় শিরঃপীড়া, এমন অসুবিধায় তো পড়বার কথা ছিল না। তবে ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়, যারা প্রথমবার ধার দিয়েছিল তাদের কাছেই ফিরে যাওয়া : বাপুরা হে, আমরা অসুবিধায় পড়ি তোমরাও তো সেটা ঠিক চাইছো না, তোমরা মহাজন-আমরা ভূস্বামী, আমাদের পারস্পরিক শ্রেণীস্বার্থে তেমন বৈপরীত্য নেই, আমরা যদি টিকে না-থাকি, যদি দেশটা ছোটো-লোকগুলির হাতে চ'লে যায়, তা হ'লে তোমাদের আর মহাজনী কারবার ক'রে খেতে হবে না। অতএব আমাদের, জমিদারদের, আরেক দফা ফের ধার দাও, নতুন কিস্তির ধার দিয়ে পুরোনো কিস্তির ধার তো আপাতত শোধ করি। এবার হয়তো সুদের মাত্রা একটু চড়া, তা কী আর করা। ঋণের শর্ত হিশেবে মহাজনরা কিছু জামিন চাইবে হয়তো, ওদের কাছে কিছু বিষয়আশয়-ঘটিবাটি বন্ধক রাখতে হবে। সুদের হ্যাপা সামলানো চারটিখানি কথা না, ধার-করা অঙ্কের পরিমাণ ক্রমশ বাড়ে, সুদের হারও সেই সঙ্গে, উপায় কী, প্রজাপুঞ্জকে সুতরাং অধিকতর ত্যাগস্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়, আরো তাদের বেশি ক'রে খাজনা দিতে হবে, তাদের ভুলে গেলে চলবে না জমিদারি টিকলেই তারাও টিকবে, জমিদারের পেয়াদা-বরকন্দাজরা যদি পাহারায় না থাকত, তবে ডাকাতরা চড়াও হয়ে তাদের ধনপ্রাণ কবে নিয়ে নিত। বাপু হে, একটু-আধটু প্রজাপীড়ন, তা মেনে নিতে হয়, এই ধরাধামে নিষ্কলঙ্ক কোনো ব্যাপার নেই, জমিদারের পেয়াদা ছুতুতে-অছুতুতে একটু-আধটু পিঠে বাড়ি মারবে। কিন্তু জমিদারি উঠে গেলে তোমরা তো ভেসে যাবে, তাই জমিদারি বাঁচানোর স্বার্থে জমিদারের গোলায় ভালোয়-ভালোয় আরো কিছু চাল-ডাল-সবজি তুলে দাও, সুবোধ বালকের মতো জমিদারের শ্রীচরণে বাড়তি আরো-কিছু খাজনা ঢেলে দাও। নইলে সংকট, জমিদারি লাটে চড়বে, সেই সঙ্গে তোমরাও।'

অর্থনীতিবিদ্‌দের নিয়ে মস্ত মুশকিল। তাঁরা এত বেশি জানেন-বোঝেন, পণ্ডিতিপনার জাহাজ, সোজা জিনিশটিকে তাঁরা কঠিন ক'রে না ব'লে পারেন না, সোজা ক'রে বললে, আশঙ্কা, তাঁদের বৃত্তি কৌলিন্য-বিচ্যুতি হ'তে পারে। অথচ এ-ধরনের কণ্ডুয়নের কোনো দরকার নেই। জমিদারি ঐতিহ্যে ঠাসা আমাদের দেশ, নতুন দিল্লি থেকে যে-সব ফরমান-নির্দেশ বেরোয় তাদের সহবৎ-প্রকৃতির সঙ্গে ভারতবর্ষের মানুষের নিবিড় পূর্বপরিচয়। টাকার অবমূল্যায়ন, আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের শর্তাবলি, দেশের মানুষদের বর্তমান সংকটে প্রয়োজন আরো অনেক-অনেক ত্যাগস্বীকার করা, যা নাকি সর্বোচ্চ দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা। হ্যাখো তো চেয়ে আমাদের তুমি চিনতে পারো কি না, না চিনতে পারার কোনো কারণ নেই, আমাদের জমিদারশ্রেণী আবহমানকাল ধ'রে যখন ঋণ ক'রে ঘৃত পান

করতেন, এই আখরগুলিই আওড়াতেন। নতুন দিল্লিতে সমাসীন হয়ে যাঁরা এখন ফতোয়া জারি করছেন, তাঁরা ভারতবর্ষের সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্যের বিশ্বস্ত ধারক, ও বাহক. সেই উপনিষদের আমল থেকে আজ পর্যন্ত, কে না জানে, সমাজের সমুৎপন্ন সর্বনাশের মুহূর্তে অধমর্ণদের অধিকতর ত্যাগস্বীকার করতে হয়, অন্যথা প্রলয়, নেহাৎ খ্যাপা না হ'লে তো আর কেউ প্রলয় পছন্দ করে না। যখন দাম চড়ে, ট্যাক্সো বাড়ে, র‍্যাশন ব্যবস্থা থেকে ভরতুকি তুলে দেওয়া হয়, মহার্ঘ ভাতায় ছাঁটাই হয়, কারখানার পর কারখানার দরজা বন্ধ হয়, সে-সব মুহূর্তে এ-সমস্ত জ্ঞানগর্ভ কথা মনে রাখতে অপারগ হওয়া ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

তাহ'লেও প্রতুল কৈবর্তের কাহিনীটি শেষ করতেই হবে আমাকে। প্রতুলের ছ-ছটাক জমি কেড়ে নেওয়া হয়, তার বৌ-বাচ্চা তো আগেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। পরিবারের শোকে, জমির শোকে, খিদের তাড়ণায় প্রতুল, অচিরে, পাগল হয়ে যায়। বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়, বিড়বিড় ক'রে কী সব উচ্চারণ করে, দয়াপরবশ হয়ে কেউ-কেউ হয়তো একটু-আধটু খুদকুড়ো দেয় তাকে, ধিকিধিকি মানুষের প্রাণ, কোনোক্রমে টিকে থাকে, তবে মাস আষ্টেক বাদে অনর্থ ঘটল, ঘোর কৃষ্ণপক্ষ, জমিদারের বড়ো ছেলে বাজারের তাশের আড্ডার শেষে মাঝরাত্তিরে টর্চবাতির আলোয় বাড়ি ফিরছিলেন, একজন-দুজন স্যাঙাৎও ছিল সঙ্গে, কিন্তু এত অতর্কিতে ঘ'টে গেল ব্যাপারটা, তাদের কিছু করবার ছিল না, গাছের আড়াল থেকে পিত্‌লে কৈবর্ত হঠাৎ বেরিয়ে এসে জমিদার নন্দনের গলায় হাঁসুলির কোপ বসিয়ে দিল। কোপটা তেমন-একটা ভালো ক'রে বসেনি, শহরের হাসপাতালের ডাক্তার জানালেন এমনিতে হয়তো বাঁচানো যেত, কিন্তু জংধরা হাঁসুলি, অনেক বাড়তি বীজাণুর সংক্রমণ থেকে দ্রুত পচন ধ'রে গিয়েছিল।

বিচারে প্রতুলের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের সিদ্ধান্ত, বিকৃতমস্তিষ্ক ব'লে ফাঁসি রদ হওয়ার পর, সেটা অমানবিক হতো।

একটু সরলীকৃত মনে হচ্ছে কি উপাখ্যানটি? উপায় নেই, সমাজবিন্যাসের মূল কাহিনীগুলি এমন ঘোরপ্যাঁচহীনই হয়। গোল বাধান অর্থনীতিবিদরা, তাঁদের আঁতে ঘা লাগে, ভারতীয় মুদ্রার বাস্তবসম্মত বিনিময়মূল্য বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা তাই দেশবাসীকে মুখ বুজে শুনতে হয়, সেটাই নাকি দেশপ্রেম। যারা-যারা বক্তৃতা শুনতে রাজি নও, তারা হাত তোলো, তোমরা সবাই দেশদ্রোহী, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে পাঠানো উচিত তোমাদের।

দিচ্ছি বিসর্জন, কাকে, কেন

'দুষ্টমতি লঙ্কাপতি/হ'রে নিল সীতা সতী।/রামচন্দ্র গুণাধার, /ত্বরায় গিয়ে সিন্ধুপার,/ ঘোরতর যুদ্ধ ক'রে/বধিলেন লঙ্কেশ্বরে'। স্বরবৃত্তে মাত্র ছয়টি পঙ্‌ক্তি, ঘোরালো-প্যাঁচালো কোনো ব্যাপারই নেই, রামায়ণের সারাংশ তাতেই সম্যকরূপে ব্যক্ত, আমরা বালকের দল তাতেই মহা তৃপ্ত। অথচ কয়েক বছর বাদে যখন মাইকেলের অমিত্রাক্ষরে অনুপ্রবেশের মধ্য দিয়ে আমাদের মুগ্ধতার ঋতু শুরু, পূর্বচেতনার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মানিয়ে নেওয়া সম্ভব হতো প্রমীলার দর্পিত উক্তি: 'রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী, আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?' ধ্বনির পুঞ্জ-পুঞ্জ স্থাপত্য, সজ্জিত শব্দাবলিকে জড়িয়ে যে-ভাবনা, অনুষঙ্গ, কাহিনী, দর্শন, তা যেন আর মুখ্য ভূমিকায় নেই, আমাদের অনুভব জুড়ে এক পক্ষপাতহীন তন্মনস্কতা; শব্দের গহনে, ছন্দের গহনে ঢুকে পড়েছি আমরা, তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করছি বাক্যবন্ধনের ঝংকার,-দ্যোতনা-মূর্ছনা। যে-চরিত্রগুলিকে নিয়ে কাব্যের বিস্তার, তাদের প্রতি আমাদের সমান অনুকম্পা, সবাইকেই পছন্দ করছি, আঁকড়ে ধরছি, কারণ তাদের ছুতো ধ'রেই অলংকাররসের সঙ্গে ক্রমশ পরিচিত হচ্ছি আমরা। এরই মধ্যে কখন যেন শিশিরকুমার ভাদুড়ি তাঁর পুরো দল নিয়ে আমাদের ছোটো মফস্বল শহর ঘুরে গেলেন, হৈরৈ কাণ্ড, ভিখারী রাঘবের অন্য এক প্রেক্ষাপট: যবনিকা উঠল, থমথমে অন্ধকার, একটা কি দুটো প্রদীপ এক ভয়ংকর অন্তর্বেদনাকে যেন মূর্ত করছে, হঠাৎ কণ্ঠস্বর, প্রথমে অস্ফুট, পরে একটু-একটু ক'রে উচ্চগ্রামে, শোকাচ্ছন্ন সেই স্বর, অপরাধভারাতুর, দ্বিধাসংশয়দীর্ণ, 'প্রজানুরঞ্জন, প্রজানুরঞ্জন, প্রজানুরঞ্জন তরে জানকীরে মোর দিচ্ছি বিসর্জন।' পুনরুচ্চারণ, একাধিকবার, যেন এক আহত ব্যাঘ্রের বিলাপ, অকস্মাৎ, তা আর্ত হুংকারে আছড়ে পড়া। খানিকটা বুঝছি, অনেকটাই বুঝছি না, হঠাৎ এক চকিত মুহূর্তে সীতারূপিণী শ্রীমতী প্রভাকে দেখে আমরা অভিভূত। আবছা-আবছা স্মৃতি, পরমদুঃখিনী সীতা, ফের অরণ্যদৃশ্য, তবে কি আরেক পর্ব নির্বাসন, সঙ্গে দুই বালক, লব ও কুশ। তাদের হাতে ধনুক, যার ভার তারা ঠিক বইতে পারছে না। দ্রুত আবহ পরিবর্তন, বনপরীদের হাতে উজ্জ্বল ফুলঝুরি, সংগীতসংবলিত নৃত্য, মঞ্চাধিনায়ক হেমেন্দ্রকুমার রায়ের প্রতিভার সঙ্গে সাহসের রাজযোটক, বনপরীরা নিখুঁত বিভঙ্গে, উপ্‌চে-পড়া আনন্দে নৃত্য লীলায় মঞ্চময় নিজেদের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিল, ঐ মুহূর্তে যেন বিশেষ প্রয়োজন ছিল গানের-নৃত্যের, ভারি পরিবেশকে একটু অন্যরকম ক'রে নেওয়ার জন্য। রবীন্দ্রনাথের গানের উচ্ছলতা, সেই সঙ্গে নাচের প্রাণবন্ত বিচ্ছুরণ: 'নূপুর বেজে

যায় রিনিরিনি। আমার মন কয় চিনি চিনি॥ গন্ধ রেখে যায় মধু বায়ে, মাধবী বিতানের ছায়ে ছায়ে, ধরণী শিহরায় পায়ে পায়ে, কলসে-কঙ্কনে কিনিকিনি॥ পারুল শুধাইল কে তুমি গো, অজানা কাননের মায়ামৃগ। কামিনী কুলকুল বরষিছে, পবন এলোচুল পরশিছে, আঁধারে তারাগুলি হরষিছে। ঝিল্লি ঝনকিছে কিনি-কিনি॥ আমার মন কয় চিনি চিনি।' আমাদের স্পর্শ ক'রে এক অকল্পনীয় শিহরণ, মঞ্চ অন্ধকার, কিন্তু গানের রেশ ভেসে বেড়াচ্ছে, ইতস্তত একটি-দুটি বিদ্যুতের আলো জ্বলছে-নিবছে, অন্ধকারে তারাগুলিই হয়তো ঝলকাচ্ছে, নয়তো একটা-দুটো ঝিল্লি, বনপথে সঞ্চরমান রাজপুত্রদ্বয়, মায়ের দুঃখে তারা কাতর, পরমপূজ্যপাদ পিতৃদেবকেই তারা অভিশাপ দিতে উদ্যত, জননী সীতা, ধৈর্যের-ন্যায়ের-সহিষ্ণুতার প্রতিমা, তাদের সংবৃত করছেন। এখন আর মনে আনতে পারি না, অপবাদের-কলঙ্কলেপনের বোঝা সহ্য না করতে পেরে সীতার পাতালগমন সত্যি-সত্যি মঞ্চে দেখানো হয়েছিল কিনা। মঞ্চ সহসা বিস্ফারিত, সীতার জন্য পাতালের সিঁড়ি, যে-সিঁড়ি বেয়ে সীতা ধীরপায়ে অবরোহণ ক'রে গেলেন, তা কি সত্যি-সত্যি দেখেছিলাম, নাকি এখন স্রেফ কল্পনা করছি? আরো যা এখন বিস্মরণের অন্ত-ভুক্ত, সীতার পাতালপ্রবেশের দৃশ্যটি বনপরীদের নৃত্যের আগে না পরে? রামায়ণ তো কাব্য, রামায়ণ তো রূপকথা, হয়তো অনেকটা বিষণ্ণতার ছোঁয়া সেই রূপকথায় ধার্মিকতার সঙ্গে আমাদের শৈশবমুহূর্তে রামায়ণের কাহিনীর কোনো সম্পর্কই ছিল না। মোটাবুদ্ধি হনুমানকে নিয়ে একটু হাসিঠাট্টা আমাদের, বালকবালিকারা হৃদয়হীন না হয়ে পারে না, শ্রীমতী সূর্পনখার রাঘবানুরাগ আমাদের সামান্যতম বিচলিত করত না, সেই সঙ্গে বিভীষণ সম্বন্ধে তখন থেকেই একটু খটকাবোধ, লোকটার দলত্যাগ আমাদের বিবেক যেন ঠিক মঞ্জুর করতে পারত না। তা ছাড়া পুষ্পক নিয়ে উত্তেজনা, তাতে তো খামতি নেই। অবশ্য পাশাপাশি সীতার নির্বুদ্ধিতাকে দুয়ো দেওয়া। তাঁকে দুই দফায় সমালোচনা। প্রথম, ঐ যে-যা-বলুক-ভাই, আমার-সোনার-হরিণ-চাই মানসিকতার নির্লজ্জ বাড়াবাড়ি, কী দরকার বনবাসে গিয়ে ঐ হরিণরোগের; দ্বিতীয় যে-অভিযোগ আমাদের, লক্ষ্মণ এত কষ্ট ক'রে গণ্ডিরেখা টেনে দিয়ে গেল, আমাদের মতো অবোধ শিশুরাও বুঝতে পারছি সন্ন্যাসীটি ভণ্ড, কপট, প্রতারক, আর তুমি সীতা কিনা এমন কাণ্ডজ্ঞানহীনা, লক্ষ্মণ-রেখা ডিঙিয়ে তার ফাঁদে ধরা দিলে, এখন অশোকবন কেঁদে ভাসিয়ে দিয়ে আর কী হবে, দ্যাখো তো এই অবুঝ সীতার জন্য বেচারি রাম-লক্ষ্মণকে কত ঝামেলাই না পোয়াতে হলো।

পরে অবশ্য উত্তরকাণ্ডে রামায়ণ ঈষৎ গোলমেলে হয়ে গেল, ঐ প্রজানুরঞ্জন অধ্যায়ে, শৃঙ্খলিত ব্যাঘ্রের অনুশোচনার মতো শিশিরকুমারের সেই আর্ত উচ্চারণ-পুনরুচ্চারণ থেকে আমরা অস্পষ্ট উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ হয়ে যেতাম, জীবন বড়ো রহস্যসংকুল, জটিল, কলসে-কঙ্কণে কিনিকিনির মতো সহজ-সরল নয়। তবে সে

যা-ই হোক, রামায়ণ প্রসঙ্গ সেই উন্মেষমুহূর্তে অন্তত আদৌ কোনো ধর্মবৃত্তান্ত ছিল না। কাব্যাস্বাদ করছি, বিচিত্র নানা চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি, কৃত্তিবাস-উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী পেরিয়ে একটু-আধটু মাইকেলের প্রকোষ্ঠে যখন থেকে চুপি দেওয়া শুরু নানা নতুন শব্দের ও নির্ঘোষের সঙ্গে পরিচয়ের পালা, রামায়ণ উপলক্ষ না হ'লে কবে আর জানতে পারতুম বরুণদেবের সংস্কৃততর নাম প্রচেত। জ্ঞানশলাকা ক্রমশ আরো উদ্দীপিত, গান্ধিজির রামরাজ্যের কথা শুনতে পেলাম, অথচ আমাদের চির-চেনা রামায়ণ বৃত্তান্তের সঙ্গে সেই রামরাজ্যকে মেলানো কিছুতেই সম্ভব হলো না, আমাদের কাব্যোপভোগের রামায়ণ, কল্পনাকে-নিয়ে-শিথিল-খেলা-ক'রে-বেড়ানোর রামায়ণ, সেই রামায়ণ আমাদের একান্ত নিজস্ব, তাকে কোনো ওঁচা কাজে ব্যবহৃত হ'তে দেব না। গান্ধিজি থাকুন তাঁর রামরাজ্য নিয়ে, আমরা আছি, থাকবো, আমাদের ঘরোয়া রামায়ণ নিয়ে। আসলে রামায়ণকে আমরা দেশজ বটিকায় ছেঁকে নিয়েছিলাম, রামায়ণের বাঙালি সংস্করণ, যাতে কাব্যগুণই প্রধান, কল্পনাকেই তারিফ জানানোর তা উপলক্ষ। ধর্মীয় ব্যাকরণের অনুশাসনে চরিত্রগুলি কিংবা খণ্ড-বিখণ্ড উপাখ্যানমালা জড়িয়ে পড়েনি, আমরা কৌশল্যাতেও আছি-কৈকেয়ীতেও আছি-সুগ্রীবেও আছি-কুম্ভকর্ণতেও আছি, সব ক'টি চরিত্র থেকেই রস আহরণ করছি। রামায়ণের যুদ্ধ তো বাঙালি লজ্জে দাঁড়িয়ে গেছে, প্রায় রকের ব্যাপার, এখানে ধর্মের ব্যাপার আবার মাথা গলায় কী ক'রে? ইতিমধ্যে কখন যেন আমাদের অপেক্ষাকৃত এঁচোড়ে-পেকে-যাওয়া, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলি পেড়ে 'কাব্যে উপেক্ষিতা' গলাধঃকরণ, উর্মিলার দুঃখে কেঁদে নদী হওয়া। আরো কিছুদিন যেতে-না-যেতে আরেক দফা আবিষ্কার, বুদ্ধদেব বসুর 'পুরাণের পুনর্জন্ম', যার প্রেরণা নাকি জুগিয়েছিলেন প্রভু গুহঠাকুরতা। সে যা-ই হোক, পুরাণের সেই চরিত্রগুলি হঠাৎ আমাদের প্রাত্যহিকতায় উপনীত, তাদের সংকট আমাদের সমাজ-সংসারের দৈনন্দিন সমস্যারই উদাহরণ-নিদর্শন। ধর্মের যেটুকু গন্ধ ছিল রামায়ণে, এই সামজিকতার ধাক্কায় তা পুরোপুরি উবে গেল।

মহাভারতের বেলাতেও ঠিক তাই। দুর্যোধন-দুঃশাসনকে একটু অপছন্দ করতাম প্রধানত ঐ দ্রৌপদীঘটিত ব্যাপারটার জন্য, তা ছাড়া তো আমাদের ঘোর অপক্ষপাত, ভীষ্মকে সম্ভ্রম জানাচ্ছি, দ্রোণাচার্যকেও, অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে যতটা দুয়ো দিচ্ছি, সহানুভূতিতে জর্জর হচ্ছি তার চেয়েও বেশি, দুই কুন্তীপুত্র কর্ণ ও অর্জুনের মধ্যে মনস্থির করতে পারছি না বীর হিশেবে কে শ্রেষ্ঠতর, একলব্যকাহিনী, অভিমন্যুবধ প্রসঙ্গে আমরা সমান কাতর, কৃষ্ণ কর্তব্যবিমূঢ় অর্জুনের উপর গীতার উপদেশ বর্ষণ করছেন, ইত্যবসরে আমরা মহাভারতের বিবিধ অপ-উপখ্যানে সেঁধিয়ে যাচ্ছি: আখ্যায়িকার, চরিত্রের শোভাযাত্রা, শকুনিগোছের মামারা, নারদসদৃশ কোঁদল-বাধিয়ের সম্প্রদায়, সত্যভামার কথা, মণিপুরদুহিতার কথা, মৈত্রেয়ীর দ্বান্দ্বিক যন্ত্রণাজিজ্ঞাসা, যেনাহং নামৃতস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্।

আমাদের বাঙালি পরিবেশে আমরা ভুলেই ছিলাম পুরাণের অন্য-এক অর্থ ধর্ম-আখ্যায়িকা, আঠারো মহাপুরাণের পীড়নে আর্যাবর্তের সামাজিক কাঠামো সতত-জর্জরিত : ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শিবপুরাণ, ভাগবৎপুরাণ, নারদপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, অগ্নিপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, বরাহপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, যাদবপুরাণ, কর্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, গরুড়পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। এই পরাক্রান্ত ভিড়ে ম্লেচ্ছ বাঙালিরা, নিছক কাব্যকাহিনী-ভোক্তা বাঙালিরা, এখন আর পালাবার পথ পাই না।

ভারতমাতার বন্দনা করবো, কিন্তু আর্যাবর্তের নির্দেশনামা মানবো না, তা তো হ'তে পারে না, যদি ট্যা-ফোঁ করতে যাই সঙ্গে-সঙ্গে হয়তো বলা হবে বিচ্ছিন্নতা-বাদী। রামায়ণ-মহাভারত তাই আর কল্পকথা রইল না, টেনে-হিঁচড়ে প্রাত্যহিক-তায় নামিয়েছিলাম সেই পুরাবৃত্ত-নন্দিত চরিত্রগুলিকে, যাদের দেবীদেবতা-রাজরানী-দৈত্যদানো-রাক্ষসরূপী পরিচয় প্রায় ঘুচেই গিয়েছিল, তারা ক্রমশ অপস্রিয়মাণ, তারা ধর্মাচরণের কঠোর-কঠিন বৃত্তে অনুপ্রবিষ্ট। ধর্ম হালে খুবই জঙ্গিরূপ পরিগ্রহণ করেছে, অনেকটা মধ্যযুগবর্তী জেহাদ-জেহাদ চেহারা। সর্ব মুহূর্তেই হা-রে-রে-রে হুংকারের আস্ফালন, এক্ষুনি মারবে, কি কাটবে, এমনকি রামায়ণ-মহাভারতের নামেও, বিশেষ ক'রে রামায়ণ-মহাভারতের নামেই।

জীবনধারার ছাপ চেতনাকে গড়ে, চেতনার ছাপ জীবনধারাকে নয়। একশো বছর আগে আমাদের, বাঙালিদের, জীবনধারার চাপে আর্যাবর্তের চেতনা গ'ড়ে উঠত, এখন উল্টোটা। আর্যাবর্ত উত্তমপুরুষ, আমরা অধম, ওখানকার অঙ্গুলিহেলনে অতএব আমাদেরও ওঠা-বসা চলা-ফেরা। দূরদর্শনের মধ্যবর্তিতায় পাইকারি হারে ধর্মের নামে প্রচার, টানা চার-পাঁচ বছর প্রতি রবিবার নিয়ম ক'রে রামায়ণ-মহাভারতের কাণ্ডের পর কাণ্ড, পর্বের পর পর্ব। এক মধ্যবয়সী বাঙালি ভদ্রলোক, মার্কিন-ফেরৎ, ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার, কোন্ কোম্পানিতে বড়োগোছের কাজ করেন, তাঁর বাড়িতে সকালে কী উপলক্ষে গেছি, ঘড়িতে সোয়া-ন'টা-ন'টা-কুড়ি, ভদ্রলোক উশখুশ, একটি ফরশা ঝাড়ন নিয়ে এসে টেলিভিশনের কাচ অতি সযত্নে ঘ'ষে নির্মল ক'রে তুললেন, তারপর হাঁটু গেড়ে গড় হলেন টেলিভিশনের সামনে। আমি হতভম্ব, জনান্তিকে ফিশফিশ প্রশ্ন। মুহূর্তে রহস্যের অবসান, সাড়ে-ন'টা থেকে রামায়ণ-উপাখ্যান দেখানো শুরু হবে, ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোকের ধর্মানুরাগে হৃদয়ের এ-কূল-ও-কূল-দুকূল প্লাবিত, রামায়ণ তো নিছক বীর্যশৌর্য-কাহিনী নয়, তা ধর্মবৃত্তান্ত, সুতরাং গড় হয়ে টেলিভিশনের কাচকে প্রণাম, শুরুতে একবার, দেড়ঘণ্টা বাদে এই রবিবারের কিস্তি শেষ হ'লে আরেকবার।

বিসর্জনের ঢাকে কাঠি। কী আর করা, আমাদের শৈশবকে বিসর্জন না দিয়ে উপায় নেই। আর্যাবর্তের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে টিকে থাকতে হবে, ধর্ম বাদ দিয়ে আবার রামায়ণ-মহাভারত হয় নাকি।

নাচে কারা ? তারা-তারা

পঁচিশ বছরের পুরোনো ইতিবৃত্ত, কিন্তু ভারতবর্ষ কি আদৌ পাল্টেছে, পাল্টাচ্ছে ?

কৃষিপণ্য মূল্য কমিশনের দায়িত্বে আছি, ভারত সরকারকে পরামর্শ-উপদেশ দিতে হয়, চাল-গম-জোয়ার-বাজরা-আখ-তুলো-পাট ইত্যাদির ন্যূনতম সহায়ক মূল্য কী হবে, যে-সব খাদ্যশস্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা মারফৎ বিলিবণ্টন করা হয়, তাদের ক্ষেত্রে সরকারি সংগ্রহমূল্যই বা কত হবে, এ-ধরনের ব্যাপার নিয়ে সুপারিশ করতে হয় কৃষি তথা খাদ্য মন্ত্রকের কাছে। সে-সমস্ত উপদেশ-পরামর্শাদি শোনবার তেমন বালাই নেই সরকারের, সরকার জানেন কাকে কত দাম ধ'রে দিলে ভোটের বাজারে সুবিধা হবে ; খুব বেশি চড়া দামে খাদ্যশস্য কিনে খরচ পুরোপুরি পুষিয়ে রাষ্ট্রীয় বণ্টনব্যবস্থায় ছাপোষা গৃহস্থদের কাছে বিক্রি করতে গেলে তাঁরা মহাশোরগোল পাকাবেন, অতএব ভরতুকির দরকার পড়বে, তা-ও সরকার দেখবেন। ভরতুকির টাকা ছাপোষা গৃহস্থদের পকেট মেরেই সংগ্রহ করা হবে কোনো-না-কোনো উপায়ে, তাঁরা তা বুঝতে না পারলেই হলো।

উপদেশ-পরামর্শ-সুবচন। সরকার মানুন না-মানুন, যেহেতু কৃষিপণ্য মূল্য কমিশনের হাল ধ'রে আছি, প্রতি মরশুমে প্রতিটি শস্যের মূল্য নির্ধারণের নাটকের মধ্য দিয়ে যেতেই হয়। কয়েক সপ্তাহ বাদে তুলোর রোঁয়া শুরু হবে, যেহেতু তুলোর চাষ প্রধানত গুজরাট-মহারাষ্ট্রে, বোম্বাই চ'লে গিয়ে টেক্সটাইল কমিশনারের দপ্তরে আমি সমাসীন। উপদেশ-পরামর্শ দিতে গেলে উপদেশ-পরামর্শ চাইতেও হয়, এঁর-ওঁর-তাঁর সঙ্গে আলাপচারী হ'তে হয়। একটি বিশেষ দিনের কথাই বলছি। সকাল সাড়ে নটায় দেখা করতে এলেন আমাত্য-পরিবেষ্টিত হয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কটন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, নাম মদনমোহন রুইয়া। পূর্ব ভারতের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই, গোটা দেশের কার্পাস ব্যবসায়ী, ফড়িয়া ও দালালদের প্রতিনিধি-স্বরূপ এই সংস্থা। মদনমোহনজি দেশ জুড়ে তুলো বেচতে গিয়ে তাঁরা কী-কী সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তা নিয়ে তেমন বিস্তারিত হলেন না, বেশির ভাগ সময় বললেন বপনকারীদের সমস্যা নিয়ে, কৃষকদের দুঃখে তিনি গ'লে নদী, সহায়ক মূল্য না-বাড়ালে উন্নত বীজশস্য ব্যবহৃত হবে না, সার-সেচেরও অবহেলা ঘটবে, তুলোর উৎপাদনও তাই বাড়বে না, অতএব সহায়ক মূল্য বাড়াতেই হবে, তাঁদের যদিও নিছক ব্যবসায়ী সংস্থা, সামান্য-একটু কমিশন কোনোক্রমে তাঁরা পেয়ে থাকেন বেচা-কেনা থেকে, তা হ'লেও দেশের স্বার্থ, গরিব কৃষককুলের স্বার্থ তাঁদের ভাবতে হয়, এই ভাবনাহেতু তাঁদের রজনী নিদ্রাহীন দীর্ঘ দগ্ধ দিন।

মদনমোহন রুইয়া তাঁর দলবল নিয়ে বিদায় নিলেন। সকাল সাড়ে-এগারোটায় এলেন, সপারিষদ, কাপড়ের কলের মালিকদের নিখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ইণ্ডিয়ান কটন মিল্‌স্‌ ফেডারেশনের প্রধান পুরুষ। নাম শুনে আমি চমৎকৃত : রাধাকৃষ্ণ রুইয়া, এইমাত্র যিনি নিক্রান্ত হলেন, মদনমোহনজি, তাঁরই অনুজ। রুইয়ারা অতএব তুলোর ব্যাবসাতেও আছেন, কাপড়ের কলেও আছেন, ফড়েগিরিও করছেন, ফের শিল্পপতির ভূমিকাও পালন করছেন, একটু রঙ্গ করে বলতে গেলে, বিষ্ণুবাবুর কবিতার ভাষায়, 'তুমিই মালিনী, তুমিই তো ফুল প্রিয়ে'। আচ্ছা, রাধাকৃষ্ণজি, আপনারা তো কাঁচা তুলো কিনে সুতো তৈরি করেন, সুতো থেকে কাপড় বয়ন করেন, তুলোর দাম যত কম হয় ততই তো তা হ'লে আপনাদের পক্ষে শুভ ? রাধাকৃষ্ণ রুইয়া আঁৎকে উঠলেন : 'আজ্ঞে না স্যার, এই যুক্তিতে মস্ত ফাঁকি আছে। গরিব কৃষকদের স্বার্থ সর্বাগ্রে দেখতে হবে, সরকার দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে এসে সহায়ক মূল্য সথাসম্ভব না-বাড়ালে সহায়সম্বলহীন কৃষক মারা পড়বে, তুলোর চাষ বন্ধ হয়ে যাবে, তখন সারা দেশ জুড়ে একের পর এক কাপড়ের কারখানাগুলিও বন্ধ হ'য়ে যাবে, বস্ত্ররপ্তানি থেকে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন অবরুদ্ধগতি হবে, এ-রকম সর্বনাশ, দোহাই, দয়া ক'রে ঘটতে দেবেন না। অবশ্য তুলোর দর চড়লে আমাদের অসুবিধা, তবে উপায় কী, দেশের স্বার্থ, চাষীদের স্বার্থ সবসময় অগ্রাধিকার পাবে আমাদের কাছে'। কিন্তু তুলোর দাম চড়লে কারখানায় উৎপাদন খরচ তো বাড়বে, উৎপাদিত বস্ত্রের দামও তো বাড়বে, বিদেশে প্রতিযোগিতায় তা হ'লে তো হ'টে যাবেন আপনারা ? রাধাকৃষ্ণজির কপালে সাড়ে-চারটি ভাঁজ : 'সেজন্যই তো স্যার আপনার কাছে আর্জি, কৃপা ক'রে তুলোর দাম বাড়িয়ে দিন, সরেশ তুলোর দাম তুলনাগতভাবে একটু বেশি-বেশি বাড়িয়ে দিন, সেই সঙ্গে দয়া ক'রে, হিশেব ক'রে নিয়েই, বস্ত্রাদি রপ্তানির জন্য সরকারি ভরতুকির পরিমাণটাও বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সালিশি করুন'। রাধাকৃষ্ণ রুইয়া অনুরোধে ঢলঢল, ঘণ্টাদেড়েক দেশের-জাতির-কৃষককুলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তাকুল থেকে চর-অনুচরসহ বিদায় গ্রহণ করলেন।

মধ্যাহ্নরাশের জন্য বিরতি। কৃষকদের মঙ্গলকামনায় সতত-উদ্বিগ্ন ব্যবসায়ী সংস্থা, সম-উদ্বিগ্ন মিলমালিকরা, নিজেদের শরীর পাতন ঘটিয়েও তাঁরা ভারতীয় কৃষক সমাজকে রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর : অর্থনীতির সোজা সূত্র-অনুযায়ী এ-রকম তো হবার কথা নয়। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে স্বার্থের সংঘাতই তো স্বাভাবিক, মিলমালিক শস্তায় কাঁচামাল কিনতে চাইবেন, তুলোর ব্যবসাদাররা প্রথমে বেশি দাম হাঁকবেন, দরাদরি-কষাকষি হবে, অবশেষে একটা জায়গায় দামের রফা হবে। কার্পাসব্যবসায়ী ও তুলোর চাষীর মধ্যেও অনুরূপ দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক হওয়া উচিত : কৃষকরা প্রাণপণে বেশি দাম হাঁকবেন, ব্যবসাদাররা ছুতো খুঁজবেন কী ক'রে দাম যথাসম্ভব কমিয়ে আনা যায় ; আমাদের দেশে, যেহেতু কৃষকসম্প্রদায় সাধারণত

দুর্বল, অতি অল্পতেই ব্যবসাদারদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে তাঁরা বাধ্য হন, আপাতত এটাই সমাজবিন্যাসের চেহারা। অথচ, আজব ব্যাপার, সারা সকাল জুড়ে শিল্পপতিরা-ব্যবসাদাররা কেউই তুলোর দাম একটি নির্দিষ্ট সীমায় বেঁধে দেওয়ার কথা বললেন না, সবাই কৃষকদের স্বার্থ নিয়েই অধিকতর ভাবিত, কিমাশ্চর্যমতঃপরম্, কাঁচামালের মূল্যনিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গ উহ্য, বরঞ্চ কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধির জন্য সুপারিশ ক'রে গেলেন উভয়পক্ষই।

রহস্যের জট ছাড়ল মধ্যাহ্নরাশের পর। আড়াইটা-পৌনে তিনটা নাগাদ এজাহার দিতে এলেন গুজরাট রাজ্য কার্পাস কৃষিজীবী সমবায় সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ। এঁদের যিনি সভাপতি, তাঁরও পদবি রুইয়া, না হ'য়ে উপায় কী, 'রুইয়া' মানেই তো বপনকারী। হ্যাঁ, ঠিকই আঁচ করেছি, মদনমোহনজি ও রাধাকৃষ্ণজির ইনি সাক্ষাৎ ভ্রাতুষ্পুত্র, রামনারায়ণ কিংবা ঐ গোছের কোনো নাম, এত বছর বাদে ঠিক মনে পড়ছে না। এঁরা তো কার্পাসের সহায়ক মূল্য বাড়াতে বলবেনই। বললেনও, প্রগাঢ় দৃঢ়তার সঙ্গে, মিহিন্ পোশাক-আশাক, সুচিক্কণ মেদ ক'রে পড়ছে তাঁর এবং তাঁর সঙ্গে-আসা সমবায়বদ্ধ কৃষক প্রতিনিধিদের সর্বাঙ্গ থেকে, প্রত্যেকের হাতের আঙুলে গড়ে দুটো ক'রে হিরে-পান্না-বসানো আংটি। তুলোর দাম না-বাড়ালে তাঁদের পড়তা উঠবে না, চাষাবাদ বন্ধ ক'রে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না তাঁদের, তাঁদের হাঁড়ি চড়বে না, অভুক্ত থেকে মৃত্যুমুখে পতিত হবেন সমবায়বদ্ধভাবে তাঁরা।

এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে পুঁজিপতির স্বার্থ-দালাল-ব্যবসায়ীর স্বার্থ-কৃষকের স্বার্থ তাই একাকার মিশে যায়। গরিব কৃষকদের প্রতিনিধিত্বের দাবি ক'রে যাঁরা এসেছেন তাঁরা অবশ্যই জমিদার-জোতদার, তুলোর গোটা ব্যবসাও তাঁদের কুক্ষিগত, মিলগুলিও তাঁরাই চালান। যেখান দিয়েই মুনাফা ঝরুক, তাঁদের ঝুলিতে গিয়েই পড়বে। তুলোর দাম বাড়লে সুতোর দাম বাড়ানো হবে, সুতোর দাম বাড়লে কাপড়ের দাম বাড়ানো হবে, কাপড়ের দাম বাড়লে দেশের গরিব মানুষজনের অসুবিধা হবে, কিন্তু তাতে কী, সরকার ভরতুকি দিক ; কাপড়ের দাম বাড়লে রপ্তানিরও খামতি হবার আশঙ্কা, বিদেশি মুদ্রা উপার্জন হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা, কিন্তু এই ক্ষেত্রেও সরকার ভরতুকি দিক। সরকাররূপী কামধেনুকে দোহন করবেন পুঁজিপতি-ব্যবসাদার-জমিদার সবাই মিলে, তাঁরা সবাই রুইয়া।

নয়তো আম্বানি, নয়তো অসওয়াল, নয়তো অনুরূপ কোনো নাম। মাত্র গুটিকয় পরিবার, তাঁরাই ভারতবর্ষের অর্থব্যবস্থাকে কব্জা ক'রে রেখেছেন, তাঁদের স্বার্থে যাবতীয় পণ্যের দাম বাড়ানো হবে, দেশের গরিব-নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত মানুষেরা ট্যাক্সের টাকা দেবেন, সেই টাকা থেকে ভরতুকি দেওয়া হবে কারখানার মালিকদের, কাপড়ের ব্যবসাদারদের, তুলো-উৎপাদনকারী জমিদার-জোতদারদের।

ছেলেবেলায় দিশি প্রবচন শুনেছিলাম : 'নাচে কারা ? তারা-তারা'। অর্থাৎ মাত্র ঈষৎ কয়েকজন, তাঁরাই নাচছেন, তাঁরাই গাইছেন, তাঁরাই সবরকম ফুর্তি লুটছেন, দেশের কোটি-কোটি অবশিষ্ট মানুষগুলি, নিরীহ-শান্তশিষ্ট, চুপচাপ দাঁড়িয়ে, এই অবাক জলপান নাট্যলীলা মেনে নিচ্ছেন। মেনে নিচ্ছেন বছরের পর বছর ধ'রে, গত সিকি শতাব্দীতে অবস্থার সামান্যতম পরিবর্তন হয়েছে ব'লে মনে হয় না, বরঞ্চ ছায়া পশ্চাদ্‌গামিনী, ছুতো যা-ই হোক না কেন, বড়োলোকদের পোয়াবারো না-হ'লে এত ঘটা ক'রে এই স্বাধীনতা-উত্তর অর্থব্যবস্থা গ'ড়ে তোলা হয়েছে কেন ?

শ্রেণীবিভাজনের ব্যাপারটি স্পষ্টতর হয় তুলো আর পাটের মধ্যে সরকারি নীতির আচরণবৈষম্যের প্রকটত্ব থেকে। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয় না, ফারাকটি নিজের থেকেই চোখে পড়ে। কৃষিপণ্য মূল্য কমিশনের পরামর্শ-অনুযায়ী তুলোর সহায়ক মূল্য নির্ণীত হয়, পাটেরও হয়। কিন্তু, অহরহ যা ঘটছে, সরকার তুলোর ক্ষেত্রে যে-নির্ধারক মূল্য স্থির করেছেন, কেন্দ্রীয় কার্পাস কর্পোরেশন তার দ্বিগুণেরও বেশি দাম দিয়ে তুলো কিনে গুদোমে মজুত করছেন, অন্য পক্ষে পাটের বাজারদর সরকার-নির্ধারিত সহায়ক মূল্যের ঢের-ঢের নিচে নেমে গেলেও কেন্দ্রীয় পাট কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে উক্ত সহায়ক মূল্যে পাট কেনার আদৌ তাগিদ নেই। এই বিভেদাচরণের কারণটি সহজ-সরল : কার্পাস-উৎপাদনের বৃহদংশ দেশের পশ্চিমাঞ্চলের জমিদার-জোতদারদের নিজস্ব বর্গক্ষেত্রে, যে-জমিদার-জোতদারদের সঙ্গে আবার ব্যবসাদারদের-পুঁজিপতিদের নিবিড়তম দোস্তি ; অন্য দিকে পাটের চাষ প্রধানত ক'রে থাকে পশ্চিমবাংলা-বিহার-ওড়িশা-আসামের এক ছটাক-দু-ছটাক জমির স্বত্বাধিকারী ছোটো চাষী-বর্গাচাষী। গরিবদের ব্যাপারে চিন্তা ক'রে সময়ের বা সামর্থ্যের অপব্যয়, ছিঃ, ঘটতে দেবেন না।

'উড়োজাহাজ বোঝাই পাপ'

দুই আচার্য আমাদের ছেলেবেলার সার্কুলার রোড ভাগ ক'রে নিয়েছেন। মৌলালি অঞ্চলে আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড ধ'রে যখন এগোই, হঠাৎ রাস্তার পুব পারে জরাজীর্ণ দোতলা বাড়িটি চোখে পড়ে, 'ভূপেশ গুপ্ত স্মৃতিভবন'। হয়তো বাড়িটিকে সংস্কার ক'রে নিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে তোলার পরিকল্পনা আছে, আপাতত কিন্তু তার চেহারা, অন্তত বাইরে থেকে দেখতে, মলিন থেকে মলিনতর। ভূপেশবাবুর স্মৃতিও কি ওরকম আস্তে-আস্তে একেবারে ফিকে হ'য়ে গিয়ে মিলিয়ে যাবে, পুরোনো দিনের মানুষগুলি গত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-উত্তর রাজনৈতিক ইতিহাসে তিনি নিছক পাদটীকায় পর্যবসিত হবেন ?

কানে কম শুনতেন ভূপেশবাবু, যন্ত্র ব্যবহার করতেন, তবে শ্রবণযন্ত্র ব্যবহার করার একটু বাড়তি সুবিধাও ছিল। ১৯৫২ সাল থেকে ঠায় উনতিরিশ বছর, তাঁর মৃত্যুদিন পর্যন্ত, রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন, ভাষণে-প্রশ্নে-জেরায় প্রত্যহ সরকারকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলতেন। মন্ত্রীরা ত্রস্ত, তাঁর বক্তব্যের সারাৎসার খণ্ডন করার জন্য আমলার দল এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছেন, রাজ্যসভার যিনি সভাপতি, হয়তো সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, নয়তো জাকির হোসেন, প্রাণপণে ঘণ্টা টিপছেন, কিংবা কণ্ঠ একটু উচ্চগ্রামে তুলে ভূপেশবাবুকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করছেন, যেহেতু তাঁর সময়ের মেয়াদ অনেকক্ষণ অতিক্রান্ত, ভূপেশবাবু ফিরেও তাকাচ্ছেন না, আগুনের গোলার মতো একটির পর আরেকটি তাঁর ভার্ৎসনা সরকার পক্ষকে ক্রমশ আরো কুঁকড়ে-দিচ্ছে, কারো সাহস নেই কাছে গিয়ে বলেন, এবার আপনাকে থামতেই হবে। জনশ্রুতি, এক শুক্রবার অপরাহ্ণে জনৈক রাজ্যসভা সদস্যের সপ্তাহান্তে বাড়ি যাওয়ার জন্য মন আনচান, উপরাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণকে তাঁর সবিনয় মৃদু প্রশ্ন : 'মাননীয় মহাশয়, সভার বৈঠক ঠিক ক'টার সময় আজ মুলতুবি হবে ?' রাধাকৃষ্ণণ মশাইয়ের তাৎক্ষণিক উত্তর : 'সন্ধ্যা সাড়ে-ছটায়, অথবা কমরেড ভূপেশ যখন ত্রিযামায় তাঁর বকাঝকা শেষ করবেন'। রাধাকৃষ্ণণের মন্তব্যে অথচ বিরক্তির লেশমাত্র ছিল না, যা ছিল তা তির্যক কৌতুক। কিছু বাৎসল্যবোধও হয়তো বা।

রাজ্যসভা-লোকসভা-বিধানসভা গোছের শুয়োরের খোঁয়াড়গুলিতে কমিউনিস্টরা ঢোকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তেলেঙ্গানা আন্দোলনের পর্বান্তে। শুয়োরের খোঁয়াড়-গুলিতে যাবেন, তবে তেমন-বেশি নিজেদের জড়াবেন না, প্রথম দিকে অন্তত সে-রকমই ধ্যানধারণা ছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি পাল্টায়, দেশের অবস্থারও রকমফের ঘটে, সংসদে-বিধানসভায় অনুপ্রবেশ করার পর অভিজ্ঞতার

বৃক্ষে নতুন শাখা-প্রশাখার উন্মেষ, এরই মধ্যে ভূপেশবাবুর মতো একজন-দুজন তাঁদের ব্যক্তিত্ব দিয়ে, তাঁদের প্রতিভার বিন্যাসে গোটা সংসদের দৃষ্টি কেড়ে নেন, স্বভাববাগ্মী না-হওয়া সত্ত্বেও, যা বলছেন তার গুরুত্বের জন্য। ভূপেশবাবু বলতে উঠলে রাজ্যসভাময় সসম্ভ্রম নিস্তব্ধতা, হয়তো হাতের কাজ ফেলে প্রধান মন্ত্রীও চ'লে আসেন বক্তৃতা শুনতে। ভূপেশবাবুর মস্ত সুবিধা, কোনো মন্ত্রীকে রেগে-মেগে গালমন্দ পেড়ে উত্তেজনায় শ্রবণযন্ত্র খুলে ফেললেন, সেই মন্ত্রী, তিনি বেচারিই হোন আর অপরাধীই হোন, আত্মপক্ষ সমর্থন ক'রে পরে যা বললেন, ভূপেশবাবুকে তা আর তাই শুনতে হয় না। কিংবা তাঁর পরিবেশিত তথ্য সম্পর্কে তিনি এতটাই নিঃসংশয় যে মন্ত্রীর বয়ান শোনাটা প্রয়োজনীয় মনে হয় না তাঁর। তা ছাড়া, তাঁর অন্য যে-বিশেষ চরিত্রগুণ : রাজ্যসভার অভ্যন্তরে অমিতবিক্রম, ঐ অতটুকু শরীর থেকে সিংহের নির্ঘোষ বেরোচ্ছে, অথচ ঘরোয়া পরিবেশে দেখা করতে যান, অমায়িকতার পরাকাষ্ঠা, মন্ত্রী-সাংসদরাই শুধু নন, সর্বস্তরের রাজকর্মচারীরা পর্যন্ত তাঁর সৌজন্যে মুগ্ধ।

ময়মনসিংহ জেলার সচ্ছল জমিদারপুত্র, স্কুলে থাকাকালীনই কী ক'রে যেন স্বদেশিওলাদের পাল্লায় প'ড়ে গেলেন, কলেজের পালা সাঙ্গ হ'তে-না-হ'তে ভূস্বামী পিতৃদেব বিলেত পাঠিয়ে দিলেন ব্যারিস্টারি পড়তে, সাহেবদের দেশে গিয়ে যদি মতিগতি শোধরায়। আসলে বাবা-মারা কোনো যুগেই ঠিক সন্তানদের ধাত বুঝতে পারেন না, ভূপেশবাবুর বোমা বানাবার শখ মিটল, কিন্তু পড়লেন পাল্‌মা দত্তের পাল্লায়, তার পরের ইতিহাসের অধিকাংশই তো অনেকেরই জানা। এটাও ইতিহাসের আকস্মিকতা। যদি বাহান্ন সালে পার্টির সিদ্ধান্ত-অনুযায়ী ভূপেশবাবু রাজ্যসভায় চ'লে না-যেতেন, যদি পুরোটা সময় কলকাতায় থেকে দলের ব্যাপারে গভীরতর নিজেকে জড়িয়ে রাখতেন, তা হ'লে তাঁর ভারত-জোড়া, অথবা সংসদ-জোড়া, খ্যাতি হয়তো খানিকটা কম হতো, কিন্তু দলের এবং আন্দোলনের অন্য দিক দিয়ে সুবিধা হতো প্রচুর। পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটা আমাদের মধ্যে কেউ-কেউ একটু কম পছন্দ করি ব'লেই তো আর বন্ধ হবে না : অনেকে এটাও বলবেন, দল ভাগা-ভাগির পর ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে যে-রাজনৈতিক বিন্যাস এই রাজ্যে পাকাপোক্ত হলো, ভূপেশবাবু মনস্থির ক'রে দিল্লি ছেড়ে যদি চ'লে আসতেন, তা হ'লে তা হয়তো একটু অন্য আদল পেত। তবে এ-সমস্ত জল্পনা তো শেষ পর্যন্ত মনের সাধ বাতাসেতে বিসর্জন। কী হলো তা নিয়ে যুক্তির বিশ্লেষণ শাণিয়ে নিয়ে আমরা তর্কযুদ্ধে নামতে পারি, কিন্তু যা ঘটলো না তা যদি ঘটতো, তবে সমাজের-দেশের-পৃথিবীর চেহারা কতটা বদলে যেত, এই চর্চা এমনকি ইতিহাসবিলাসিতাও নয়, ইতিহাসকে নিয়ে এলোমেলো রসিকতা।

সুতরাং ভূপেশবাবুর রাজনৈতিক ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে গেলে সংসদ-সদস্যরূপে তাঁর সফলতা নিয়ে আলোচনাই অনেক বেশি অর্থময়। লোকসভা-রাজ্যসভায়

সফল হ'তে গেলে পরিশ্রম করতে হবে, এমনকি প্রচুর কায়িক পরিশ্রমও। তাঁর ফিরোজ শাহ্ রোডের কমিউনে ভূপেশবাবুকে দেখেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা সরকারি পরিসংখ্যান খুঁটিয়ে দেখছেন, পার্টির কোনো সমর্থক আলাদা ক'রে হয়তো অন্য-কিছু তথ্য তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে, রাজধানীর নির্দয় গ্রীষ্ম, ভূপেশবাবুর অতি শাদামাটা জীবনযাত্রা, ঘর ঠাণ্ডা করবার জন্য কোনোরকম ব্যবস্থাই নেই, সন্ধ্যা-বেলা মাঠে ব'সে অন্য কমরেডরা আড্ডা দিচ্ছেন, ভূপেশবাবু ভ্রূক্ষেপহীন-ভাবলেশহীন-একাগ্রচিত্ত, গ্রীষ্মের প্রকোপে আদৌ বিচলিত নন, তৈরি করছেন নিজেকে পরের দিন রাজ্যসভায় কী বলবেন তা যাতে অতি সুচারুভাবে বলতে পারেন, তার জন্য। খানিকক্ষণ বাদে ছোট্ট মানুষটি সাইকেলে চেপে কোথায় রওনা হয়ে গেলেন, ঈষৎ-পরিচিত অমুক ব্যক্তির কাছে গেলে এই বিশেষ বিষয়ে সম্ভবত একটু বাড়তি জানা যেতে পারে, ভদ্রলোকটির সঙ্গে লণ্ডনে সামান্য পরিচয় ছিল, ভদ্রতার খাতিরে হয়তো একটা-দুটো গোপন কথা বলবেন, তা ছাড়া ভূপেশবাবুর হঠাৎ রঙ্গ : এটা বুর্জোয়াদের শ্রেণীগত দুর্বলতা, আমি সংসদ-সদস্য, ওঁর বাড়িতে হাজির হয়েছি, ওঁর একটু গর্ববোধ না এসেই পারে না, তার সুযোগটা আমরা, কমিউনিস্টরা, কেন গ্রহণ করবো না?

কোন্ সপ্তাহে কী-কী প্রশ্ন পাঠাবেন রাজ্যসভার দপ্তরে তা নিয়ে প্রচুর অনবচ্ছিন্ন চিন্তাভাবনা। মন্ত্রীরা যখন প্রশ্নের জবাব দেবেন রাজ্যসভায়, কোন্-কোন্ ধরনের তাৎক্ষণিক বাড়তি প্রশ্ন করা উচিত হবে, রাজনৈতিক দিক থেকে তাৎপর্য-পূর্ণ হবে, সে-সব প্রসঙ্গে সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ-পরামর্শ। পরে জ্যোতির্ময় বসুর ক্ষেত্রে যা হয়েছিল, দেশের নানা প্রান্ত থেকে মানুষজন কেউ প্রত্যক্ষ দেখা ক'রে, কেউ দূত পাঠিয়ে, কেউ ডাক মারফৎ খবর-অভিযোগ-তথ্যাদি পৌঁছে দিতেন, কিন্তু ইত্যাকার তথ্য যথাযথ ব্যবহার করার জন্য যে-বাড়তি অধ্যবসায় দরকার, সেই তন্নিষ্ঠা প্রত্যেকের থাকে না, ভূপেশবাবুর বেশিমাত্রায় ছিল।

অন্য আকর্ষণী শক্তিটির উল্লেখ না ক'রেই বা কী ক'রে পার পাবো? ছোট্টখাট্টো মানুষটি, অধিকাংশ সময় চেয়ারের ওপর পা তুলে শরীর একটু কুকড়ে নিয়ে ব'সে থাকতেন, ভিতরে যে এত আগুনের অবস্থান বাইরে থেকে বোঝবার উপায় নেই। সেই আগুনের পাশাপাশি, এক ধরনের বিশেষ কৌতুকবিলাসিতা : নিজে বলবেন মুখে গম্ভীর ঠাট বজায় রেখে, কিন্তু ব্যঙ্গের প্রয়োগে এত ক্ষিপ্রতা-তীক্ষ্ণতা যে যিনি উদ্দিষ্ট তিনি সঙ্গে-সঙ্গে ধরাশায়ী, রাজ্যসভা জুড়ে লঘু মুহূর্তের রেশ, তবে তার পরি-পূরক এই অভিজ্ঞান : ভূপেশ গুপ্ত যদিও অগভীর স্বরেই গভীর কথাটি জানালেন, তাঁর সতর্কীকরণকে যদি তুচ্ছভাবে গ্রহণ করা হয়, আরো বড়ো বোমা ফাটবে, সেই বোমা আরো হাজারগুণ নিষ্করুণ হ'তে বাধ্য।

দলের আভ্যন্তরীণ বিতর্কেও বিস্তর বোমা নিশ্চয় ফাটিয়েছেন, যদিও বাইরে থেকে তা জানা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ১৯৬৩ সালের উপান্তে, যখন চীনের সঙ্গে

সীমান্তসংঘর্ষের জের হিশেবে, ভারত সরকারের শ্রেণীগত চরিত্র ও সামগ্রিক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে দলের মধ্যে ঝড়, ভূপেশবাবু ঠিক চাপা রাখতে পারছিলেন না নিজেকে। ডাঙ্গের সঙ্গে তাঁর ঘোর বিসংবাদ, যা তত্ত্বগত মতান্তর" থেকে ততদিনে ব্যক্তিগত মনান্তরের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে : 'আমি ঐ ডাঙ্গেটাকে ব'লে দিয়েছি, তুমি দলের সভাপতি হ'তে পারো, কিন্তু পার্লামেণ্ট আমার চৌহদ্দির মধ্যে, এখানে যদি হস্তক্ষেপ করতে এসেছো তো তোমাকে এমন শিক্ষা দিয়ে দেবো' ইত্যাদি ইত্যাদি। এরই কাছাকাছি সময়ে, ডাঙ্গেপন্থীদের বিশ্লেষণ যে কী পরিমাণে ভুলে-ভরা তা প্রমাণ করবার উদ্দেশ্যে দুশো পৃষ্ঠার এক দস্তাবেজ তৈরি করেছিলেন, আমরা বাঙালিরা বলতে শুরু করেছিলাম, কমরেড ভূপেশ গুপ্তের বৈকুণ্ঠের খাতা। জনে-জনে ডেকে পড়াতেন, পাঠান্তে তাঁকে অভিমতও জানাতে হতো, কোনো জায়গায় তাঁর মত সম্পর্কে ঈষৎ সংশয় ব্যক্ত করলে এক প্রস্থ উত্তেজিত বিতর্ক, যাতে আমাদের মতো হেঁজিপেঁজিদের জেতবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না, ভূপেশবাবুর বরাবর বাড়তি সুবিধা, আমাদের বক্তব্য ওঁর শ্রবণে ঢুকছে না, সুতরাং যথাযথ উত্তর দেওয়ার দায় থেকে তিনি মুক্ত। শুধু আমাদের মধ্যে এক বিচক্ষণ তখনই মন্তব্য করেছিলেন, গ্যাখো, উনি এখন যতই তড়্‌পান, শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ যাঁদের পছন্দ করবেন, ভূপেশবাবুও তাঁদেরই বাছবেন।

পুরোনো কাসুন্দি। এখন অন্তত মনে হয়, ভালোই হয়েছে ভূপেশবাবু দশ বছর আগে গত হয়েছেন। সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের একেবারে হালের পছন্দের কথা শুনে তাঁকেও হতভম্ব-বাক্‌রুদ্ধ হ'তে হতো, যেমন আমাদের অনেকেরই হয়েছে, হচ্ছে। জরুরি অবস্থার সময় থেকেই তাঁর দলকে অনেক সংকটের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে, দল ছোটো থেকে আরো-ছোটো হয়েছে, শেষের কয়েক বছর করাল ব্যাধিতে তাঁর ছোটো শরীর আরো ছোটো হ'য়ে গিয়েছিল যেমন, মৃত্যু সত্যি-সত্যি অব্যাহতির রূপ ধ'রে এলো।

স্মৃতি তবু দুর্মর। বাচ্চা বয়স, সরকারি গোয়ালে কাজ করি, পার্টি পত্রিকায় অর্থনৈতিক মন্তব্য লিখি, একটি ছদ্মনাম প্রয়োজন, পার্টি প্রকাশনার সার্বিক দায়িত্বে ভূপেশবাবু, ক্ষণমাত্র চিন্তা না ক'রে আড়ালি নাম জুড়ে দিয়েছিলেন : 'চারণ গুপ্ত'। সেই নামের আড়ালে থেকে তাঁর প্রতিই হয়তো পরে আক্রমণ হেনেছি বছরের পর বছর।

বাক্‌দক্ষতার সঙ্গে বিবেকবোধ মেলানোর স্বভাবপ্রতিভা সকলের থাকে না, ভূপেশবাবুর ছিল। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারকে রাজ্যপাল ধর্মবীর বরখাস্ত করার পর এখান-ওখান থেকে কতিপয় বিধায়ক ভাঙিয়ে প্রফুল্ল ঘোষ মশাই এক মন্ত্রিসভার পত্তন করেছিলেন। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিজয় বাঁড়ুজ্যের বিধানের ধাক্কায় তা টেকানো সম্ভব হলো না। ১৯৬৮ সালের মার্চ মাস, দিল্লিগামী প্লেনে প্রফুল্ল ঘোষ, আশু ঘোষ ও তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গরা, ইন্দিরা গান্ধিকে জানাতে যাচ্ছেন তাঁদের

সাজানো বাগান ঐ লক্ষ্মীছাড়া অধ্যক্ষের জন্য শুকিয়ে গেল। সীট বেল্ট বেঁধে প্রফুল্ল ঘোষরা, বিষণ্ণবদন, নিস্তব্ধ ব'সে আছেন, ভূপেশবাবুও দিল্লি ফিরছেন, হঠাৎ উড়োজাহাজ কাঁপিয়ে তাঁর তীক্ষ্ণ, সহর্ষ, সঘৃণ বিঘোষণা: 'এ প্লেনলোড অফ সিন। উড়োজাহাজ ভর্তি পাপ, উড়োজাহাজ ভর্তি পাপ।'

জীবনের নিয়ম, পাপপুণ্য যাচাই করার মানুষগুলি ক্রমশ অপসৃয়মাণ। সেই পাপাচারীদের সম্প্রদায়ই এখন গোটা জাতিকে নীতিশিক্ষা দিচ্ছে!

'কল্লোলে'র দিন

সিকি শতাব্দীরও বেশি অতিক্রান্ত, অথচ আমার কাছে এখনো উনিশশো পঁয়ষট্টি সাল যেন খুব কাছাকাছি সময় ; নিজেকে ফুরিয়ে দিতে চাই না ব'লেই হয়তো বয়সটাকে ছাব্বিশ বছর কমিয়ে আনতে চাই। সেই পুরো সালটা ভ'রে বাতাসে বারুদের গন্ধ। হাজার-হাজার বামপন্থী নেতা ও কর্মীদের বছরের গোড়াতেই কারান্তরালে চ'লে যেতে হলো, গুলজারিলাল নন্দ মশাই দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, এমনিতে সাধুভক্ত-সত্যভক্ত, কিন্তু শ্রেণীস্বার্থের আশঙ্কা দেখা দিলে সততা মুলতুবি রাখতে হয়। এক লোমহর্ষক শ্বেতপত্র সরকারের তরফ থেকে তিনি প্রকাশ করলেন, তাঁর মন্ত্রকের গুপ্তচর সংস্থার কাছে সাংঘাতিক-সাংঘাতিক নাকি কী সব খবর এসে পৌঁছেছে, বামাচারী কমিউনিস্টরা মতলব আঁটছে দেশে তারা অচিরে অস্থিতি আনবে। আনবেই, কিউবার সেই পালের গোদা ফিদেল কাস্ত্রোর সাগরেদ চে গোয়েভারার লেখা কোন্ এক বইয়ের হাজার-হাজার কপি তারা চোরাগোপ্তা পথে দেশে আমদানি করেছে, ভয়ংকর-ভয়ংকর সব কথা লেখা আছে সেই বইতে, বিপ্লব কী ক'রে ঘটাতে হয় তার বিশদ কলাকৌশল নাকি তাতে লিপিবদ্ধ, এরপর নন্দজি কমিউনিস্টদের জেলে না পুরে আর কী করতে পারেন। কারান্তরালে চ'লে গেলেন তাই কয়েক হাজার আদর্শবাদী মানুষ, আরো কয়েক হাজার আত্মগোপন ক'রে রইলেন, পালিয়ে বেড়াতে শুরু করলেন এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া, এ-শহর থেকে ও-শহর, এই রাজ্য থেকে অন্য রাজ্য। চীনের সঙ্গে সংঘাতজনিত কারণে আর্থিক সংকটে কেন্দ্রীয় সরকার জেরবার, জিনিশপত্রের দাম ক্রমশ চড়ছে, বর্ধমান গণ-অসন্তোষ, বাতাসে বারুদের গন্ধ, তা ছাড়া, কী সর্বনাশ, হতচ্ছাড়া কমিউনিস্টগুলি চে গোয়েভারার বই থেকে হাতে-কলমে বিপ্লব করার পাঠ নিচ্ছে।

কয়েক সপ্তাহ বাদে উত্তর আফ্রিকার আলজিয়র শহরে আফ্রো-এশীয় অর্থনৈতিক সম্মেলন, আলজেরিয়া দেশে তখনও বারুদের গন্ধ, আলজেরিয়ায় বিপ্লব সংসাধিত, ফরাশিরা পরাজয় বরণ করেছে, মুক্তি ফ্রন্ট পুরোপুরি ক্ষমতা দখল করেছে, শহর-বন্দর-গ্রাম-উপত্যকা জুড়ে উল্লাস, একটা নিটোল স্বপ্নকে মাটির পৃথিবীতে টেনে নামানো গেছে, এখন অন্য-একটি স্বপ্নের পরিচর্যা, সমাজতান্ত্রিক আদর্শে দেশকে আদ্যোপান্ত গ'ড়ে তোলা, যার প্রেরণা জোগাবেন কমরেড বেন বেল্লা ও তাঁর সহযোগীরা। আফ্রো-এশীয় অর্থনৈতিক সম্মেলন আহূত হয়েছিল প্রধানত মুক্তিযুদ্ধে আলজিয়ার্সের চূড়ান্ত সাফল্যকে অভিনন্দন জানানোর জন্য, এশিয়া ও আফ্রিকার যে-কোনো একটি দেশ থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের অপসরণ গোটা দুই মহাদেশের

প্রতিটি দেশের প্রেরণাস্বরূপ, আলজিয়ার্সের মুক্তি আমার-আপনার সকলের মুক্তি, সেই মুক্তির সামগানে স্বর মেলাবার জন্য আমরা কয়েকশো এশিয়া-আফ্রিকার নানা দেশ থেকে জড়ো হয়েছি আলজিয়ার্সে। বাতাসে বারুদের গন্ধ, আমরা এক মস্ত ঘোরের মধ্যে আছি।

সম্মেলনে ঝড়ের মতো হঠাৎ হাজির চে গোয়েভারা স্বয়ং। ছ-ফুটের উপর লম্বা দীর্ঘদেহী মহেন্দ্রনিন্দিতকান্তি পুরুষ, দু-গালে অল্প-অল্প দাড়ি, মাথা থেকে ঘাড় পর্যন্ত নেমে আসা চুলের ঢল, দুই চোখ গাঢ় নীল, স্বপ্নালু নীল। পরিচয় পেয়ে গোয়েভারা আমাকে জড়িয়ে ধরে শূন্যে তুলে নিলেন, কপট বিস্ময়ে দু-হাত উল্টে তাঁর অভিযোগ ব্যক্ত করলেন : দেখতেই তো পাচ্ছো আমি কেমন শান্ত, নিরীহ, গোবেচারা, নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ, আমার শিং নেই, নখ নেই, তোমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আমাকে খুব দাগা দিয়েছেন, আমার বই প'ড়ে তোমাদের দেশে কাতারে-কাতারে সবাই নাকি বিপ্লবী ব'নে যাচ্ছে, কই, আমি তো এমন বিপজ্জনক কিছু লিখেছি বলে মনে পড়ে না। নসিব, নসিব, নইলে তোমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আমার উপর হঠাৎ এত কুপিত হন!' কপট দুঃখে ভেঙে পড়ে চে নিজের কপালে চপেটাঘাত করলেন, আলিঙ্গনবদ্ধ করলেন আমাকে, কী ভয়ংকর শক্তি শরীরে, প্রায় পিষ্ট হ'য়ে গেলাম আমি।

বাতাসে বারুদের গন্ধ, বিপ্লব দীর্ঘজীবী হবে এই সম্মিলিত উদ্ধত ঘোষণায় আকাশ ফেটে চৌচির। সম্মেলনে সোভিয়েত দেশের প্রতিনিধিরা ছিলেন, চীনের প্রতিনিধিরাও। মনের আড়াআড়ি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে, দুই দেশের অতি-দীর্ঘ সীমান্ত জুড়ে ফৌজ মোতায়েন, পরস্পরের প্রতি কটুকাটব্য, চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পূর্বাভাস, সোভিয়েত দেশে ভোগ্যপণ্যের জন্য আর্তি। অন্নদাশংকর রায়ের ছড়া যা-ই বলুক না, যাদের মধ্যে আদৌ আর মিল নেই, তাদের কী ক'রে অনুরাগের রাখি পরতে রাজি করানো। কিন্তু দুর্মর আশাবাদী যাঁরা, গোটা পৃথিবীতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সংহতি অটুট থাকুক, সেই শুভচিন্তায় যাঁরা উৎসর্গীকৃত, ঐ সম্মেলনে দুই পক্ষকে এক সঙ্গে বসিয়ে আদর্শগত কোনো মধ্যবিন্দুতে স্থিত করানো যায় কিনা তার জন্য অজস্র প্রচেষ্টা, বাতাসে যেহেতু তখনো বারুদের গন্ধ, আমরা তলব করলেই যেন বিপ্লবকে এক্ষুনি যে-কোনো দেশে বাস্তবায়িত করতে পারি। বাতাসে বারুদের গন্ধ, সম্মেলনমঞ্চে এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে, মেলানো হাত উর্ধ্বে তুলে, বেন বেল্লা-চে গোয়েভারা প্রতিনিধিদের অভিনন্দন জানালেন, আবেগ তুঙ্গ থেকে তুঙ্গতর, তুঙ্গতম, বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক, সমাজতান্ত্রিক আলজেরিয়া অমর রহে, কমরেড কাস্ত্রো দীর্ঘজীবী হোন্, কিউবার বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক, বিপ্লবের পুণ্য আগুন ছড়িয়ে পড়ুক এশিয়ায়-আফ্রিকায়-লাতিন আমেরিকায়। উত্তেজনায় আমরা দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানরহিত, বাতাসে বারুদের গন্ধ।

অথচ মাত্র কয়েকদিন বাদে আলজেরিয়ায় আভ্যন্তরীণ ফৌজি অভ্যুত্থান, কমরেড

বেন বেল্লা সপরিবার বন্দী, ঘটনাপ্রবাহ ঐ দেশে সম্পূর্ণ অন্য খাতে বইতে শুরু করল, রাষ্ট্রের দখলদারি শিথিল হলো না, কিন্তু সমাজতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যে যেন একটু চিড় ধরল, বিপ্লবের নায়করা হারিয়ে গেলেন কোথায়। আফ্রো-এশীয় অর্থ-নৈতিক সম্মেলনেই চে-র সর্বশেষ প্রকাশ্য উপস্থিতি, কিউবা ফিরে যাওয়ার ক-দিন পরেই তাঁর সংগোপন নিরুদ্দেশযাত্রা, একা, বিজয়ী বীর, লাতিন আমেরিকার গহনে দেশে-দেশে সমাজবিপ্লব ঘটাবেন, ঘটাবেনই, সেই লক্ষ্য সাধন করতে গেলে যে-ব্যূহগঠনের প্রস্তুতি প্রয়োজন, তার তাগিদে, প্রতিক্রিয়াশীলদের হিংস্র নজর এড়িয়ে, এ-দেশ থেকে ও-দেশ। কয়েক বছর বাদে প্রতিক্রিয়াশীলদের বিকট উল্লাস, বলিভিয়ার জঙ্গলে চে নিহত, তাঁর গুলিবিদ্ধ দেহ। কিন্তু তা হলেও চে-র আদর্শের কথামালা মহাদেশে-মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ল, তাঁর প্রতিকৃতির সামনে অঙ্গীকার-আবদ্ধ হলেন হাজার-হাজার যুবক-যুবতী তরুণ-তরুণী কিশোর-কিশোরী পৃথিবী জুড়ে। সেই বিরাট মাপের মানুষটি, সকলকলাপারঙ্গম মানুষটি, আলাদিনের দৈত্যের মতোই মিলিয়ে গেলেন। মিলিয়ে গেলেন, অথচ সঙ্গে-সঙ্গে এমন বাতাবরণ সৃষ্টি ক'রে গেলেন যে-কোনো দেশে, বিপ্লব যেন, হাতের মুঠোয়, বাতাসে বারুদের গন্ধ।

বাতাসে বারুদের গন্ধ, উনিশশো পঁয়ষট্টির বসন্ত শেষ হ'তে না হ'তে, উত্তর কলকাতার বিডন স্ট্রিটে, মান্ধাতা যুগের মিনার্ভা থিয়েটারের হাজারো প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও, লিটল থিয়েটার গ্রুপের জাদুকরী: 'কল্লোল'। উৎপল দত্ত-র প্রতিভা তখন সূর্যশিখরে, তাঁর কল্পনাশক্তির বিস্তার, তাঁর সাহসের পরিধি, প্রচলিত ধ্যানধারণাকে দুয়ো দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। বাতাসে বারুদের গন্ধ, সেই আগুন, খাইবার জাহাজ আর শার্দুল সিং যার প্রতীক, নাটকের মঞ্চ থেকে নেমে এসে আমাদের প্রাত্যহিকতাকে দাউ-দাউ জ্বালিয়ে দিল, শেখর চট্টোপাধ্যায়কে এরপর আমি শার্দুল সিং ছাড়া অন্য-কিছু ভাবতে পারতাম না, ভদ্রলোক আমার বাড়িতে ব'সে যখন শাদামাটা আড্ডা দিয়েছেন তখনো না। 'কল্লোল' উদ্ধত বিদ্রোহের কথা বললো, নিখাদ বিপ্লবের কথা, আত্মসমর্পণ নয়, যুদ্ধ, আদর্শবাদীরা, দেশপ্রেমিকরা নিজেদের অবস্থান থেকে কোনো অবস্থাতেই স'রে আসেন না, রাতের অন্ধকারে তাঁরা শত্রুপক্ষের সঙ্গে শ্রেণীস্বার্থঘাতক বোঝাপড়ার দিকে ঝুঁকে পড়েন না, বড়োলোকরা দেশকে অবলীলাক্রমে বিদেশীদের কাছে বেচে দিতে পারে, কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীভুক্ত অগণন মানুষ এই ধরনের নেমকহারামি থেকে সহস্র হস্ত দূরে। তারা লড়াই, লড়াই, লড়াই চায়, লড়াই ক'রে বাঁচতে চায়, আর যদি বেঁচে থাকা সম্ভব না হয়, বীরের মতো শহিদের মৃত্যু বরণ করে। উৎপল দত্ত-র প্রায়-অলৌকিক উদ্ভাবনী শক্তি, তাপস সেন-সুরেশ দত্তদের মঞ্চসজ্জাকুশলতা, আস্ত একটি যুদ্ধ-জাহাজ, খাইবার, মঞ্চে হাজির, এমন মায়া সৃষ্টি হতো যেন সত্যি-সত্যি আমরা খাইবার জাহাজে, যে-খাইবারের বিদ্রোহী-বিপ্লবী নাবিকরা আত্মসমর্পণের ভাষা

শেখেনি। মাননীয় দেশনেতাদের চর্বিতচর্বণ উপদেশবর্ষণ তাদের আদর্শ থেকে স্খলিত করতে পারে না, তারা শহিদের মৃত্যু বরণ করে, কিন্তু তার আগে লাল ঝাণ্ডা, একটু-একটু ক'রে, তীব্র আলোর বিচ্ছুরণে, জাহাজের মাস্তুলের চুড়োয় আরোহণ করছে, প্রথম দিকে একটু দ্বিধান্বিত, তারপর দ্রুত, আমরা আবেগে থরথর কাঁপছি, প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে আন্তর্জাতিক সংগীতের মূর্ছনা, প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে অত্যাসন্ন বিপ্লবের প্রসবযন্ত্রণার সুখাবিষ্ট আর্তনাদ।

বাতাসে বারুদের গন্ধ, দিনের পর দিন, সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা, রবি সেনগুপ্ত, আমি, অন্য একজন-দু'জন, মন্ত্রমুগ্ধের মতো, মিনার্ভা থিয়েটারে একটি আসনও খালি নেই, কোনোদিনই থাকে না, বিশেষ মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করে থাকতাম, সেই বিশেষ মুহূর্তে অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহের কোনো দূরবর্তী কোণে সতর্ক পা ফেলে দাঁড়িয়ে পড়তাম, প্রধান নাবিকের ভূমিকায় সম্ভবত নির্মল ঘোষ, তাঁর হাতে লাল ঝাণ্ডা, প্রথমে ঈষৎ দ্বিধাগ্রস্ত যেন, কিন্তু পরক্ষণে ঝাণ্ডা উপরে উঠছে, আরো উঠছে, মাস্তুলের ডগায় পৌঁছুচ্ছে, কড়া রক্তিম আলোর তীক্ষ্ণ, তীব্র বিচ্ছুরণ, প্রেক্ষাগৃহময় আন্তর্জাতিক সংগীতের ঢেউয়ের পর ঢেউ। আমরা ভেবেই নিয়েছিলাম, কলকাতাতে, পশ্চিম বাংলায়, ভারতবর্ষে বিপ্লব এবার অপ্রতিরোধ্য, দু-কদম এগিয়ে 'কল্লোল' সেই বিপ্লবের ভাষা সবাইকে শেখাচ্ছে। বাতাসে বারুদের গন্ধ। শত্রুপক্ষীয়দের নাসিকাতেও সেই গন্ধ অনুপ্রবেশ করে, আতঙ্কে তারা নীল। যে ক'রেই হোক, 'কল্লোল' নাটককে আঁতুড়ঘরেই নুন খাইয়ে মেরে ফেলতে হবে, নইলে সর্বনাশের আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। শিল্পের স্বাধীনতার, শিল্পীর স্বাধীনতার জন্য যাঁরা নাকি আত্মাহুতি দিতেও পিছু-পা নন, তাঁদের যুক্তিতে চিড় নেই, বামপন্থীদের তো আর সেই স্বাধীনতার অধিকার দেওয়া যায় না, যেহেতু তারা বামপন্থী, অতএব তারা দেশদ্রোহী, তাদের স্বাধীনভাবে নাটক করতে দিলে আমাদের সংবিধানের পবিত্রতা কলঙ্কিত হবে। গ্রামে-গ্রামে সেই বার্তা রটি'গেল ক্রমে, অতি-সম্মানীয় সংবাদপত্রের মালিকরা-সম্পাদকরা একত্রিত হলেন, সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন 'কল্লোল' নাটকের জন্য কোনো বিজ্ঞপ্তি তাঁরা গ্রহণ করবেন না, প্রকাশ করবেন না। আইন বা বে-আইন প্রয়োগ করে 'কল্লোল' বন্ধ ক'রে দেওয়ার নানা অসুবিধা আছে, তা বলে তো দেশপ্রেমিক সংবাদপত্রগুলি তাঁদের একান্ত দায়িত্বপালন থেকে বিচ্যুত হ'তে পারেন না, ঐ হতচ্ছাড়া দেশদ্রোহী নাটকের কোনো বিজ্ঞাপন নেবেন না তাঁরা, তাঁরা দেখবেন বিনা বিজ্ঞাপনে 'কল্লোল' কয়দিন টিকে থাকে।

বাতাসে বারুদের গন্ধ, পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ বাধল বা বাধানো হলো, উৎপল দত্ত আটক, খবরকাগজে 'কল্লোলে'র বিজ্ঞাপন বন্ধ। কিন্তু কী আশ্চর্য, সারা শহরময়, হঠাৎ একদিন দেয়ালে-দেয়ালে অতিসংক্ষিপ্ত ঘোষণা : 'কল্লোল' চলছে, চলবে। যাঁরা শ্রেণীস্বার্থকে দেশপ্রেম ব'লে চালাতে চান, তাঁদের কলা দেখিয়ে 'কল্লোল' মঞ্চস্থ হ'তে থাকল সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, এ-বছর গড়িয়ে

পরের বছর। সেই সঙ্গে, নেহাৎই আকস্মিক, নতুন বাঙালি লজ্জের শুরু : চলছে, চলবে। কথায়-কথায় এখন যা আমরা পরস্পরকে বলি : চলছে, চলবে।

সিকি শতাব্দীরও আগেকার ইতিবৃত্তের কণ্ডূয়ন করছি। বয়স বাড়ে, অথচ আবেগ কিংবা আকৃতিগুলি সংবরণের বৃত্তি শেখেনি, তারা এখনো বাতাসে বারুদের গন্ধ শুঁকে বেড়ায়, তারা কানে-কানে ব'লে বেড়ায়, লোকপরিবাদ যা-ই হোক না কেন, বাঙালির সর্বস্বসমর্পিত সমাজচেতনার ঐতিহ্য, অবিশ্বাস্যকে ঘরোয়া পৃথিবীর প্রাত্যহিকতার সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়ার, মিলিয়ে নেওয়ার দুঃসাহসের ধারাবাহিকতা, চলছে, চলবে। রক্তপতাকাকে আকাশে উড়তে দেখলে এখনো বুক জুড়ে আবেগের আস্ফালন, দুই কান উজাড় ক'রে ইণ্টারন্যাশনাল সংগীতের মূর্ছনা।

‘তোমাকে যদি বাবা ভর্তি করতে হয়’

খোলসা ক’রে বললেই তো হয়, কোনোদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হ’তে পারিনি, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাকে ভর্তি করতেই রাজি হননি। যে-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকোষ্ঠ পেরোতে পারলাম না, তার সম্পর্কে তাই আমার একটু অতিরিক্ত সম্ভ্রম। আশুতোষ কিংবা দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংয়ের ঐতিহ্যে-গমগম-করা প্রাসাদাকার ঘরগুলিতে মাঝে-মধ্যে কর্তব্যব্যপদেশে এখন যখন যেতে হয়, একটু গা ছমছম করে, মনের মধ্যে আতঙ্ক, অনধিকার চর্চা করছি না তো।

সমস্যাটি, আমার কাছে অন্তত তখন মনে হয়েছিল, তেমন জটিল নয়। মফস্বলের যে-বিশ্ববিদ্যালয়ে ততদিন পর্যন্ত পড়েছিলাম, সেখানে নিয়ম ছিল সাম্মানিক বি. এ. ডিগ্রীর জন্য তিন বছর পড়তে হবে, তার পর এম. এ.-র জন্য মাত্র এক বছর। ওখান থেকে সাম্মানিক বি. এ. পাশ ক’রে এসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ষষ্ঠ বর্ষে ভর্তি হবার জন্য আবেদন করেছিলাম; কর্তৃপক্ষ অসম্মত, তাঁরা আমাকে বড়ো জোর পঞ্চম বর্ষে ভর্তি হবার অনুমতি দেবেন, ষষ্ঠ বর্ষে ভর্তি নৈব নৈব চ। আমার প্রার্থনা নামাঞ্জুর ক’রে, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর কলা শাখার সচিব, কৃপা-মমতা ইত্যাদির সঙ্গে আপাতবিষাদ মিশিয়ে যে-কথাগুলি বলেছিলেন, এখনো কানে বাজছে: ‘তোমাকে যদি বাবা ঐ উপরের ক্লাসে ভর্তি করতে হয়, রাস্তা থেকে মুটে-মজুর ডেকে তা হ’লে ভর্তি শুরু করতে হবে আমাদের’। এই ভয়ংকর ঘোষণার পর আমি আর অপেক্ষা করিনি, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তারা আমাকে ষষ্ঠ বর্ষে ভর্তি ক’রে নিলেন, কলকাতার অনেক আগেই ওখানকার এম. এ. পরীক্ষার ফল বেরিয়ে গেল, আখেরে খানিকটা আমার সুবিধাই হলো তাই।

কিন্তু হীনম্মন্যতার বোঝা তো বয়ে বেড়াতেই হয়েছে, হচ্ছে। মফস্বল থেকে সদ্য-আমদানি, কথাবার্তায়-উচ্চারণে গবেট, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডরে তখন কয়েকটি দিন ঘুরে বেড়িয়েছিলাম, যা দেখি তাতেই মুগ্ধ। ধবধবে শাদা ধুতি-শার্ট, চোখে উজ্জ্বল চশমা, ডান হাতে বিলেতের-বাজারে-সদ্য-বেরোনো অর্থনীতির কোনো কটোমটো বই, বাঁ হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, কে যেন, ফিসফিস, আমাকে কানে-কানে বললো, ‘জানো, এ হচ্ছে সেই তুখোড় ভালো ছাত্র, অমুক সেন, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় অধ্যাপককে গেল বিষ্যুৎবার ধমকে এসেছে, “আপনার মাথা স্যার কেইন্‌সে ঠাসা, ঐ গোবর পুরোপুরি বের ক’রে নিন, নইলে মার্কস বোঝা আপনার পক্ষে কোনোদিন সম্ভব হবে না”।’ আমার চোখ ছানাবড়া, দূর থেকে, এড়িয়ে-এড়িয়ে সেই বিখ্যাত ভালো ছাত্রকে বার-বার

দেখি। পরে তাঁর সঙ্গে আমার যথেষ্ট সৌহার্দ্যের সম্পর্ক স্থাপিত হয়, কিন্তু ঐ প্রাথমিক সম্ভ্রমের ব্যাপারটি এখনো ঠিক কাটিয়ে উঠতে পারিনি, সামাজিক একটি ব্যবধান থেকেই গেছে।

যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমাকে নাকচ ক'রে দিয়েছিলেন, তিনি অবশ্য ঐ একটি বাক্যপ্রয়োগে শ্রেণী কম্পা-অনুকম্প প্রসঙ্গ ব্যাপারটি আমার কাছে প্রাঞ্জল ক'রে দিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় পবিত্র পীঠস্থান, এখানে যেমন মফস্বলীয় গণ্ডমূর্খদের জায়গা নেই, মুটে-মজুরদেরও নেই। ভাগ্যিস ভদ্রলোক বছর কুড়ি আগে প্রয়াত হয়েছেন, নইলে সাম্প্রতিক নানা ঘটনাবলীতে অত্যন্ত বেদনাহত হতেন। পিঁপড়েদেরও পাখা উড়ছে, মুটে-মজুররাও বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনে নাম লেখাচ্ছে, চাই কি, এই প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর গড়িয়ে যাওয়ার পর, দরখাস্ত পেশ করলে, আমাকে হয়তো ভর্তি ক'রে নেওয়া হতো।

কিন্তু এটাকেই বলে ঐতিহাসিক বিভ্রান্তি। যা হ'তে পারতো তা তো যা হয়েছে, হয়ে গেছে তাকে সংস্থান থেকে নড়াতে পারবে না। তত্ত্ব দিয়ে, বিশ্বাস দিয়ে, আবেগ দিয়ে মনে-মনে সেই চল্লিশের দশকের উপান্তে নিজের কাছে হয়তো হাজার বার প্রমাণ ক'রে ছেড়েছি, মুটে-মজুরদেও সমান অধিকার আছে, উচ্চ শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করার উক্ত মাননীয় সচিব মহাশয় যা-ই বলুন না কেন: সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে তেমন, যেখানেই শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম সফলতা স্পর্শ করেছে, সেখানেই বাঘা-বাঘা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রমজীবীশ্রেণীভুক্তদের জন্য পড়াশুনার সুযোগ, আজ না হয় আগামী কাল, ক'রে দিতেই হবে, এটাই ইতিহাসের অমোঘ লিখন। সেই সঙ্গে, দশকের পর দশক জুড়ে, ভয়-ভয় ভাবটাও কিন্তু খানিক অব্যাহত, মফস্বলের গবেট ছেলে, তার উপর খোদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হ'তে পারিনি পর্যন্ত। তোৎলা হয়ে তো কেউ জন্মায় না, পরিবেশের ভ্রূকুটি তাকে রুদ্ধবাক কাপুরুষে পরিণত করে। আমার ক্ষেত্রে যা হয়েছে, আতঙ্ক, সারা শরীর জুড়ে সর্বদা, আতঙ্ক, সারা চেতনা সমাচ্ছন্ন ক'রে শঙ্কা-লজ্জা-আড়ষ্টতা। কে জানে, আতঙ্কের নিগড়ে আঁকুপাকু, নিজেকে সাহস জোগাবার জন্যই হয়তো এঁকে-ওঁকে-তাঁকে কড়া-কড়া কথা ব'লে বসি। মনে-মনে সেই ব্যক্তির সঙ্গে যেন এক প্রচ্ছন্ন কথোপকথন: 'ভেবেছো কী, তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করতে পারিনি ব'লেই তোমাদের জারিজুরি ধরতে পারবো না, ঠিক অতটা আকাট নই'।

অথচ তা হ'লে ও মনের মধ্যে ভয়, পাহাড়প্রমাণ ভয়। ভয় থেকে কুণ্ঠা। সভা-সমিতিতে গেলে, মঞ্চ এড়িয়ে একেবারে পিছনে গিয়ে দাঁড়াতে পারলে স্বস্তি বোধ করি। উদ্যোক্তরা যদি পাকড়ে নিয়ে ঠেলে-ঠুলে মঞ্চে চালান করতে চান, আমার প্রচেষ্টা পুষ্পলাঞ্ছিত তথা সম্মানীয় নেতৃজন-বিজ্ঞজন-শোভিত মঞ্চের এক কোণে মুখ নিচু করে ব'সে থাকতে পারার দিকে। মিছিলে যাওয়ার কথায় এখনো ভিতরে-

ভিতরে বিদ্যুচ্চমক অনুভব করি। হাতে কেউ ঝাণ্ডা ধরিয়ে দিলে নিজেকে অতি সৌভাগ্যবান বিবেচনা করি, কিন্তু, দোহাই, আমাকে যেন মিছিলের শেষ সারিতে থাকতে দেওয়া হয়। তৃণাদপি সুনীচেন গোছের অবস্থানের জন্য কামনা করার মধ্যে আদৌ বুজরকি নেই, ন্যাকামি নেই, তুচ্ছাতিতুচ্ছ, তৃণদলের মতো নামহীন-গোত্রহীন হয়ে থাকতে পারলে মস্ত সুবিধা, কেউ আর হাঁক-ডাক পেড়ে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করলেন না।

কলকাতাস্থ ইডেন গার্ডেনে একদা একটি প্যাগোডা ছিল, সেই প্যাগোডা ঘিড়ে মনোরম একটি উদ্যান। ১৯৪৮ সালের গোড়ার দিকে সেই বাগান জুড়ে, কয়েক সপ্তাহ ধ'রে, একটি শিল্পপ্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। দোকানের পর দোকানের সরণী, সন্ধ্যায় একটু-একটু কুয়াশার আস্তরণ-কিন্তু তা দীর্ণ ক'রে আলোর রোশনাই, সংগীত, সমারোহ, মেলা দেখতে-আসা কাতার-কাতার মানুষের ভিড়। সেই ভিড়ে কোনো-এক সন্ধ্যায় প্রথম দূর থেকে দেখি স-ধ্রুব মিত্র সুচিত্রা মুখোপাধ্যায়কে অথবা স-সুচিত্রা মুখোপাধ্যায় ধ্রুব মিত্রকে। কেউ নিশ্চয়ই দূর থেকে চিনিয়ে দিয়েছিল, ইনি বিখ্যাত ধ্রুব মিত্র, ইনি বিখ্যাততমা সুচিত্রা মুখোপাধ্যায়। তাঁরা হয়তো তখন পরস্পরে বাগ্‌দত্ত, ঝকঝকে কথাবার্তা বলছেন, নিজেদের মধ্যে, আশেপাশে ছড়ানো-ছিটোনো পরিচিত বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে, সেই আলাপের ভগ্নাংশ ভেসে আসছে, মফস্বল থেকে সদ্য-পৌঁছনো গবেট আমি, যথার্থই যেন রাজপুত্র-রাজকন্যা দর্শন করছি।

সেই মুগ্ধতার ঘোর, বলতে বাধা নেই, এখনো কাটেনি। এবং, আর যা কাটেনি বিখ্যাত-বিখ্যাতাদের সম্পর্কে সম্ভ্রম-জড়ানো আতঙ্ক। ইতিমধ্যে এতগুলি বছরের ডানা-ঝাপ্‌টানো, কে কোথায় ছিটকে যান, স্বস্থানে ফিরে আসেন, কিংবা গ্রহচ্যুত হয়ে অন্য-কোথাও চ'লে যান, পটভূমি পাল্টায়, পটভূমিতে নতুন রঙের আদল লাগে, আমরা কেউ-কেউ উদ্ধত হবার কলা শিখি, কেউ-কেউ জীবনযুদ্ধের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়ে-গিয়ে ক্রমশ নমনীয় হই, কাছের মানুষ দূরে চ'লে যান, দূরের মানুষগুলি একটু-একটু কাছে আসেন, অপরিচয়ের প্রাচীর খ'সে-খ'সে পড়ে। এই এতগুলি স্তর পেরিয়ে সবাইকেই যেতে হয়, আমাকেও যেতে হয়েছে। তবু শেষ পর্যন্ত শেষ রক্ষা হয়নি আমার, মফস্বলীয় গন্ধ গা থেকে কিছুতেই আর পুরোপুরি অন্তর্হিত হয়নি। হয়তো এক দশক-দেড় দশক ধ'রে ধ্রুব মিত্র আমার বৈঠক-খানায় প্রচুর আড্ডা দিয়েছেন, বাইরে থেকে কেউ যদি সিদ্ধান্তে পৌঁছন, আমরা সমতায় অধিষ্ঠান করছি, আমার ভিতর থেকে আপত্তি উঠবে, উঁহু, এখনো গেল না আঁধার, এখনো রহিল বাধা, ধ্রুব মিত্র এখনো আমার কাছে ১৯৪৮ সালের মহেন্দ্র-নিন্দিতকান্তি সেই যুবাপুরুষ, রাজপুত্রপ্রতিম, তাঁকে আমি এখনো, সময়ের প্রবাহের উচ্চাবচতা সত্ত্বেও, বিবেচনাযায়ী দূরত্ব বজায় রেখে কুর্নিশ ক'রে যাবো। এবং অবশ্যই এই যোজন-যোজন সময় জুড়ে বহু সূত্রে সুচিত্রা মিত্রের সঙ্গে পরিচিত

হওয়ার সুযোগ ঘটেছে আমার, কিন্তু প্রাথমিক ভয়ের আবেশ থেকে কিছুতেই মুক্ত করতে পারিনি নিজেকে ; মুগ্ধতা নিবেদন করতে চাই, তা আর প্রত্যক্ষ সম্ভাষণে কোনোদিন করা হয়ে ওঠে না তাই ; সামীপ্য থেকেও অস্বাচ্ছন্দ্য, এই বুঝি আমার আচরণে কোথায় ত্রুটি ঘটলো, এই বুঝি ভদ্রমহিলা ভ্রূকুঁচকে আমাকে প্রকাশ্যে তিরস্কার করবেন। আমি স্বভাবস্তাবক নই, অথচ পঞ্চাশ বছর ধ'রে রবীন্দ্রনাথের গানের ভাবনা-ডুবোনো ভাবনা-জাগানো প্লাবনে, উথাল-পাথাল, তিনি আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেছেন, তাঁর কাছে আমাদের ঋণের শেষ নেই, কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। কিন্তু আমার চেতনা সমাচ্ছন্ন ক'রে সুচিত্রা মিত্রভীতি, যুগের সঞ্চিত সম্ভ্রম নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে কিছুতেই আর জানানো হলো না, গোটা পৃথিবী ঢুঁড়েও তাঁর গানের আমার চেয়ে বড়ো অনুরাগী আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। বড়াই ক'রে এই কথা কোথায় তাঁকে বলতে যাবো, অথচ কিনা আমার বুকের মধ্যে ঢেঁকির ওঠা-নামা।

আশুতোষ বিল্ডিংয়ে দপ্তর ছিল স্নাতকোত্তর কলা বিভাগের সেই সচিব মহাশয়ের, এক যুগ আগে তিনি প্রয়াত, তাঁর প্রতি বেশ পুরুষ্টু একটি অভিমান তাই এখনো পোষণ ক'রে বেড়াচ্ছি। যদি সেই তেতাল্লিশ বছর আগে আমার প্রতি তিনি সামান্য অনুকম্পা প্রদর্শন করতেন, মুটে-মজুরদের সম্পর্কে তাঁর অনীহা কয়েক মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হতেন, আমার জীবন-ধারার মানচিত্র হয়তো আগাগোড়া পাল্‌টে যেত তা হ'লে। সামাজিক ইতিহাসে যেমন, ব্যক্তিগত ইতিহাসেও এ ধরনের ঘটনা-দুর্ঘটনা, তাদের আকস্মিকতা দিয়ে, পুরোনো গলি বুঁজিয়ে দেয়, নতুন অচেনা রাস্তায় পৌঁছে দিয়ে পলায়নপর হয়। বার্ধক্যের মধ্যপ্রহরে উত্তীর্ণ হয়েছি, আত্মবিশ্বাসে স্থিত হওয়া আমার ভাগ্যে নেই, তত্ত্ব কথা শিখি, কপ্‌চাই, মুটে-মজুরদের, সমাজের নিপীড়িততম শ্রেণীর মাথা তুলে দাঁড়াবার অধিকার আছে, এমনকি উচ্চশিক্ষালাভেরও অধিকার আছে, আমাদের শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থায়ও সেই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অনবচ্ছিন্ন আন্দোলন ক'রে যেতে হবে, আমরা করবো জয়, করবোই। তত্ত্বকথাগুলি আটঘাট বেঁধেই বলি, কিন্তু দর্পণে নিজের মুখ তো দেখতে হয় মাঝে-মধ্যে, আমি নিজে অন্তত মনে-প্রাণে দলিতই থেকে গেছি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেহেতু ভর্তি হওয়া আমার আর এই জীবনে ঘটবে না।